স্বৈরিণী

শৈলেন রায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬৮

প্রকাশক : মৈনাক বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই কাল্পনিক। এদের সঙ্গে যদি বাস্তবের কোন চরিত্রের মিল ঘটে থাকে তা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।

লেখক

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

পাখি
সোনালী দুপুর
যাযাবরী
তরাই
ফুল ফোটার আগে
আমার দুর্যোধন আমার কর্ণ
নিমন্ত্রণ রইলো

সব কথাই আপনাকে বলবো। বলবো বলেই এলাম। এবং বেছে নিলাম এমন এক নিশুত রাত, যে রাত শুরু হয়েছিল তুমুল বৃষ্টিব মধ্য দিয়ে। যদিও এখন বৃষ্টি থেমে গিয়েছে; কিন্তু মাঝে মাঝে আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে বিদ্যুতের তীক্ষ্ম আলোয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী—সমস্ত না হোক, অন্তত কিছুটা অংশ, বিশেষ করে সেই অংশটা যে অংশের বাসিন্দা এই মুহূর্তে আমি। এবং ঘটনাচক্রে আপনিও।

এমন একটি রাত্রিকে বেছে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণ এমন এক নিঝুম পরিবেশই তো মানুষ খুঁজে বেড়ায় নিজের গোপন কথা আর কাউকে বলতে, যে তার কথা শুনবে, তাকে বোঝার চেষ্টা করবে। জানেন, আমার এই বুকের মধ্যে কত যে কথা জমা হয়ে আছে! শুধু কথা না। অজস্র শব্দ গল্প হাসি কান্না গান সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা কত কি, যা এতদিন শত চেষ্টা করেও কাউকে বলতে পারিনি। এমন কি আমার স্বামী, যাকে আমি নিতান্ত অন্তরঙ্গ বলে ভাবতে চেষ্টা করি; অন্তত সে রকমই তো ভাবা উচিত, না কি বলেন। তাকেও সব কথা বলা হলো না। বলি-বলি করেও বলা হয়ে ওঠেনি। পরতে পরতে সব কথা জমা হয়ে গেল বুকের ভেতর। বিরাট এক কথার পাহাড় গড়ে উঠলো সেখানে।

আমার এই আটত্রিশ বছরের বুকটা কি অসম্ভব ভারী আর কঠিন হয়ে গিয়েছে! কি বিশ্রী রকমের চেতনা! নিজের কথা কাউকে বলতে না পারার যন্ত্রণা যে কী অপরিসীম বেদনাদায়ক তা আপনাকে কেমন করে বোঝাই। বহুবার সেই চেষ্টা আমি করেছি। আমার কথা—সব কথা, কাউকে বলবো, সে শুনবে, বুঝবে; অন্তত বোঝার চেষ্টা করবে। কিন্তু এমন কাউকে আজ

পর্যন্ত পেলাম না। ওরা সবাই—আমার মা, দাদা, জয়তি, এমন কি আমার স্বামী, যে কিনা সত্যিকারের একজন ভালমানুষ, শোনে বেশী বলে কম, তার চোখে মুখেও ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠতে দেখেছি আমার কথা শুনতে শুনতে। ওরা ভাবে, আমি তাদের মনের ভাব টের পাই না। ওরা তো জানে না, ।ক ভীষণ চতুর আমার এই চোখ দুটি। আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে যে বস্তুটি রয়েছে আমার মধ্যে সে কী অবিশ্বাস্য রকমের সজাগ। আমার এই সূক্ষ্ম চেতনা দিয়ে ওদের মনেব ক্লান্তি মাপতে পারি আমি। পারি বলেই এখন আর কিছু বলাব চেষ্টা করি না। বলার প্রবৃত্তি হয় না। বলার কথা শেষ হয়ে গিয়েছে আমার।

কিন্তু সব শেষেরই তো আর একটা শেষ আছে। আপনাব কি মনে হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রখব দিনের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমাব মনে হয়, সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও আকাশের মেঘে মেঘে, ব তাসের রেণুতে-রেণুতে যে আলোটুকু মাখামাখি হয়ে থাকে সেটাই হলো এই শেষের পরের শেষ।

হাসবেন না। মনে করবেন না যে কাব্য করছি। সে মনের অবস্থা নয় আমার। এসেছি আপনার কাছে, শুনেছি আপনি একজন সহৃদয় ব্যক্তি; আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনবেন, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করবেন। সেই আশাতেই এলাম।

সব কথা আপনাকে বলবো বলেই এলাম।

কিন্তু বলতে গিয়ে দেখি, বলাটা অত সহজ না। কী বলবো, কোথা থেকে শুরু করবো, কোথায় শেষ করবো। একটি অতি-সাধারণ মেয়ের কাহিনী। কাহিনীই বা কি। খুব সাধারণ সুখ দুঃখের কথা। তার সাধ-আহ্লাদ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনার কথা। শুনতে ভাল লাগবে আপনার? কী বললেন, ভাল লাগবে। অজস্র ধন্যবাদ। আপনার মধ্যে সত্যিকারের একজন সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষের সন্ধান পাচ্ছি।

জানেন, একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। মনে হয়, এই যে সবাই সুখ সুখ করে মরছি, আসলে সুখ বস্তুটা কি। আমি যখন ছোট ছিলাম, মনে আছে, বাড়ির পিছন দিকে মস্ত একটা গাছ ছিল। গাছটার নাম মনে করতে পারছি না এখন। এটা আমার মস্ত এক দোষ। ভুলে যাওয়া।

কিন্তু সবকিছু যদি এমনভাবে ভুলে যেতে পারতাম! যদি ভুলে যেতে পারতাম, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, কেনই বা আপনার মুখোমুখি বসে আছি; যদি ভুলতে পারতাম, আমি যা চেয়েছিলাম, যেমন করে বাঁচতে চেয়েছিলাম তেমনভাবে বাঁচতে পারলাম না বলে ব্যর্থতায় আমার বুক ভেঙে চুরমার হয়ে গেল—যদি সব আমি ভুলে যেতে পারতাম! যদি ভুলে যেতে পারতাম, সেই প্রকাণ্ড ঝুপসি গাছটার পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকতো একটা পাখি, ও কী চমৎকার সুরে গান গাইতো, আমার তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে সেই সুরের ঝঙ্কার উঠতো। ও শুধুমাত্র আমাকে শোনাবাব জন্যই যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত—ভালবাসার সঙ্গীত বাতাসে ছড়িয়ে দিত। যদি আমি সেই স-ব ভুলে যেতে পারতাম! তাহলে একটা আনন্দমুখর অতীত আমার বর্তমান জগতের ওপর এমন বিষাদের ছায়া ফেলতে পারতো না।

সেই ছোট্ট পাখিটা রোজ আমাকে গান শোনাতো। আমি যেতে চাইতাম ওর কাছে। ওর নিবিড় স্পর্শ অনুভব করতে চাইতাম নিজের মধ্যে। কিন্তু ঘন পাতার অড়ালে লুকিয়ে রয়েছে ও। ওর দর্শন মিলবে না কোন ক্রমেই।

কিন্তু একদিন। সেই দিনের সকাল ছিল আশ্চর্য রকমের সুন্দর। ডিমের কুসুমের মত নরম সোনালী রোদ্দুর এসে পড়েছিল গাছের পাতায় পাতায়। রোঁয়া-কাঁপানো বাতাস শির শির করে বইছিল। ঘাসের ডগায় টলটল করছিল শিশির-বিন্দু। ভোরের আলোয় ওদের মুক্তোবিন্দু বলে ভ্রম হচ্ছিল।

ঘুম ভাঙতে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। মনে হলো, বিশেষ একটা সকাল আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশ। পায়ের নাচে মসৃণ ঘাসের গালিচা। পা দিয়ে বারংবার সেই ভেজা ঘাস অনুভব করতে লাগলাম। ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন অনুভূতি। এমন করে ওদের আর কোনদিন স্পর্শ করিনি।

মা জানতে পারলে বকাবকি করবে, জোর করে আমাকে ঘরে টেনে নিয়ে যাবে। শীতের সময় সর্দি কাশিতে ভুগি। খালি পায়ে বাইরে বেরোন বারণ আমার। বিশেষ করে সাকালবেলায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি সব কিছু ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম, আমার গায়ে যথেষ্ট পরিমাণে গরম জামা নেই, ঠাণ্ডা লেগে অসুখে পড়তে পারি। বিছানায় শুয়ে থাকা যে কী অসাধারণ করুন ব্যাপার, সে কথাও সেই মুহূর্তে আমি ভুলে গেলাম।

শুধু মনে হতে লাগলো, সেই যে পাখিটা, যার নাম আমি জানি না, দেখিও নি কোনদিন, কিন্তু আশ্চর্য গান শুনি রোজ, সে যদি এই মুহূর্তে গান গেয়ে ওঠে, আমি খুব সুখী হবো।

কী আশ্চর্য! ও গেয়ে উঠলো। এমন শিষ দিয়ে দিয়ে গান ও বুঝি আগে আর কোনদিন গায়নি। শুধু মাত্র আমাকে শোনাবার জন্যেই যেন বিশ্বের সেরা গান গাইতে শুরু করলো ও।

বহুক্ষণ ধরে ও গাইলো। আমি তন্ময় হয়ে শুনলাম। বহু—বহুক্ষণ। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার কি জানেন, সেই দিনই প্রথম ওর সাক্ষাৎ পেলাম। নাচতে নাচতে ও বেরিয়ে এল পাতার আড়াল থেকে। উড়ে এসে দাঁড়ালো আমার খুব কাছে। শিশির-ভেজা ঘাসে ওর ছোট্ট দুটি পা ডুবিয়ে। তারপর ও নেচে নেচে গাইতে লাগলো।

কী অভূতপূর্ব মুহূর্ত ভাবুন তো! ও আর আমি একই সঙ্গে মখমলনরম ঘাসে পা ডুবিয়ে এক অপার্থিব সুখকে উপভোগ করছি। শুধু ও আর আমি।

সেই দিনকার সেই সুখের মুহূর্তগুলি আর কি ফিরে আসবে কোনদিন!

যদি বা সেই আশ্চর্য রকমের সুন্দর সকালটা আবার ফিরে আসে ওর সোনালী রোদের উষ্ণতা নিয়ে, ঘাসের মাথায় মাথায় টলটল করে শিশির-বিন্দু, রোঁয়া-কাঁপানো বাতাস শিরশির করে বইতে থাকে, আর সেই ছোট্ট পাখিটা নেচে নেচে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত—ভালবাসার সঙ্গীত আমাকে শোনায়, তাহলে আমি কি আবার ফিরে পাবো সেই সুখকর মুহূর্ত, জীবনকে উপলব্ধি করতে পারবো তেমন ভাবে, বরিশালের উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে একদা যেমন সেই শিশুটি অনুভব করেছিল।

না।

সেই সুখ আর ফিরে আসবে না। কোনদিন আসবে না।

তবেই বলুন সুখ জিনিষটা কি! আসলে সুখ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই সংসারে। সবটাই হয়তো মনের ভ্রম।

বা এমনও হতে পারে, সুখের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাকে গ্রহণ করার মত মন গেছে মরে। তখন সুখ এসে দুয়ার থেকে ফিরে যায়।

আর একটা ঘটনাও আমার খুব মনে পড়ে।

তখন আমার বয়স কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে। বরিশালের বাড়ি বিক্রি করে কলকাতায় চলে এসেছি আমরা। বাসা নেওয়া হয়েছে শেয়ালদার দিকে এক ঘিঞ্জি পরিবেশে।

এখানে মাঠ নেই, ঘাস নেই, শিশির নেই, সেই ঝুপসি গাছটা গেছে হারিয়ে। আর আমার ছোট্ট বন্ধুটি, যে নেচে নেচে গান শুনিয়েছিল একদিন, সে আর কোনদিন পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে না, আমাকে গান শোনাবে না।

যেদিকে দৃষ্টি ফেরাই, বাধা আর বাধা। ইট সিমেন্টের ঠাসাঠাসি। অগনতি মানুষ। যেন কলে চলছে। হাসছে, কথা বলছে, চেঁচাচ্ছে, হৈ-হল্লা করছে, কিন্তু সবই যন্ত্রচালিত, প্রাণশক্তিহীন।

বাড়িটা অত্যন্ত পুরনো। স্যাঁত-স্যাঁতে মতন। প্রখর দিনেও সূর্যের রশ্মি বাড়িতে ঢুকতে পারে না। আমার কান্না পায়; আমি হাঁপিয়ে উঠি। চলে যেতে চাই সেই হারানো জগতে, যেখানে ছিল বিরাট এক দিঘি, শীতের সময় দলবেঁধে বালি-হাঁস এসে বসতো যার ফটিক-স্বচ্ছ জলে, ওদের নরম বুক দিয়ে পরম এক সুখকে অনুভব করতো। চিলে-কোঠার ছাদে দাঁড়ালে চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে উঠতো একটা ধূ-ধূ মাঠ, বর্ষার সময় সেই মাঠ জলে ভরে যেত, ছোট ছোট ডিঙি ভাসতো সেই জলে। আর ছিল দুরন্ত একটা গাই, সে সব সময় শিং উঁচিয়েই থাকতো, কিন্তু আমাকে দেখামাত্র কাছে এগিয়ে আসতো, ওর কর্কশ জিভ দিয়ে আমার নরম শরীর চাটতো। কেউ কি ফিরিয়ে দিতে পারবে আমার সেই হারানো জগৎ!

শেয়ালদার সেই সোঁদা ভ্যাপসা বাড়িটার একমাত্র ঐশ্বর্য ছিল এক ফালি বারান্দা। এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি দেখতে পেতাম একখণ্ড গাঢ় নীল আকাশ। সেই আকাশ সময় সময় ধূসর হয়ে ওঠে, তারপর দৃষ্টি-ঝাপসা-করা বৃষ্টি নামে। আমাকে ঘিরে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো নাচছে, আমার উষ্ণ শরীরে ওদের শীতল স্পর্শ অনুভব করি। ক্ষণিকের জন্যে আমিও ওদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। ওদের সুখ, ওদের উচ্ছ্বাস আমার অন্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

এই বারান্দায় দাঁড়ালে আমি আকাশকে বিচিত্রভাবে উপলব্ধি করতে পারি। যদিচ এ আকাশ আমার শৈশবের আকাশের চেয়ে আকারে অনেক ক্ষুদ্র, তথাপি ছোট এক বিন্দুর মধ্যে আমি যেন প্রকাণ্ড এক সিন্ধুর স্বাদ পাই। আমার তৃষ্ণার্ত হৃদয় পুলকে নেচে ওঠে। সেই এক আকাশ, সেই এক পৃথিবী, যাদের আমি ফেলে এসেছি বহু যোজন পিছনে, তারা কেউই আমার জীবন থেকে হারিয়ে যায় নি, এই ছোট্ট একফালি বারান্দা নিমেষে সেই পুরনো জগৎ আবার আমার চোখের সামনে উন্মীলিত করে দেয়। একসময়

দিনান্তের মন্থর আলো ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়, আকাশের কোলে একটি একটি করে তারা ফুটে ওঠে, আমি নির্বাক বিস্ময়ে সেই দুর্লভ ক্ষণটিকে স্বাগত জানাই। আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে।

মা একদিন খুব বকাবকি করলো, 'সারাক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি করিস। ছেলেগুলো বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থাকে।'

এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, এ বাড়ির মুখোমুখি আর একটা বাড়ি রয়েছে এবং সেই বাড়িতে থাকে কয়েকটি যুবক। হয়তো কোন হস্টেল। ওরা আমার দিকে তাকায়, হাসে, ইসারা করে।

আমি চেতনা ফিরে পাই। নতুন করে নিজেকে দেখতে চেষ্টা করি। বুঝতে শিখি, আমি এখন আর সবার মধ্যে মিশে নেই, হয়ে উঠেছি আলাদা এক সত্তা, সবার মধ্যে থেকেও বিশিষ্ট এক মানবী। আমার নারীত্ববোধের উপলব্ধি তখন থেকেই। মা-ই আমার মনে এই বোধ এনে দিল।

কিন্তু সেই যে ছোট্ট একটা সুখ, যা কিনা আত্মগোপন করেছিল সেই ছোট বারান্দায়, একখণ্ড আকাশের মধ্যে, সহসা সেই সুখ হারিয়ে গেল।

আমি ক্ষুব্ধ হই। মনে মনে মাকে দোষারোপ করি। আমার সুখ-হরণকারী বলে ছেলেদের গালাগাল দিই।

এই সময় একদিন আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো পাশের একটা বাড়ির ওপর। বাড়িটা একতলা। আমাদের বাড়ির গা-ঘেঁষা। অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ অবস্থা ওর। ওর গায়ে কোন অস্তর নেই। শ্যাওলা-ধরা মলিন দেওয়াল। সেই দেওয়াল চুঁইয়ে সর্বক্ষণ বিষণ্ণতা ঝরে পড়ছে যেন। সেই বিষণ্ণতার ছোঁয়া এসে লাগতো আমার মনে। বিরাট এক পরিবারের বাস সেই বাড়িতে। অসংখ্য ছেলেমেয়ে। দিনের অধিকাংশ সময় ওরা রাস্তায় খেলা করে, সন্ধ্যে হয়ে গেলেও

বাড়িতে ঢুকতে চায় না। ওদের মা চিৎকার করে ওদের ডাকাডাকি করতে থাকে।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি কানে আসছে।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। একটা লোক বীভৎস গলায় কী সব বলে চিৎকার করছে এবং তারস্বরে আর্তনাদ করছে একটি স্ত্রীলোক। অনেকগুলো কচি গলার কান্নাও এসে মিশেছে সেই আর্তনাদের সঙ্গে। সমস্ত মিলে এক নারকীয় পরিবেশ।

অন্ধকারের সঙ্গে মিশে আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু মার তীক্ষ্ম দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। আমার হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এল মা। দরজা বন্ধ করতে করতে বললো, 'যত সব ছোটলোক মাতালের কাণ্ড। কবে যে এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার পাব।' সেইদিন জেনেছিলাম, মানুষ মদ খেলে খুব চিৎকার করে এবং বউদের মারে, আর বউরা ভীষণ চেঁচায়।

তারপর থেকে প্রায়ই ওদের চিৎকার চেঁচামেচি কানে আসতো। লোকটা মদ খেয়ে এসে ওর বউকে বেদম মারতো, ছেলেমেয়েরা মার দুর্দশা দেখে কাঁদতো। প্রথম প্রথম মনে হতো, ভোর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটিকে বুঝি আর দেখতে পাব না; ছেলেমেয়েরাও বুঝি আর কোনদিন রাস্তায় খেলতে আসবে না। কিন্তু রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দৃশ্যের কী স্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি! ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে রাস্তায় খেলতে নেমেছে, স্ত্রীলোকটি ছুটোছুটি করে সংসারের কাজ করে যাচ্ছে, যেমন করে অন্যান্য দিন। কে বলবে গত রাত্রে এই সংসারে অমন অমানুষিক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।

একদিন দেখলাম, স্ত্রীলোকটি সেজেগুজে সেই মাতাল লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ওরা দুজনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটছিল। স্ত্রীলোকটি হাত নেড়ে নেড়ে অনর্গল কথা বলে চলেছে আর হাসিমুখে সেই কথা শুনছে লোকটা। ওদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন সুখ ঝরে পড়ছে।

তা হলেই বলুন, সুখ বস্তুটা কি। আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, এক একজনের সুখ এক এক রকমের। কেউ হয়তো মেরে সুখ পায়, কেউ পায় মার খেয়ে। তাই কিনা বলুন। না হলে সেই স্ত্রীলোকটি, যে কিনা অমন নিষ্ঠুরভাবে মার খেত কী বলে হাসতে হাসতে সেই বর্বর লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

আমার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে আপনার?

পাচ্ছে না! ভারী আশ্চর্য তো! সত্যি, কী অদ্ভুত সরল প্রকৃতির মানুষ আপনি। মানুষের ওপর কী গভীর মমতাবোধ আপনার! যে কথা শুনলে সবাই হাসতো, ব্যঙ্গ করতো, আপনি কী গভীর তন্ময়তার সঙ্গে সেই কথা শুনে যাচ্ছেন। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন। আপনার এই আচরণে আমি ভরসা পাচ্ছি। আমার নিভৃত মনের দুয়ার খোলার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।

তার আগে একটা কথার জবাব দিন তো। বলুন তো, কথাটা সত্যি কিনা। একজন মেয়েমানুষ লম্পট কোন পুরুষকে নিয়ে দিনের পর দিন ঘর করতে পারে, পারা সম্ভব বলেই মনে হয় আমার। কিন্তু নিপাট ভালমানুষ একজন স্বামী, যে কিনা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোক সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, স্ত্রীর অবাধ্যতা করে না সে কোন ক্রমেই, বরং তার গূঢ় অন্যায়কেও ন্যায় বলে মনে করার চেষ্টা করে, এমন যে স্বামী—নির্বিবাদী নিরপরাধ ক্ষমাশীল, তাকে সময় সময় দুর্বিষহ মনে হয়; মনে হয়, তার ভালবাসা নাগপাশের বন্ধনের চেয়েও কঠিন শ্বাসরোধকারী। তখন মন ছুটে যেতে চায় উন্মুক্ত কোন প্রান্তরে যেখানে জীবন অনেক বেশী উদ্বেগজনক, শঙ্কাকুল, কিন্তু প্রতিনিয়ত নবনব রসে উজ্জীবিত। কি বললেন, কথাটাব সারমর্ম ঠিক বুঝতে পারলেন না। আমি বলতে চাই, এই যেমন ধরুন আমাদের পাশের বাড়ি, যেখানে স্ত্রীটি প্রতিরাত্রে স্বামীর কাছে লাঞ্ছিত হতো, কী সুখে পরদিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে চরিত্রহীন সেই লোকটার সংসার চালনার কাজে লেগে পড়তো, তার সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব

নিজের কাঁধে তুলে নিত? ইচ্ছে করলে সেই লোকটাকে ত্যাগ করে অন্য কোথাও সে চলে যেতে পারতো, সন্ধান করতে পারতো এমন কোন মানুষের যে তার সঙ্গে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। শান্তশিষ্ট কোন মানুষ, যার পরিচয় একজন ভদ্রমানুষ হিসেবেই।

কি বললেন, সেই মহিলাটির স্বামী ত্যাগ করা সম্ভবপর ছিল না। কেন? অতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে সে কোথায় যাবে, কে তাকে আশ্রয় দেবে এইসব ভাবছেন? আমি যদি বলি স্ত্রীলোকের বিচার বয়স কিংবা ছেলেপুলে দিয়ে হয় না, তার বিচার হয় শুধুমাত্র তাকে দিয়েই, আপনি অস্বীকার করবেন?

আপনার মতের পরিবর্তন ঘটানো আমার পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার না।

কণিকাদির উদাহরণ এক্ষুণি দিতে পারি। যদিও কণিকাদি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তথাপি আমরা সমবয়সী বন্ধুর মতই দেখতাম নিজেদের। বন্ধুর চেয়েও বেশী অন্তরঙ্গ ছিলাম। বলতে পারেন, অনেকটা একাত্মবোধ। আর সেই কণিকাদিই কিনা আমার সঙ্গে শত্রুতা করলো। জঘন্য শত্রুতা। নিজেও মরলো, আমাকেও মারলো।

নাকি, নিজে মরলো না, শুধু আমাকেই মারলো।

বাবার ওকালতীর পশার কিছুটা জমতে শুরু করেছে। শেয়ালদার সেই ঘুপচি পাড়া ছেড়ে আমরা ভবনীপুরের দিকে উঠে এসেছি। এখানে আকাশ অনেক প্রশস্ত, ঘরে শুয়ে শুয়েই দেখা যায়। আকাশ দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। সেই এক আকাশ, এক মেঘ, তবু কেন যে এই ভাল লাগা! জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আকাশ দেখতে শুরু করেছি, আজও দেখি। কী অভূতপূর্ব ব্যাপার বলুন তো।

এই আমার মস্ত দোষ। এক কথা বলতে বলতে অন্য কথায়

চলে আসি। কণিকাদির কথা বলতে গিয়ে আকাশের রাজত্বে নিয়ে গেলাম আপনাকে।

কিন্তু না। এখন আপনাকে কণিকাদির কথাই বলবো। কণিকাদি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল; কিন্তু বয়স দিয়ে তো মানুষের মনের বিচার করা চলে না। মন বয় অন্য খাতে। বয়সের প্রশ্নটা সেখানে নিতান্তই অবান্তর।

কণিকাদির সঙ্গে আলাপটা হলো দারুণ অদ্ভুতভাবে।

আমাদের বাড়ির কয়েকটা বাড়ি পরেই কণিকাদিদের বাড়ি। বিরাট বাড়ি। সামনে লোহার ফটক। সেই ফটকের ভেতর দিকে সারাক্ষণ একটা লোক বসে থাকে। বাড়ি পাহারা দেয়।

কণিকাদিদের সব কিছুই বিরাট। বিরাট বাড়ি, বিরাট গাড়ি, দরওয়ানটিও বিরাট আকৃতির। আর ওর মাথার পাগড়ি না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না, মানুষ বিনা কারণে অত বড় একটা বোঝা বয়ে বেড়াতে পারে। কণিকাদিদের দুটো গাড়ি। কণিকাদির স্বামী অমরেশবাবু ছোট গাড়িটা নিয়ে অফিসে যান, বড় গাড়িটা নিয়ে কণিকাদি যখন তখন বেরোচ্ছে, কাড়ি কাড়ি জিনিষ কিনে বাড়ি ফিরছে। এতসব কথা হয়তো আমার জানার কথা ছিল না। তবু জেনেছিলাম। মা-ই জানিয়েছিল। কৌতূহল নামক বস্তুটি মার মধ্যে একটু বেশী মাত্রায় রয়েছে। বিশেষ করে কেউ যদি ধনী হয়, মার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হবেই।

মা-ই আমার দৃষ্টি ঐ বাড়ির দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

আমাদের ছাদে দাঁড়ালে কণিকাদিদের বাড়ির কিছুটা অংশ স্পষ্ট-ভাবে দেখা যায়। ওদের বাড়ির দিকে তাকাতে আমার ভাল বা মন্দ কিছুই লাগতো না। প্রথম প্রথম তাকাতাম মার কথা শুনে। তারপর অভ্যেস হয়ে গেল। ছাদে উঠলে প্রথমে যে দিকে নজর যেত সেদিকে কণিকাদিদের বাড়ি।

এক একজন মানুষকে দেখলে বেশ সুখী-সুখী মনে হয়। কণিকাদিকে

প্রথম যেদিন দেখি আমার সেরকমই মনে হয়েছিল। ছোটখাটো গোলগাল মানুষটি। ফর্সা রং। এতদূর থেকে যদিও ওর কথা শোনা যেত না, শুধু হাসি দেখা যেত। ভদ্রমহিলা যেন সর্বক্ষণ হেসেই আছে। এত হাসে যে মানুষ, সেই মানুষ সুখী না হয়ে পারে কখনও!

আর একটা বিষয়েও আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। কণিকাদি নিশ্চয় খুব সৌখীন মানুষ; যেহেতু কণিকাদির চুল ছোট করে ছাটা, শ্যাম্পু দিয়ে ফাঁপানো আর নিত্যনতুন শাড়ি পরে কণিকাদি।

এ হেন কণিকাদির সঙ্গে আলাপটা যে এমন অতর্কিতে হয়ে যাবে, এবং তাও কিনা ঐ তরফ থেকেই যেচে আলাপ, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু এখন মনে হয়, সেদিন যদি আকাশে অমন মেঘের আড়ম্বর না ঘটতো এবং মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি এসে না পড়তো পৃথিবীর ওপর, আলো আঁধারের বিচিত্র লুকোচুরি খেলাটা না চলতে থাকতো সেই সময়, তাহলে আমার মনে হয়তো দুরন্ত বাসনাটা জেগে উঠতো না—ট্রাম ছেড়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার বাসনা।

আমি তখন ফার্স্ট-ইয়ারের ছাত্রী। ক্লাস শেষ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরবো বলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু রাস্তায় কোন ট্রামের চিহ্নমাত্র নেই। আমাদের ক্লাস শুরু হতো ভোরে, ভাঙতো এগারোটা নাগাদ। এই সময় রাস্তায় ট্রাম না থাকা সত্যি সত্যিই এক বিচিত্র ব্যাপার। কিন্তু সেদিন সেই বিচিত্র ব্যাপারটাই ঘটে গেল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার দৃষ্টি চলে গেল আকাশের দিকে। সেখানে কী অপূর্ব এক খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। শুধু আকাশে না। পৃথিবীও সেই খেলায় মেতে উঠেছে। আমাকেও মাতিয়ে তুলেছে। দেখলাম, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ অতবড় সূর্যকে গ্রাস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু সূর্য তো আর এমন কিছু শান্তশিষ্ট ছেলে না, যে হাত পা গুটিয়ে বসে থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করবে। সেও ইতিমধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। মেঘ কাটিয়ে তার তীক্ষ্ম রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর ওপর। বাড়ির

গায়ে, গাছের মাথায়, মসৃণ রাস্তায়। মেঘ রৌদ্রের সে কী চমৎকার খেলা! ওরা যেন আমার কানে কানে বলতে লাগলো, আজ আর ট্রামে চেপে বাড়ি ফিরো না দোলন, হেঁটে চলো, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো। ওদের আহ্বানে সারা না দিয়ে পারলাম না।

একটা ট্রাম এল। মেয়েরা দল বেঁধে হৈ-হৈ করতে করতে উঠে পড়লো। ওদের ফাঁকি দিয়ে আমি সরে পড়লাম। একা একা হাঁটতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামলো। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো কোনাকুনি ভাবে নেমে আসছে। আমাকে ঘিরে ওরা নাচছে। নিমেষে আমি ওদের খেলায় যোগ দিলাম। ভুলে গেলাম, আমি এক জনপদ দিয়ে হেঁটে চলেছি; রাস্তায় ট্রাম চলছে, বাস চলছে, অসংখ্য গাড়ি, আমার আশেপাশে ছাতা মাথায় মানুষের বিরাট মিছিল—সব কিছুই আমি ভুলে গেলাম। আশ্চর্য এক কৌশলে সেই মুহূর্তে আমি বরিশালের ফ্রক-পরা মেয়েটিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম, যে এমন এক বৃষ্টির দিনে এসে নামতো একটা মাঠে যার সবটাই তখন জলে ভরে গিয়েছে, জলের ওপর জল পড়ছে, যেন শত শত জলতরঙ্গ বাজছে, আর সেই জলে হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে দোলন বলে একটি কিশোরী। সেই মুহূর্তে সে ভুলে গিয়েছে, বৃষ্টিতে ভেজা তার বারণ, যেহেতু জলে ভিজলে তার জ্বর হতে পারে এবং মা জানতে পারলে বিষম বকাবকি করবে, জোর করে তাকে ঘরে টেনে নিয়ে যাবে।

সহসা সংবিত ফিরে এল। ফুটপাথ ঘেঁষে একটা গাড়ি খুব ধীরে ধীরে চলছে এবং ক্রমাগত হর্ন টিপছে। সেই কর্কশ শব্দে একসময় পাশ ফিরে তাকালাম। কণিকাদির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বার করে আমাকে ডাকলো কণিকাদি। যদিও মনে মনে দারুণ বিরক্তিবোধ করলাম, কিন্তু বাধ্য হয়ে গাড়িতে উঠে বসতে হলো।

আমার সর্বাঙ্গে চোখ বোলাতে বোলাতে কণিকাদি বললো, 'এভাবে ভিজতে নেই। অসুখ ছাড়াও একটা বিপদ আছে।' কণিকাদি হাসিমুখে ভ্রূ কাঁপিয়ে বিচিত্র এক ভঙ্গী করে বললো, 'সুন্দরী মেয়েদের অনেক জ্বালা, বুঝেছো।' কণিকাদি আমার থুতনি নেড়ে দিল।

যদিও মনের বিরক্তি তখন কাটে নি, কণিকাদির কথায় কেমন যেন একটু সুখের পরশ পেলাম। সুন্দরী বলে নিজেকে অনুভব করতে পাবার সুখ।

আর একটা কথাও আমার মনে হলো। মনে হলো, এতক্ষণ ধরে আমি হাটলাম, মানুষের যে বিরাট মিছিলটা রাস্তা দিয়ে চলেছে, তার বড় একটা অংশ নির্ঘাৎ আমাকে দেখছিল। বৃষ্টিভেজা আমার এই নধর শরীর খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

কথাটা মনে হতেই গা শিরশির করে উঠলো।

ভেজা শাড়ির আঁচল ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই কণিকাদি খিল খিল করে হেসে উঠলো। একটি বাচ্চা মেয়ের মত হাসি ওর।

হাসতে হাসতে কণিকাদির মুখ অসম্ভব লাল হয়ে উঠলো। বার বার ও আমার গায়ে ঢলে পড়তে লাগলো। কণিকাদির হাসি দেখে মনে হচ্ছিল, ও বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। কে বলবে এতগুলো ছেলেমেয়ের মা ও।

কণিকাদি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। হঠাৎ বলে উঠলো, 'সময় সময় খুব ছোট হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়, না?' হাসি থামিয়ে কণিকাদি কী রকম ঘাড় কাৎ করে আমাকে দেখতে লাগলো।

অপ্রস্তুতভাবে বললাম, 'হ্যাঁ।'

কণিকাদি চুপ করে বসে রইলো। গাড়ির চাকার নিচে একটানা

শব্দ উঠছে। সপ সপ সপ। বৃষ্টি আর পড়ছে না এখন। রোদও ওঠেনি। জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। বিষণ্ন আকাশ। মেঘেরাও কেমন উদাসীনভাবে স্থির হয়ে রয়েছে। নিমেষে ওদের সমস্ত আনন্দ যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই সবকিছুর জন্যে আমি মনে মনে কণিকাদিকেই দায়ী করলাম। কণিকাদি যদি আমাকে ডেকে গাড়িতে না তুলতো, আমার বিশ্বাস, আকাশ জুড়ে মেঘের সেই চাঞ্চল্য কিছুতেই স্তিমিত হয়ে যেত না বা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে জেদী সূর্যের রশ্মিগুলো এমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়তো না।

মনে মনে যখন এসব ভাবছিলাম, কণিকাদি হঠাৎ বলে উঠলো, 'তুমি হয়তো আমার ওপর রাগ করছো। ভাবছো, শুধু শুধু তোমার আনন্দ নষ্ট করে দিলাম। কিন্তু কি করবো, আমার যে ভীষণ লোভ হলো।'

অস্ফুট স্বরে বললান, 'কীসের লোভ ?'

কণিকাদি মৃদু হাসলো। 'অনেকদিন ধরেই তোমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। বাড়ির কাছ দিয়ে যাও আসো, কিন্তু সুযোগ খুজে পাই না। আজ এমন সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে করলো না। একা একা থাকি, মানুষজন ভাল লাগে।'

'একা একা কেন, আপনাদের বাড়িতে তো অনেক লোকজন।'

কণিকাদি চোখ বড় করে বললো, 'লোকজন দেখছো কোথায়। এক স্বামী, পাঁচটি ছেলেমেয়ে, জনাকয়েক চাকর-বাকর। সঙ্গী হিসেবে সবাই খুব বাজে।' কণিকাদি ঠোঁট কোঁচকালো।

পরমুহূর্তেই হেসে ফেললো। 'যে যার ধান্দায় ব্যস্ত। স্বামী পয়সা পয়সা করে মরছে। ছেলেমেয়েরা খেলা-ধুলো নিয়ে মশগুল, মার দিকে তাকিয়ে দেখার সময় তাদের নেই। বাকী রইলো চাকর-বাকর। ওদের সঙ্গে তো আর আড্ডা ইয়ার্কি মারা যায় না।'

একটা কথা জিভের ডগায় এসে আটকে গেল। আটকে গেল ঠিক না, আটকে দিলাম। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আর একজনকে

তো প্রায়ই আপনার সঙ্গে দেখতে পাই। কিন্তু নতুন পরিচয়ে কাউকে এ ধরনের কথা বলা যায় না। বিশেষ করে যাকে কণিকাদির সঙ্গে দেখি. তার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা জানা নেই যখন।

ক। আশ্চর্য! এবারও কণিকাদি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। ও বলতে লাগলো, 'থাকার মধ্যে আছে অরিন্দম। যথেষ্ট সঙ্গ দেয় ও। এখানে ওখানে নিয়ে যায়। কিন্তু শত হলেও সে পুরুষ মানুষ। কাজকর্ম তো আছে ওর।' কণিকাদির কথার মধ্যে বিষাদের সুর ছিল, আমাকে স্পর্শ করলো।

বললাম, 'আলাপ যখন হলো নিশ্চয়ই যাব।'

কণিকাদি এখন রাস্তার দিকে মুখ করে বসে আছে। ওর মুখের একটা অংশ আমার নজরে পড়ছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা মনে হলো, কণিকাদিকে যতটা সুখী মনে হয় আসলে হয়তো ততটা সুখী নয় সে। জানি না, এ ধরনের চিন্তা হঠাৎ মনে হতে গেল কেন।

কণিকাদি সেই যে চুপ করলো, আর কথা বললো না।

আমাকে নামিয়ে দিয়ে কণিকাদি চলে গেল। যাবার সময়ও কথা বললো না কণিকাদি। শুধু মৃদু হাসলো। কণিকাদির এই আচরণ রীতিমত বিস্ময়কর। অথচ এনিয়ে কোন প্রশ্ন করা যায় না। আমাদের মধ্যে এখনও সেরকম হৃদ্যতা গড়ে ওঠেনি।

কণিকাদি চলে যাবার পর কী রকম অন্যমনস্ক হয়ে রইলাম। বারবার ওর কথা, অরিন্দমের কথা মনে হতে লাগলো। অথচ অরিন্দমকে এখন পর্যন্ত ভাল করে দেখাই হয়নি। দূর থেকে যা দেখেছি তার ওপর ভরসা করে কোন মানুষ সম্বন্ধে কোন কিছুই ধারণা করা চলে না।

কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, অরিন্দম ক্রমাগত আমার মনের মধ্যে পাক খেতে লাগলো। কে এই অরিন্দম? কেনই বা সে

কাজকর্ম ফেলে কণিকাদির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, কেনই বা তার কথা বলতে বলতে কণিকাদি বিসদৃশভাবে হঠাৎ চুপ করে গেল।

শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে ছাদে উঠে গেলাম।

প্রখব রোদে ছাদ ভরে গিয়েছে। আকাশে এখন মেঘের লেশমাত্র নেই। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সেখানে মেঘ বৃষ্টি আলোর কী অবাধ খেলা চলছিল। সময় সময় বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

কণিকাদিদের বাড়ির দিকে তাকালাম। বাড়িটাকে অদ্ভুত নিস্তব্ধ বলে মনে হলো। সমস্ত পরিবেশটাই বিশ্রী রকমেব নিস্তব্ধ। হঠাৎ কর্কশ স্বরে একটা কাক ডেকে উঠলো। অখণ্ড নৈঃশব্দের মাঝে সেই শব্দটা খুব মধুর শোনালো।

দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এলাম।

ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছে। অনেকক্ষণ হলো কলেজ থেকে ফিরেছি। স্নান সেরে খেতে বসা উচিত। আমি আর মা রোজ একসঙ্গে খেতে বসি। খুব ভোরে ওঠে মা। সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে সংসাবের কাজে লেগে যায়। এত বেলা হয়ে গেল, মার নিশ্চয় খুব ক্ষিধে পেয়েছে। পাওয়াই স্বাভাবিক।

নিজেকে একজন স্বার্থপর মানুষ বলে মনে হতে লাগলো। চিৎকার করে মাকে বলতে লাগলাম, 'এক্ষুণি স্নান করে আসছি। দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে মা।'

বলতে বলতে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

বহুক্ষণ হয়ে গেল, কিন্তু কোন ক্রমেই স্নান সেরে বাইরে বেরোতে পারছি না। নিজের মধ্যেই নিজে বন্দী হয়ে গেছি। মাথার ওপরে সাওয়ার। সেখান থেকে ক্ষীপ্রগতিতে জলের ধারা পড়ছে। আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। ক্রমাগত ভিজছে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। যতটা সম্ভব নিজেকে দেখার চেষ্টা করছি। আমার নগ্ন রূপ। এমন করে নিজেকে দেখিনি কোনদিন। দুরন্ত এক নেশা

আজ আমাকে পেয়ে বসেছে। নিজেকে দেখার নেশা। আমি ভুলে গেলাম, কিছুক্ষণ আগে চিৎকার করে মাকে খাবার দিতে বলেছি, আমি আর মা একসঙ্গে বসে খাব। মা নির্ঘাৎ আমার অপেক্ষায় রান্না ঘরে বসে আছে। সকালে মা বিশেষ কিছু খায় না। মার নিশ্চয় খুব ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু এখন সেসব কথা আমার মনে পড়ছে না। মোহাবিষ্টের মত আমি দাঁড়িয়ে আছি। নিজেকে দেখছি।

আরও বহুক্ষণ হয়তো এভাবে কাটতো। সহসা জল পড়ার নরম শব্দ ভেদ করে মার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আমাকে সচকিত করে তুললো। মা বলছে, 'এতক্ষণ ধরে কি করছিস? ভাত যে পানি-পান্তা হয়ে গেল।'

ছি, ছি। কী লজ্জা, কী লজ্জা!

তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে বেরিয়ে এলাম। মার সামনা-সামনি পড়ে গেলাম। মা সন্দিগ্ধ ভাবে বললো, 'এতক্ষণ ধরে চান করছিলি?'

আমার বুক দুরু দুরু করে উঠলো। যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলতে চেষ্টা করলাম, 'অসম্ভব গরম লাগছিল।'

মা গজর গজর করতে লাগলো, 'মোটেই গরম না আজ। গরম হলেই বা কি! মানুষ না খেয়ে দেয়ে শুধুই চান করবে।'

মার কথার উত্তর দিলাম না। উত্তর দিতে ভয় হচ্ছিল, পাছে না মা আবার প্রশ্ন করে বসে। এই মুহূর্তে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত নই আমি। কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল, যেন দারুণ অপরাধ করে ধরা পড়ে গেছি।

চুপ চাপ খেয়ে যাচ্ছিলাম। অন্যান্য দিন খাওয়ার সময় অনর্গল কথা বলি। মাকে মাঝে মাঝে ধমক লাগাতে হয়, মনোযোগ দিয়ে খেতে বলে। আমি জানি, মার একটা দুর্বলতা আছে। রান্নার প্রশংসা শুনতে ভালবাসে মা। তাই খাওয়ার সময় কথা না বলে খেতে বলে, যাতে রান্নার গুণাগুণ বিচার করা যায়। আজ মা অন্য পথ ধরলো, 'মুখ সেলাই করে খাচ্ছিস কেন?'

আমি চেষ্টা করে হাসলাম। ‘কথা বললেও দোষ, না বললেও ?’

মা একটুও দমলো না। রেগে গিয়ে বললো, ‘তুইও কি দীপুর মত হলি ? মাঝামাঝি পথ নেই তোদের ?’

হঠাৎ উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠলাম, ‘অদ্ভুত রান্না হয়েছে আজ। এমন শুক্তো জীবনে খাইনি।’

দারুণ কাজ হলো। মার মুখের মেঘ নিমেষে কেটে গেল। খুশী মনে বললো মা, ‘যত্ন নিয়ে রাঁধি, ভাল হলেই ভাল।’

কত অল্পতেই খুশী হয় মা, অথচ এই সামান্য খুশীটুকুও দিতে পারি না মাকে !

খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের ঘরে চলে এলাম। এই ঘরে আমি আর মা শুই। মার শুতে এখনও কিছুটা দেরী আছে। রান্নাঘর গোছগাছ করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

আমি পান খাই না। আজ যত্ন করে পান সেজে খেলাম। পানের রসে জিভ রাঙালাম, ঠোঁট রাঙালাম। তারপর এসে দাঁড়ালাম আলমারীর-সঙ্গে-লাগানো বড় আয়নাটার সামনে। আমার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি চোখের কাছে স্থির হয়ে রয়েছে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে নিজেকে দেখছি।

দেখতে দেখতে কখন গায়ের আঁচল সরিয়ে ফেলেছি। নিজেকেই নিজে চোখ ঠেরে জিজ্ঞেস করলাম, এ দোলন কোন দোলন ?

সত্যিই আমি জানি না, এ দোলন কোন দোলন। কোথায় লুকনো ছিল, কেমন করে সহসা আত্মপ্রকাশ করলো !

মা একদিন এনে দিয়েছিল নারীত্ববোধ, কণিকাদি এনে দিল যৌবনের প্রথম উপলব্ধি।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে কণিকাদির কথা ভাবলাম। কণিকাদি এক বিচিত্র ধরণের মানুষ। বিচিত্র না হলে এই বয়সের কোন মহিলা, যে কিনা পাঁচ পাঁচটি সন্তানের জননী, অমন ছেলেমানুষের মত

অ-কারণে হেসে গড়িয়ে পড়ে না। অরিন্দমের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অমন বিসদৃশ ভাবে গম্ভীর হয়ে যায় না।

ধীরে ধীরে কণিকাদির ওপর রাগ জন্মাতে লাগলো। কণিকাদি শুধু শুধু একটা অস্বস্তি এনে দিল মনে। নিলর্জের মত নিজেকে দেখার যে দুরন্ত বাসনা জেগে উঠলো, এতো এক বিকৃত মনেরই পরিচয়। কণিকাদিই আমার মনে এই বিকৃত রুচিবোধ এনে দিল। মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো এবং গোপনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম, কণিকাদি ডাকলেও ওদের গাড়িতে আর চড়বো না। ওদের বাড়িতেও যাব না। কক্ষনও না।

দিন দুয়েক পরের ঘটনা। সেদিনও কলেজ থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলাম। কেন জানি না, ইদানীং ট্রামে চড়ার চেয়ে হাঁটতেই ভাল লাগে বেশী। সঙ্গে কৃষ্ণা বলে একটি মেয়ে ছিল। দুজনে গল্প করতে করতে চলেছি, হঠাৎ কণিকাদির গলা শুনতে পেলাম। কণিকাদি আমাকে ডাকছে। ঘাড় না ফিরিয়েও বুঝতে পারলাম, কণিকাদিদের বিরাট গাড়িটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে চলেছে এবং গাড়ির জানালা দিয়ে ঝুঁকে রয়েছে কণিকাদি।

ভাগ্য ভাল, কাছেই একটা রেষ্টুরেণ্ট ছিল। কৃষ্ণার হাত ধরে হুড়মুড় করে সেই রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে পড়লাম।

কৃষ্ণা আমার হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলো, 'কি হলো?'

'দারুণ ক্ষিধে পেল।' বলেই বয়কে ডেকে খাবারের অর্ডার দিলাম।

কৃষ্ণা মেয়েটা পড়াশুনোয় ভাল। একটু গো-বেচারী ধরণের। ভাল মানুষের মত মুখ করে বললো, 'বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে এলেই পার, বাইরের খাওয়া শরীরের পক্ষে ভাল না।'

মনে মনে গাল দিলাম ওকে, বইয়ের পোকা, বই কেটে কেটে মর তুই।'

কণিকাদির সঙ্গে আমার এক ধরনের লুকোচুরি খেলা চলতে লাগলো।

কণিকাদি আমাকে ধরতে চায়, আমি ওর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াই। সে এক অদ্ভুত খেলা। যেন দুটি অ-প্রাপ্তবয়স্কা কিশোরী নিজেদের আনন্দে মশগুল হয়ে চোর-পুলিস খেলে বেড়াচ্ছে। অথচ আমার মধ্যে খেলার কোন আনন্দই ছিল না। ছিল এক ধরনের উত্তেজনা। এই উত্তেজনার সন্ধান এতদিন পর্যন্ত পাইনি।

ইচ্ছে করলে কণিকাদি'কে এড়িয়ে যাওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হতো না। মেয়েদের সঙ্গে দল বেধে ট্রামে চেপে বাড়ি ফিরতে পারতাম। যেমন আগে করতাম। কিন্তু এখন সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরলাম। না কি ইচ্ছে করে নিজে পথ বেছে নিলাম না। আমাকে জোর করে সেই পথে চালিত করা হলো।

কিন্তু কে করলো?

আমার ভবিতব্য। আপনি ভবিতব্য বিশ্বাস করেন?

করেন। আপনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। বিচক্ষণ না হলে নির্ঘাৎ আমার কথার প্রতিবাদ করতেন। মূর্খ যারা তারা অহেতুক চেঁচিয়ে মরে। এই করলাম, সেই করলাম বলে গলা ফাটায়। কিন্তু আমাদের করার কী আছে! একটা পথ আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সেই পথ ধরে চলতে হবে। সবচেয়ে মজার কথা সেই পথের সৃষ্টিকর্তা আমি নিজে না। অন্য কেউ। কী বিচিত্র ব্যাপার ভাবুন তো।

আমি নামক একটি প্রাণী এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলাম, পৃথিবীর সমস্ত সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, আশা নিরাশা সবকিছু আমাকে কেন্দ্র করেই, অথচ এর কোন কিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমার নেই। এমনকি এই যে হৃদপিণ্ডটা বুকের মাঝে অহরহ চলছে, সর্বক্ষণ ঘোষণা করছে আমি একজন জীবন্ত মানুষ; শত চেষ্টা করলেও শুধু মাত্র ইচ্ছা শক্তির জোরে আমি ওর ধুকধুকানি বন্ধ করে

দিতে পারি না। আমার শত সহস্র শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে রক্তের যে স্রোত বয়ে চলেছে আমি তা অনুভব পর্যন্ত করতে পারি না। অনুমান করি মাত্র। আরও কত সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এই শরীরের মধ্যে, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। অথচ এই শরীরকে লালন পালন করার দায়িত্ব আমার। শুধু মাত্র আমারই।

এক এক সময় আমার কি মনে হয় জানেন ? মনে হয়, আমার এই দেহ, যাকে আমি এত যত্নে লালন পালন করে চলেছি, সেটা এক চিতাশয্যা ছাড়া আর কিছুই না। একটা আগুন, চিতার আগুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর, সর্বক্ষণ সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই ঝলসে দিচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু করার উপায় নেই। একজন নির্বাক দর্শকের ভূমিকা ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা আমার নেই।

আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে নিজের সম্বন্ধে এভাবে চিন্তা করা কি করে সম্ভব ! আমিও একদিন আপনার মত করে ভাবতাম।

আজ ভাবি না।

আমার সেই লজ্জালু মনটা মরে গেছে। বা এও বলতে পারেন, যে মন দিয়ে একদিন পৃথিবীর আলো বাতাস, ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য বিচার করতে পারতাম, আমার সেই মনটা ক্রমে ক্রমে নিরেট একটা পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। যে গাছটা কিনা ফুলে পাতায় ভরে উঠতে পারতো কার অভিশাপে সেটা শুকনো কাঠে পরিণত হয়ে গেল ? কার পাপে ?

শেষ পর্যন্ত একদিন কণিকাদির কাছে ধরা পড়ে গেলাম। কণিকাদিই একরকম জোর করে আমাকে ধরে ফেললো।

সেদিন ছিল রবিবার। বাবা এবং দাদা দুজনেই বাড়িতে ছিলেন। মা রাঁধছিল। আমি মার কাজে সাহায্য করছিলাম। হঠাৎ কণিকাদি এসে উপস্থিত। ও যে একেবারে বাড়িতে এসে হাজির হবে বুঝতে

পারিনি। আমি মনে মনে খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু মুখে বললাম, 'আসুন, আসুন।' যথাসম্ভব খুশীর আলো ফুটিয়ে তুললাম মুখে।

আমার কথার উত্তরে কণিকাদি কি বললো জানেন? বললো, 'তোমার মুখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি একটুও খুশী হওনি। যেন ভূত দেখেছো।'

দাদা একটু ঠোঁট-কাটা মানুষ। মাত্রাজ্ঞানও কিঞ্চিৎ কম। ও ফস করে বলে ফেললো, 'জেণ্ডারে ভুল হলো। ভূত না, পেত্নী।' বলে এমন জোরে হেসে উঠলো যে বাবা পর্যন্ত এসে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলো?'

দাদার কথা শুনে কণিকাদিও খুব হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে কণিকাদিই বাবার প্রশ্নের উত্তর দিল, 'কিছু হয়নি, দীপু একটা মজার কথা বললো।' তারপর দাদার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে বললো, 'আমি তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, তুমি বললাম বলে মনে কিছু করো না। তোমার নামটা দোলনের কাছ থেকে আগেই জেনে নিয়েছি।'

দাদা কথা বলার আগেই মা বলে উঠলো, 'না না, মনে করবে কেন। ওতো সত্যি সত্যিই খুব ছোট। দেখতেই যা একটু বড় সড়।'

মার এই মস্ত দোষ। বড়লোক দেখলেই গলে পড়ে।

দাদা ভালমন্দ কিছুই বললো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মা কণিকাদিকে উদ্দেশ করে বললো, 'আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি যাচ্ছি।' আমি দাদা আর মা রান্না ঘরে ছিলাম, কণিকাদি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল।

কণিকাদি বললো, 'আজ আর বসবো না। ছুটির দিন, উনিও বাড়িতে আছেন। আমি দোলনকে নিতে এসেছি। ও আজ আমাদের সাথে খাবে।'

'ছুটির দিনে আমরা একসঙ্গে বসে খাই।' দাদা ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠে বললো।

মা বিব্রতভাবে বললো, 'এক সঙ্গে খাওয়া তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, যে কোনদিন খেলেই হবে। তুই যা দোলন। শাড়িটা পালটে যাস।'

কণিকাদি আঙ্গুল দিয়ে আমার চিবুক স্পর্শ করে বললো, 'ওর সাজের দরকার হয় না মাসীমা।'

মাসীমা! কী অসহ্য ন্যাকা মহিলা! হিসেব করলে দেখা যাবে. মার সমবয়সীই হবে। নেহাৎ ভাল খাচ্ছে দাচ্ছে, প্রাণে সুখ আছে, তাই বয়স ঢাকা পড়ে আছে। মার মত খাটা-খাটুনীর শরীর হলে এতদিনে হাড়ে দুর্বা গজাতো! মনে মনে গজর গজর করতে করতে কণিকাদির সঙ্গে তাদের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। ভুলে গেলাম, দিন কয়েক আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কণিকাদি ডাকলেও ওদের বাড়িতে যাব না। সময়কালে সব ভুলে গিয়ে ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

কণিকাদিরা যে খুব বড়লোক সেকথা আগে থেকেই জানতাম। কিন্তু বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম, বাইরে থেকে ওদের ঐশ্বর্যের একটা অংশকেই অনুমান করা যায়, আসলে কণিকাদিরা আরও অনেক বেশী ধনী। একটা বাড়ির মেঝে যে এত পরিচ্ছন্ন হতে পারে এবং প্রতিটি ঘরের রং এমন আশ্চর্য রকমের সুন্দর, আসবাবপত্রগুলো কী অদ্ভুত রকমের নিখুঁত, সবকিছু মিলিয়ে কণিকাদিদের বাড়িটা কল্পনার চেয়ে অনেক—অনেকগুণ বিস্ময়কর।

জীবনে যা দেখেছি, সবই আড়ম্বরহীন। জীবন-ধারণের পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন শুধুমাত্র সেটুকুই। আজ এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, জীবন-ধারণের জন্য মানুষের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই। মানুষ সবভাবেই বাঁচতে পারে। একটা ছোট ঘিঞ্জি ঘরে শুয়েও মানুষ বাঁচে, আবার কণিকাদিদের মত এমন মনোরম অট্টালিকায়ও মানুষ বেঁচে

থাকে। এই দুই শ্রেণীর বাঁচার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রভেদ আছে। সীমাহীন প্রভেদ।

কণিকাদি আমার পাশাপাশি হাঁটছিল। ওর প্রতি পদক্ষেপে এক তৃপ্ত মানুষ ঘোষণা করছিল, সুখ, সুখ, অফুরন্ত সুখ। সেই তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে লাগলো।

কণিকাদি বলে উঠলো, 'তুমি মনে মনে খুব রাগ করেছো, না ?'

বিভ্রান্তভাবে প্রশ্ন করলাম, 'কেন ?'

কণিকাদি আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো, 'এই যে সবার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এলাম।'

'আপনি তো আনেন নি, আমি নিজে থেকেই এলাম।'

কণিকাদি উত্তর দিল না। আমরা একটা হল-ঘরেব পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। কণিকাদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো, গলা বাড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ঘরের মাঝখানে বসে-থাকা একজন মানুষের ওপর। বিরাট একটা টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে কাজ করছেন এক ভদ্রলোক। উনি একটা ফাইল খুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন।

কণিকাদি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো। দেখতে দেখতে ওর প্রফুল্ল মুখের ওপর একটা ছায়া পড়লো। কণিকাদিকে ঈষৎ কঠিন দেখলো। অস্ফুট স্বরে কণিকাদি বললো, 'সব সময়ই টাকা কামাবার ফিকিরে আছে। অথচ কী যে করবে এত টাকা দিয়ে!'

মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলাম, 'উনি কে ?'

নিমেষে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললো কণিকাদি। চোখ নাচিয়ে বললো, 'আমার স্বামী। স্বামী অর্থে প্রভু। অর্থাৎ কিনা আমার শাড়ি, বাড়ি, গয়না, মায় লিপিষ্টিক পর্যন্ত সব কিছুরই মালিক উনি।' কণিকাদি শব্দ করে হেসে উঠলো।

কণিকাদির হাসির শব্দে ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন।

কণিকাদি আমার হাতে টান দিয়ে বললো, 'এসো, আলাপ করিয়ে দি-ই।'

কণিকাদির সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর এই আচরণ আমার অদ্ভুত বলে মনে হলো। ভদ্রলোক বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। এর আগে কোন বয়স্ক মানুষ আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ান নি। বয়স্ক কেন, অল্প-বয়স্কও কেউ দাঁড়ায় নি। দাদার বন্ধুরা যখন ঘরে বসে আড্ডা মারে, আমি যে এতবার যাই আসি, কই কেউ তো উঠে দাঁড়ায় না। উঠে দাঁড়ানো দূরের কথা আমার দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখে না।

কণিকাদি পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ দোলন। আমার নতুন বান্ধবী। বেশ দেখতে, না!' বলে ঘাড় ঈষৎ কাৎ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকালো।

কণিকাদির স্বামী আমার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন। একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।'

কণিকাদি খিল খিল করে হেসে উঠলো। সেই বাচ্চা মেয়েদের মত হাসি। এক সময় হাসি থামিয়ে ও বললো, 'দিনকে দিন বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে তোমার। নিজের মেয়ের বয়সী মেয়েকে কেউ আপনি আজ্ঞে করে কথা বলে।' আবার এক প্রস্থ হাসি।

কণিকাদির স্বামী অপ্রস্তুতভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন।

এতক্ষণ পরে ঘরের কোণের দিকে আমার দৃষ্টি পড়লো। একটা ছোট টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে আর একজন মানুষ। লোকটি উল্টো দিকে ফিরে বসে আছে। ওর পিছন দিকটাই দেখা যাচ্ছে শুধু। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে কণিকাদিও সেই দিকে তাকালো এবং তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'একী, অরিন্দম আজ কাজ করছে?'

অরিন্দম নামক ব্যক্তিটির কোনরকম ভাববৈকল্য প্রকাশ পেল না। যেমন ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল, সেভাবেই কাজ করতে

লাগলো। ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, হয় লোকটা কালা, না হয় পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কণিকাদি ওর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আবার বললো, 'আজ তো রোববার। রোববারে কাজ কেন?'

এবারও অরিন্দম উত্তর দিল না। একটু নড়ে চড়ে বসলো শুধু।

কণিকাদি গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালো। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'ছুটির দিনে কাজ করালে ওভারটাইম দিতে হয়।' যদিও কণিকাদি খুব হালকা সুরেই কথাটা বললো, আমার কিন্তু মনে হলো কণিকাদির কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ঝাঁজ মেশানো রয়েছে।

কণিকাদির স্বামী একটু ইতস্তত করে বললেন, 'সামান্য একটু কাজ বাকী ছিল, ভাবলাম, অরিন্দমের বেশী সময় লাগবে না, আজই শেষ করে দিক। কাল থেকে আবার ওকে অন্য কাজ নিয়ে পড়তে হবে।'

কণিকাদি কথা বললো না। কিছুক্ষণ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর আমাব দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, 'অরিন্দম ইজ এ ভেরী ভেরী গুড বয়, যে যা বলে মুখ বুজে শোনে। ন্যায্য পাওনা কখনও দাবী করে না।'

তারপর আমার হাত ধরে বললো, 'আয়।'

দোতলার একটা ঘরে এনে আমাকে বসালো কণিকাদি। বললো, 'তোকে একটা জিনিষ খাওয়াবো। নিজের হাতে তৈরী করেছি। তুই বলছি বলে মনে কিছু করিস না দোলন। আমি যাকে আপন ভাবি, তাকে তুই বলি।'

আমাকে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে কণিকাদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ঘরে এসে ঢুকলো কণিকাদি। ওর হাতে ট্রে-ভর্তি নানা রকমের খাবার। আমার সামনে ট্রে-টা রেখে কণিকাদি

বললো, 'খা, তোর খুব ক্ষিদে পেয়েছে। ক্ষিদে পেলে আমি বুঝতে পারি।'

যদিও আমার দারুণ ক্ষিদে পেয়েছিল, সসব্যস্তে বলে উঠলাম, 'না না ক্ষিধে পায়নি। বললেন, একটা মাত্র জিনিষ খাওয়াবেন।'

কণিকাদি আমার কাছে ঘন হয়ে এল। মিষ্টি সুরে বললো, 'কেউ আগ্রহ করে কিছু দিলে না বলতে নেই। নে, খা।'

আব না বলা চলে না। খেতে লাগলাম। অপূর্ব স্বাদের খাবারগুলো। এক সময় বললাম, 'সবই আপনার তৈরী?'

'হ্যাঁ। সময় কাটে না, তাছাড়া ভাল মন্দ খাবার তৈরী করতে আমার খুব ভাল লাগে। ছেলেমেয়েরাও খুব খুশী হয়।'

'ওদের দেখছি না।'

'আছে কোথাও। সারা সময় দুরন্তপনা করছে।'

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল কণিকাদির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ করি। কণিকাদি সম্বন্ধে ক্রমশ আমার কৌতূহল সজাগ হয়ে উঠছিল। কণিকাদির স্বামীর সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হলো, তাতে ভদ্রলোককে ভাল কিংবা মন্দ কিছুই মনে হলো না। অরিন্দমকে স্পষ্ট করে দেখতেই পেলাম না। বাকী রইলো ছেলেমেয়েরা। তারাও আপাতত দৃষ্টির বাইরে।

কণিকাদিবা যে খুব বড়লোক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে আমি। প্রাচুর্যের প্রতি স্বভাবতই একটা আকর্ষণ আছে। কণিকাদিকে কেন্দ্র করে এই বিরাট বাড়িটা, ঘরে ঘরে দামী আসবাবপত্র, আমার সামনে সাজানো রয়েছে যেসব সুদৃশ বাসনপত্র, এই বাড়ির সমস্ত মানুষজন, কণিকাদির স্বামী, অরিন্দম যদিও এ বাড়িব মানুষ বলতে যা বোঝায় প্রকৃতপক্ষে সে হয়তো তা না, তবু কণিকাদির একজন অন্তরঙ্গ মানুষ হিসেবে তাকে ভেবে নিয়েছিলাম, এবং কণিকাদির ছেলেমেয়েরা—সবাই এই মুহূর্তে আমার কাছে পরম কৌতূহলের বস্তু হয়ে উঠলো।

কণিকাদি আবার উঠে গেল। যাবার সময় আমাকে সতর্ক করে দিয়ে গেল, 'এক।বন্দু খাবারও যেন পড়ে না থাকে। ভাত খেতে দেবী হয় এ বাড়িতে।'

আমাব চোখ কপালে ওঠাব উপক্রম। 'এরপর আবার ভাত?'

কণিকাদি যেন খুব বিস্মিত হলো। 'এইটুকু খেয়ে সমস্ত দিন কাটাাব তুই? পেট ভরে খেতে হয়, তবে তো শরীর টেঁকে।'

কণিকাদি আর দাঁড়ালো না। দ্রুত পায়ে বেবিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল কণিকাদি চলে গেছে। একা বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। ধীরে ধীরে একটা ক্ষোভ মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে লাগলো। শুধু শুধু রাববারটা মাঠে মারা গেল। বাড়িতে থাকলে এই সময় কত হৈ হল্লা হতো। দাদা একদণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ছুটির দিনে ওর বন্ধু বান্ধবরা আসে। সমস্ত বড়ি মুখর হয়ে উঠে তখন। ঘন ঘন চায়ের অর্ডার হতে থাকে। আমি ছুটোছুটি করে চা পরিবেশন করি। সঙ্গে থাকে মুড়ি-মাখা আর তেলে ভাজা। দাদা অনবরত হাঁকডাক করে, কখনও আমার পেছনে লাগে, কখনও মার। যদিও মা মুখে গজর গজর করে, আমি বুঝতে পারি, এই সকল রাগের আড়ালে মা খুশী চেপে রাখার চেষ্টা করে। এমন কি বাবা, যাঁর মুখে কচিৎ কদাচিৎ হাসি দেখা যায়, এই সময় বাবাও যেন অকারণে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। এই রকম এক আনন্দোচ্ছল পরিবেশের পবিবর্তে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে থাকা রীতিমত পীড়াদায়ক। কিছুক্ষণ আগে যে পরিবেশকে অদ্ভুত রকমেব রোমাঞ্চকর বলে মনে হয়েছিল, সহসা তাকেই অত্যন্ত নিষ্প্রভ বলে মনে হতে লাগলো। এত বড় বাড়ি কণিকাদিদের, এত লোকজন, কণিকাদির কথা অনুযায়ী দুরন্ত ছেলেমেয়ের দঙ্গল, তা সত্ত্বেও কী ভয়ঙ্কর নিঃস্তব্ধ এই বাড়িটা! আমার চোখের সামনে যে প্রশস্ত দেওয়াল, তাতে সুদৃশ একটা ঘড়ি। অনবরত তার পেণ্ডুলাম

ঢুলছে, একঘেঁয়ে শব্দ। রীতিমত বিরক্তিকর। অসহ্য রকমের বিরক্তিকর।

দাদার একজন বন্ধু আছে, নাম প্রবীর। ছেলেটি এক কারখানায় কাজ করে। অল্প বয়সেই সাংসারিক অনটনের দরুণ লেখাপড়া ছেড়ে ওকে কাজে লাগতে হয়েছে। বয়সের তুলনায় ওর হাবভাব অনেক বেশী পরিপক্ক। কথায় কথায় দাদাকে নানা উপদেশ দেয়। পড়াশুনো করে ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে বলে। ওর মতে নীচু মহলের মানুষ হয়ে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। প্রবীরেব কথা শুনে আমার হাসি পায়। সময় সময় ওকে পরিহাসও করি। আমার পরিহাস গায়ে মাখে না প্রবীর। মাখলেও উত্তর দেয় না। চশমার ভারী লেন্সের আড়াল থেকে তাকিয়ে থাকে শুধু।

সহসা প্রবীবেব কথা মনে পড়ে গেল। ও যে অমন নির্বাকভাবে আমাব দিকে তাকিয়ে থাকে, ওর এই দৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেন একটা ব্যথা প্রকাশ পেতে চায়। কী সে ব্যথা আমি বুঝতে পাবি না। চাইও না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যেন প্রবীরের ব্যথা উপলব্ধি করতে পাবলাম। প্রবীবের সেই বিহ্বল দৃষ্টি আমাব অন্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলো।

এই পরিবেশ অসহ্য লাগছে। শূন্য ঘবে বসে একটা যন্ত্রের টিকটিকানি শুনে যাওয়ার মধ্যে কোন সার্থকতাই নেই। বরং রয়েছে দারুণ ব্যর্থতা।

যে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে যাব ঘবে ঢুকলো কণিকাদি। কণিকাদি একা না। ওর সঙ্গে রয়েছে আর একজন মানুষ। সে অরিন্দম।

অরিন্দমকে এত কাছ থেকে আগে কখনও দেখিনি।

কণিকাদি পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ অরন্দিম, আর এ হচ্ছে দোলন। আমার ক্ষুদে বান্ধবী।'

অরিন্দম হাত তুলে আমাকে নমস্কার করলো। যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়ালাম। প্রতিনমস্কার করতেও ভুলে গেলাম।

মনে মনে দারুণ অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। এ ধরনেব বিশ্রী আচরণের যথার্থ কোন কারণই থাকতে পারে না আমাব। আবও অনেক বেশী স্বাভাবিক হওযা উচিত ছিল, হতে পাবলে ভাল হতো।

আমি একজন আধুনিকা। কোন ছেলেব সাহচর্য যে ইতিপূর্বে ঘটেনি, তেমন না। ববং ইদানীং একটা আত্মবিশ্বাস নিজেব মধ্যে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল, আমি সুন্দরী, এবং আমার এই যৌবন-পুষ্ট দেহ যে কোন যুবকের পক্ষে অত্যন্ত কামনার বস্তু। কণিকাদিই আমার মনে এই গর্ববোধ এনে দিয়েছিল। সেই দিক দিয়ে আমি কণিকাদির কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সময়কালে আমি সমস্ত গর্ব ধুলিসাৎ করে দিয়ে বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কণিকাদি আমাব হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'কীবে, তোর হলো কী!'

অবিন্দম আমাব দিকে তাকিযে বলছে, 'আপনাব কথা খুব শুনেছি মণিদির মুখে।'

'মণি-দি কে?' সামান্য কয়েকটা কথা উচ্চারণ করতে আমার জিভ আড়ষ্ট হয়ে এল।

কণিকাদি হেসে বললো, 'অবিন্দম আমাকে এই নামে ডাকে।'

অরিন্দম কণিকাদিকে মণি-দি বলে ডাকে কেন!

কণিকাদি হাসতে হাসতে বলতে লাগলো, 'আমি ওর চোখের মণি কিনা। পলকে চোখে হারায়।' কথা বলতে বলতে কণিকাদি আরও জোরে হেসে উঠলো। কিন্তু অরিন্দম কণিকাদির মত উচ্ছল হাসিতে মুখর হয়ে উঠলো না। ও আরও গম্ভীব হয়ে গেল। ওর কান দুটো যেন অসম্ভব লাল দেখাচ্ছে।

নাকি আমার চোখের ভ্রম।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত মনের ওপর যে গুরুভার চেপে বসেছিল, সহসা সেটা সরে গেল। নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছে এখন। কণিকাদি যে আমার কথা অরিন্দমকে বলেছে সেজন্য আমি মনে মনে

ওকে কৃতজ্ঞতা জানলাম। আমার কথা শুনেছে অরিন্দম। কী এমন আমি যে আমার কথা শুনছো তুমি—অরিন্দম!

আমার মনে হতে লাগলো, এই শোনার মধ্য দিয়ে অরিন্দম আমার খুব কাছে সরে এসেছে। ওকে একজন অন্তরঙ্গ মানুষ বলে মনে হতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, অরিন্দম এমন একজন বিশিষ্ট মানুষ যার সাক্ষাৎ সচরাচর মেলে না এবং ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা খুবই ভাগ্যের কথা। কী বিস্ময়কর ব্যাপার! যে মানুষটিকে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত চিনতামই না, কত সহজে তার সম্বন্ধে এমন উন্নত ধরনের মনোভাব পোষণ করতে শুরু করলাম।

অরিন্দমের ভারী গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি, দীর্ঘ শরীর, পরিচ্ছন্ন দাঁতের সারি, সবকিছু মিলিয়ে ও হয়ে উঠলো একজন বিশিষ্ট পুরুষ। আমার জীবনে এমন পুরুষের সাক্ষাৎ ইতিপূর্বে ঘটেনি।

একজন মানুষ, কিছুক্ষণ আগেও যে কিনা ছিল একান্ত অপরিচিত, নিমেষে সে কী করে আমাকে এমন অভিভূত করে ফেললো, আমি জানি না। কিংবা এমনও হতে পারে, অরিন্দম শুধুমাত্র একটি উপলক্ষ্য। এই মুহূর্তে যে কেউ আমার সামনে এসে দাঁড়াতো তাকেই হয়তো এভাবে গ্রহণ করতাম।

কী বলে একে? প্রথম দর্শনের প্রেম? আমি জানি না, বুঝতে পারি না।

মনের চিকুরে নিজেকে দেখা যায় না। যদি যেত, আমি দোলন, এই মুহূর্তে দেখতে পেতাম, সতেরো বছরের একটি মেয়ে, লম্বাটে ধরণের মুখ, মাথার পিছনে দুলছে পুষ্ট এক বেণী, তার ঘন-কৃষ্ণ চোখের তারায় তারায় জেগে উঠেছে দুরন্ত ব্যাকুলতা, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হচ্ছে অপার্থিব এক সঙ্গীত। এই দোলনকে আমি আগে কখনও দেখিনি। দেখবো বলে ভাবিনি। একে আমি চিনি না।

আমাদের বসতে বলে কণিকাদি আবার বেরিয়ে গেল।

আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল,

কণিকাদির সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত ছিল আমার। ঘরের পরিবেশ—অরিন্দমের উপস্থিতি ক্রমশই আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছিল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘতর হয়ে আসছিল।

অরিন্দমের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম, ও অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, আমাকে এমনভাবে দেখো না অরিন্দম। আমি খুব সাধারণ একটি মেয়ে। এই কলকাতা শহরে হাজার হাজার মেয়ে রয়েছে, যাবা আমার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। অনেক আকর্ষণীয়। আমার দিকে অমন মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকার কিছু নেই।

অরিন্দম আমার ভাষা বুঝলো না। নির্বাক ভাবে বসে রইলো। আমি জানি ও নিশ্চিত আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

মন বিরক্তিতে ভরে উঠলো। অরিন্দমের এই নিলর্জ আচরণ বাস্তবিকই বিরক্তিকর। আধুনিক কোন যুবকের পক্ষে একটি তরুণীর দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকা রীতিমত অশোভনজনক। সামান্য একটু সৌজন্য-বোধ ওর থাকা উচিত ছিল।

সহসা অরিন্দমের দিকে দৃষ্টি সরিয়ে আনলাম। এবং গভীর বিস্ময়ে আবিষ্কাব করলাম, অবিন্দম আমাকে দেখছে না। ও তাকিয়ে আছে খোলা জানালার দিকে। জানালাব ফাঁক দিয়ে এক টুকরো ধোঁয়াটে আকাশ চোখে পড়লো। বর্ষার আকাশের নিত্যনৈমিত্তিক রূপ। যদিও আকাশ দেখতে আমার ভাল লাগে, কিন্তু এই মুহূর্তে আকাশটাকে অত্যন্ত নিষ্প্রভ এবং মলিন বলে মনে হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে কিঞ্চিৎ দুঃখও। অথচ জানি না এই দুঃখ-বোধ কেন? সে কি পৃথিবী অত্যন্ত ম্লান হয়ে গিয়েছে বলে?

অরিন্দম কথা বলে উঠলো, 'আপনি খুব হাঁটতে ভালবাসেন।'

চমকে উঠলাম। এত কথা থাকতে হঠাৎ এ কথা কেন। অস্ফুট স্বরে বললাম, 'সময় সময় হাঁটতে ভাল লাগে। সবারই লাগে।'

'আমার লাগে না।' একটু থেমে ও আবার বললো, 'এই গরমে এতটা পথ হাঁটতে একটুও ভাল লাগতো না আমার।'

'এতটা পথ মানে?'

ভেবেছিলাম আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিব্রতবোধ করবে অরিন্দম। কিন্তু ও খুব সহজভাবে বললো, 'আপনাদের কলেজ এবং বাড়ি দুই-ই আমি চিনি। পথ বেশ দীর্ঘ।' বলতে বলতে ওর চোখে বিচিত্র আলো ফুটে উঠলো। আমি বুঝতে পারলাম, পৃথিবীতে খুব অল্পসংখ্যক মানুষ আছে, যাদের হাসি ফুটে ওঠে চোখের তারায় তারায়। অরিন্দম সেই অল্পসংখ্যক মানুষের দলে।

কী উত্তর দেব। যে কথাটা খুব সহজে বলতে পারতাম সেকথা আমার জিভকে অসাড় করে দিল। কোনক্রমেই বলতে পারলাম না, বাড়ি না হয় চিনতে পার যেহেতু কণিকাদিদের বাড়ির খুব কাছেই থাকি আমি। কিন্তু কলেজ? সে তো দূর পাল্লার পথ অরিন্দম। তাকে চিনলে কি করে? কেন চিনলে?

অরিন্দমকে একথা বলা উচিত না। ওর চোখের হাসি আমি নিভিয়ে দিতে চাই না এখন।

নিঃস্তব্ধ পরিবেশ। শুধু দেওয়ালের ঘড়িটা টিক টিক শব্দ করছে। ও ঘোষণা করছে, বেলা বাড়ছে। যে কোন মুহূর্তে কণিকাদি এসে পড়তে পারে। তার আগেই অরিন্দমকে কিছু বলা দরকার। অরিন্দমকে যেন অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু কী বলবো, কেমন করে বলবো! নতুন করে আবার অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছি। কথার একটা পাহাড় বুকের মধ্যে অনুভব করতে পারছি, কিন্তু প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এ যে কী বিষম জ্বালা, কাকে বোঝাই।

অরিন্দমই আমাকে মুক্তির পথ দেখালো। ও হেসে বলতে লাগলো, 'দেখলেন তো, আপনার কত কথা আমি জানি। আপনি যে বৃষ্টিতে ভিজতে ভালবাসেন, তাও জানি।'

মনে মনে বললাম, ছাদে উঠে যে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে দেখতে ভালবাসি, সে কথাটা আবার ভুম করে বলে বসো না অরিন্দম, আমি তাহলে খুব লজ্জা পাব। শত হলেও আমি মেয়ে।

'রোববার দুপুরে আপনারা সবাই একসঙ্গে বসে খান। আপনাব দাদা খুব মজার মজার কথা বলতে পারেন। তবেই বুঝুন আমি কেমন দুর্ধর্ষ জ্যোতিষী।'

আতঙ্কে আমাব শরীর শিউরে উঠলো। এই মুহূর্তে অরিন্দম যদি বলে বসে, দোলন, তোমার হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দাও তো, আমি তোমার হাতের রেখা গুনবো, তাহলে নির্ঘাৎ আমার নিঃশ্বাস রোধ হয়ে যাবে। যে হৃদপিণ্ডটা এতক্ষণ ধরে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে চলছিল, সেটাও নিমেষে স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু অরিন্দম সেবকম কিছুই বললো না, শুধু চাপা কৌতুকে ওর চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

আবার সেই নিঃস্তব্ধ পরিবেশ। দেওয়ালের বড় ঘড়িটা এখন শুধুমাত্র টিক টিক শব্দই করছে না, ও উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে, বারোটা বাজলো। ওর ঘোষণা এক সময় বন্ধ হলো, কিন্তু শব্দের রেশটা আমার কানে রিণ রিণ করে বেজেই চলেছে। একবার মনে হলো, ছুটে পালিয়ে যাই। বাড়িতে গিয়ে ঢুকে পড়ি। পরমুহূর্তে মনে হলো, অরিন্দম বেজায় ক্ষুব্ধ হবে, অপমানিত বোধ করবে। এ ধরনের কোন কাজ আমি করতে পারি না। কিছুতেই পারি না।

চতুর্দিক আলো করে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালো। সেই খণ্ড আকাশটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গাঢ় ধূসর আকাশ। কিছুক্ষণ আগে এই আকাশকে অসম্ভব বৈচিত্রহীন বলে মনে হয়েছিল, এখন মনে হতে লাগলো, কোন সুদক্ষ শিল্পী খুব যত্ন নিয়ে আকাশের গায়ে সৌন্দর্যের তুলি বুলিয়ে দিয়েছে।

এই সৌন্দর্য বিস্ময়কর। এমন সৌন্দর্য কখনও দেখিনি।

কিন্তু অরন্দিম আমাকে এই সৌন্দর্যটুকুও উপভোগ করতে দিল

না। উঠে গিয়ে সামনের জানালাটা বন্ধ করে দিল। আমার দিকে পিছন ফিরে বললো, 'বৃষ্টি এল।'

ও যে বৃষ্টির ছাঁট থেকে এই ঘরটাকে রক্ষা করলো, দামী দামী আসবাবপত্র, সুদৃশ কার্পেট ; ওর এই সাবধানতা, এই অতি সতর্ক দৃষ্টি আমাকে আঘাত করলো। আমি বলে ফেললাম, 'বাইরের বৃষ্টি সব সময় ঘরে আসে না।'

অরিন্দম আমার দিকে ফিরে তাকলো, উত্তর দিল না। ওর চোখে সেই লুকনো হাসি। এ হাসি আমি চিনি। আবার বললাম, 'বৃষ্টি দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।'

এখনও অরিন্দম উত্তর দিচ্ছে না। ও-কি কথা বলতেও ভুলে গেল ?

'বৃষ্টিতে ভিজতে আরও ভাল লাগে।' বলে উঠলো অরিন্দম।

অ।রন্দমের চোখের হাসি ক্রমশ ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ছে। ও কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলো, তারপর শব্দ করে জানালা খুলে দিল। সরসর করে বৃষ্টির ছাঁট ঘরে ঢুকছে। অরিন্দম জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। জলের রেণু বাতাসে ভাসছে। ওরা অরিন্দমের সঙ্গে খেলা করছে, ওকে ঘিরে নাচছে।

অরিন্দমের চওড়া পিঠ, সুপুষ্ট ঘাড়, একমাথা ওল্টানো চুল আমার মনে বিচিত্র এক অনুভূতি নিয়ে এল। মনে হতে লাগলো, কোন এক উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে কিংবা খুব উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অরিন্দম, ওকে স্পর্শ করে বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। অরিন্দম সম্পূর্ণ নির্বিকার। এই মুহূর্তে ওকে অসম্ভব উদাসীন বলে মনে হতে লাগলো। উদাসীন এবং বলবান পুরুষ।

কতক্ষণ একভাবে বসেছিলাম জানি না। হতে পারে যুগের পর যুগ, যেদিন থেকে পৃথিবীতে জন্মেছি সেদিন থেকে ; আরও কত যুগ বসে থাকবো জানি না।

সহসা গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠলাম। কে আমাকে জাগালো ? কেন জাগালো ?

মনের ঘোর কাটেনি এখনও। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। খুব চেনা মতন। কিন্তু চিনতে পারছি না।

কণিকাদি আমার দু কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'এই দোলন, কী দেখছিস অমন করে? কথা বলছিস না কেন?'

ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমি আর কণিকাদি ছাড়া ঘরে অন্য কেউ নেই। খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট ঘরে আসছে। কণিকাদি তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিল। বৃষ্টির জলে ওর মুখ হাত ভিজে গিয়েছে।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে কণিকাদি বললো, 'অরিন্দমটা দায়িত্বজ্ঞানহীন। তোর সঙ্গে গল্প করতে রেখে গেলাম, কোথায় সরে পড়লো।'

যদিও কণিকাদির কথার স্বরে বিরক্তি মেশানো ছিল, আমার কিন্তু মনে হলো, চকিতে ওর মুখে খুশীর আলো ফুটে উঠলো।

নাকি, দেখার ভুল।

যাব না, যাব না, যাব না। আর কোনদিন ও-বাড়ি যাব না। কোনদিন অরিন্দমের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবো না। ওর সামনে বসবো না। ও কথা বলতে চাইলেও মুখ ঘুরিয়ে থাকবো। পায়ে ধরে সাধলেও মান ভাঙ্গবো না। কখনও না, কিছুতেই না।

মনে মনে জিভ কাটলাম। ছি, ছি, ছি। অরিন্দম কেন পায়ে ধরবে, কেন মান ভাঙ্গাবে। ছিঃ। এ কথা কি ভাবতে হয়, এমন স্বপ্নও কি দেখতে হয়!

নাকি এমন স্বপ্ন দেখতেই ভালবাসে মানুষ। আমার মত মানুষ। চিরদিন আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি। ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসি।

আমার একবার টাইফয়েড হয়েছিল। তখন আমি শৈশব ছেড়ে কৈশোরে পা দিয়েছি। অনেকদিন ধরে ভুগেছিলাম। ভুগে ভুগে

দেহ অস্থিচর্ম-সার হয়ে গিয়েছিল। আয়নার সামনে দাঁড়ালে চোখ ফেটে জল আসতো। কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি আর মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি, এমন কুৎসিতভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে আমাকে মেরে ফেল ঠাকুর। এই প্রার্থনার মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। সত্যি সত্যিই আমি তখন নিজের মৃত্যু কামনা করেছিলাম।

আচ্ছা ভাবুন তো, পৃথিবীর সব মানুষ যদি ভীষ্মের মত হতো। এই যেমন ধরুন, যখন ইচ্ছে করলো, টুক করে মরে গেল, তাহলে পৃথিবীটা এতদিনে নির্ঘাৎ মানুষ-শূন্য হয়ে যেত। কোন না কোন সময় নিজের মৃত্যু কামনা করেনি এমন মানুষ সংসারে বিরল। একদিন না একদিন, রাগে কিংবা দুঃখে কিংবা দারুণ বিতৃষ্ণায় কিংবা প্রচণ্ড হতাশায় বা শুধুমাত্র মৃত্যুকে উপলব্ধি করার বাসনায় মানুষ ক্ষণিকের জন্যে হলেও নিজে নিজের মৃত্যু কামনা করে। বিশেষ করে শৈশবে বা যৌবনে। বার্ধক্যে মানুষ হয়ে ওঠে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন এবং মৃত্যু-কাতর। সে তখন মৃত্যুর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। নিকটের মৃত্যুকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাল্যে বা যৌবনে মনের ভাব থাকে অন্যরকম। মার ওপর রাগ করে আমি বহুদিন মরতে চেয়েছিলাম।

মা অহর্নিশ আমাকে শাসন করতো এবং তখনকার মন দিয়ে বিচার করে বুঝতে পারতাম, সেই শাসনের পিছনে প্রায়ই কোন যুক্তি থাকতো না। যা থাকতো, তা আমার প্রতি অপরিসীম কর্তৃত্ববোধ বা এক ধরনের নিষ্ঠুরতা, যার সন্ধান মা নিজেও হয়তো পেত না। সেই নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে থাকতো মার অবচেতন মনে। সন্তানকে শাসন করার নামে নিজেকে খুশী করার ব্যর্থ প্রয়াস।

মার এই শাসন আমার মনে মর্মান্তিক হয়ে বাজতো। আর তখনই প্রতিশোধ নেবার বাসনায় উন্মত্ত হয়ে নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করতাম। এই কামনার মধ্য দিয়ে মাকে চরম দণ্ড দেবার পথ খুঁজে পেতে চাইতাম।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো মানুষ মৃত্যুকে আহ্বান করে নিয়ে আসতে পারে না। মৃত্যু তো কারও ক্রীতদাস না, যে ইঙ্গিত করা মাত্র এসে উপস্থিত হবে।

কৈশোরের সেই সময় থেকে ছুটো বিপরীত-মুখী চিন্তা আমার মনে খেলা করতো। সময় সময় যেমন মরতে চাইতাম, আবার বাঁচার স্বপ্নও দেখতাম। দেখতাম প্রচণ্ডভাবে। সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন। টেকনিকালার স্বপ্ন। গোটা স্বপ্নটাই রঙ্গীন। বাড়ি, ঘর, আকাশ, মানুষজন সব কিছুই রঙ্গীন। ভাবুন তো কী বিচিত্র ব্যাপার! টেকনিকালার স্বপ্ন! আর এই স্বপ্ন দেখতাম জেগে জেগে। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার অনেক জ্বালা। স্বপ্ন তখন নিজের ইচ্ছামত চলা ফেরা করে। বিষয়বস্তু যে সদা সর্বদা রঙ্গীন হবে তার কোন মানে নেই। নেহাৎ সাদা মাঠা ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-হোয়াইট স্বপ্ন। সময় সময় দারুণ ভয়ের কোন দৃশ্য, যেটা কিনা জেগে থাকলে কখনই দেখতে চাইতাম না। যেমন ধরুন, দেখছি, ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছি। ছুটতে ছুটতে উঁচু কোন পাহাড়ের কিনারায় এসে ব্রেক কষার মত কবে ঘোড়াটা সামনের ছুপা তুলে দাঁড়িয়ে পড়লো। কী ভয়ঙ্কর উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত! ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে দেখলাম আমি তখনও ভয়ে কাঁপছি। জেগে স্বপ্ন দেখার মধ্যে এ সবের বিড়ম্বনা নেই। বিশ্রী দৃশ্যগুলোকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

টাইফয়েডের পর সুস্থ হয়ে আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। এক নাগাড়ে বহুদিন স্বপ্ন দেখেছি। এখন আর দেখি না। সব স্বপ্ন আমার শেষ হয়ে গেছে।

ভাবুন তো কী মর্মান্তিক ব্যাপার, দোলন বলে একটি মেয়ে ছিল, যে কিনা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতো—ইচ্ছে মত স্বপ্ন। সে দেখতো, ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটে আসছে কোন এক অচিন রাজপুত্র, কোমরবন্ধে তার আঁটা রয়েছে বাঁকা তলোয়ার, মাথায় শ্বেতশুভ্র উষ্ণীষ, সে এসে দাঁড়ালো দোলনের কাছে, স্মিত-হাস্যে ছুই হাত প্রসারিত করে

তাকে আহ্বান জানালো। কিংবা কুলকুল রবে বয়ে চলেছে এক নদী। জলের স্রোতে গা ভাসিয়ে আসছে এক ময়ূরপঙ্খী, দোলন বলে সেই মেয়েটি বসে আছে তারই প্রতিক্ষায়, সে আসবে, যাকে ঘিরে তার এত আশা, আকাঙ্খা।

কিন্তু সে তো এল না। নাকি এসে চলে গেল, দোলন জানতেও পারলো না।

মা হয়তো বহুক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছে, আমি তন্ময় হয়ে স্বপ্ন দেখে চলেছি। এক সময় মার স্পর্শে ঘোর কেটে যায়, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। মাকে চেনার চেষ্টা করি। আমার অবস্থা দেখে মার চোখে মুখে আশঙ্কা ঘনিয়ে ওঠে, নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলতে থাকে, 'তুই কি পাগল হয়ে যাবি দোলন ?'

আমার বুক কেঁপে ওঠে। সত্যি সত্যি আমি কি পাগল হয়ে গেলাম!

সত্যিই আমি সেদিন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। না হলে অরিন্দমের মত অতি সাধারণ একটি ছেলেকে দেখে অমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম কেন।

কী আছে ওর ? রূপ ? অমন রূপ তো কত দেখেছি।

গুণ ? ওর তো কোন গুণ নেই। দাদার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ওর চেয়ে বেশী গুণী। কলেজের প্রফেসররা ওর চেয়ে কত বেশী বিদ্বান, বুদ্ধিমান।

তবু আমি সেদিন মরেছিলাম।

মরবো বলেই মরেছিলাম।

তুমি আমাকে এভাবে মারলে কেন অরিন্দম ? আমি তো বাঁচতে চেয়েছিলাম। তোমাকে ঘিরে ফুলে ফলে, যেমন ভাবে একটি লতা গাছকে অবলম্বন করে বাঁচতে চায়, সে রকম।

অরিন্দম, আমি কি কোনদিন তোমাকে বোঝাতে পারবো, সেদিন বৃষ্টির ছাঁট ঘরে আসছে জেনেও আমি জানালা বন্ধ করে দিতে চাইনি

কেন। ঘর-ভবা বাতাস ছিল, বাতাসে ছিল অফুরন্ত অক্সিজেন, তা সত্ত্বেও আমার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠেছিল, আমি কামনা করছিলাম জোয়ারের স্রোতের মত আরও বাতাস ঘরে ঢুকুক—আরও বাতাস, আবও আলো ; সেই মুহূর্তে উন্মাদেব মত আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, শুধু বাঁচতে—এ কথা কি কোনদিন তোমাকে বোঝাতে পারবো ?

বা, জগতেব শ্রেষ্ঠ সুখী মানুষ বলে নিজেকে অনুভব কবাব মধ্যে এক দুর্লভ আনন্দ নিহিত থাকে, যে আনন্দ থাকে অনুচ্চারিত, শুধু হৃদযেব তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সে ঝঙ্কাব তোলে—সেই ঝঙ্কার কি কোনদিন তোমাব হৃদযে পৌঁছে দিতে পারবো অরিন্দম ?

বা, প্রবল বিকারেব ঘোবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল আমার ইন্দ্রিয় সব, চোখেব সামনে শত সহস্র হীরার মত ঝক ঝক কবছিল একটা ভবিষ্যত—উজ্জ্বল, দীপ্তিময়, নির্মল ; কিন্তু সবকিছুই অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে, যেহেতু, যে মন দিয়ে সব সুখকে স্পর্শ করা যায়, সেই মন হযে গিয়েছিল বিকল, যাব ফলে মনেব মধ্যে এত যে কথা জমে উঠেছিল, তাব একটিকেও তোমাব কাছে পৌঁছে দিতে পারলাম না, আমাব সেই ক্ষণিক দুর্বলতার সন্ধান কি কোনদিন তুমি পাবে ?

তীব্র প্রত্যাশা, নীবব কাতব-ধ্বনি, মুখ ফেবাও অবিন্দম ; বৃষ্টি না, আকাশ না, বাইবের শূন্যতা না, শুধুমাত্র তুমি, নির্জন একটি ঘর, তোমার দীর্ঘ শক্তিশালী দেহ, কোন সু-দক্ষ ভাস্কবের গৌরবজ্জ্বল কীর্তি—সেই মুহূর্তে আমি একটিমাত্র কথাই বলতে চেয়েছিলাম, অমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে রেখো না অরিন্দম, আমার দিকে ফিবে তাকাও, তাকিয়ে থাকো ; সেই অব্যক্ত ধ্বনি কি তোমাব কানে কোনদিন পৌঁছে দিতে পারবো ?

এ কী করছি আমি! কেন ধীরে ধীরে নিজেকে এক নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে চলেছি ? কী অসহ্য রকমের নির্বোধ হয়ে যাচ্ছি আমি!

একদিন ছুদিন করে এক সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু সেই লজ্জাকর পরিস্থিতির হাত থেকে কিছুতেই মুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ আমি মুক্তি চাই। যেমন করে হোক অরিন্দমের এই জঘন্য চক্রান্তের জাল আমাকে ছিন্ন করতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত স্থির করে ফেললাম, আসানসোল-এ থাকেন সেজ মাসীমা, সেখানেই যাব। মাকে রাজী করানো গেল। দাদাকে নিয়ে চলে গেলাম।

নতুন পরিবেশে পুরনো পচা গুমোট ভাবটা কেটে গেল।

বেশ কিছুদিন থাকলাম সেখানে।

ফিরে আসার পর মনে হতে লাগলো, একটা বড় রকমের অসুখ থেকে উঠলাম। যদিও শরীর এবং মন অবসন্ন তথাপি সান্ত্বনার কথা হচ্ছে এটাই, যে ব্যাধিটা এতদিন ধরে আমার মধ্যে বাসা বেঁধে ছিল, সেটা আর রইলো না।

এ-ও কিছু কম স্বস্তির কথা না।

সেই যে কণিকাদিদের বাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম, ওদিকে আর পা বাড়াইনি। কণিকাদিও আর ডাকেনি। প্রথম প্রথম আশঙ্কা হয়েছিল, কলেজ থেকে ফেরার পথে কণিকাদি না আবার আমাকে ধরে ফেলে। বাড়ি পৌঁছে দেবার নাম করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু না, কণিকাদি আমাকে ধরলোও না, বাড়িতেও টেনে নিয়ে গেল না।

কলেজ থেকে হেঁটেই বাড়ি ফিরি। কিন্তু কণিকাদিদের বড় গাড়িটা একদিনও রাস্তার ধার ঘেঁষে চলেনি, একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে বাজেনি।

শেষ পর্যন্ত একদিন পরম বিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, আমার অন্তরে এক অভিমানিনী নারী আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। এতদিন হয়ে গেল, একদিনও আমার খোঁজ করলো না কণিকাদি। এই ঔদাসীন্যের মধ্য দিয়ে ও এক রকম আমাকে অপমানই করলো।

অথচ এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার কোন উপায় আমার জানা নেই। নিরুপায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া আমার করণীয় কিছুই রইলো না।

মানসিক বিরাট এক দ্বন্দ্বে যখন নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছিলাম, সেই সময় একদিন অতর্কিতে নিজের নামের ডাক শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার নামটা যে এত অসাধারণ হয়ে কানে বাজতে পারে এই অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে ছিল না। আমি পিছন ফিরে তাকাতেও ভুলে গেলাম। বিদ্যুৎ-পৃষ্টের মত ফুটপাথের মাঝে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার আশপাশ দিয়ে অগণিত মানুষ যাতায়াত করছে। বিকট শব্দ করতে করতে মানুষ-বোঝাই একটা ট্রাম চলে গেল। কানের কাছে একজন ফেরি-অলা হঠাৎ কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠলো। সব শব্দই আমার কানে আসছে, কিন্তু কান পেরিয়ে অন্তরে প্রবেশের পথ পাচ্ছে না।

শূন্য, শূন্য, অফুরন্ত শূন্যতা। সেই শূন্যতার মাঝে বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

'আপনি খুব তাড়াতাড়ি হাঁটেন তো। এত চেষ্টা করেও ধরতে পারছিলাম না, তাই শেষ পর্যন্ত নাম ধরেই ডাকতে হলো।' অরিন্দম আমার এত কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে ওকে আমি স্পর্শ করতে পারি। নিজের মুখ সামান্য একটু তুলে ধরলে হয়তো ওর উষ্ণ নিঃশ্বাসও অনুভব করা সম্ভব।

আমার চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে যে অগণিত মানুষ, মুহূর্তের জন্যে আমি তাদের ঈর্ষা করে ফেললাম। তারা আমার চেয়ে কত বেশী সক্রিয়, কত বেশী রকমের উদ্দেশ্য পূর্ণ তাদের গতিবিধি। এরা সবাই আমার চেয়ে বেশী সুখী কিংবা দুঃখী যাই হোক না কেন, কেউ আমার মত শূন্যতার মাঝে তলিয়ে যায়নি।

অরিন্দম আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল। চিৎকার করে একটা

ট্যাক্‌সি ডাকলো। সিনেমার সাজানো দৃশ্যের মত ঝাঁ করে ট্যাক্‌সি এসে দাঁড়ালো ফুটপাথ ঘেঁষে।

অরিন্দম বললো, 'আসুন।' বললো ঠিক না, ও যেন আমাকে আদেশ করলো। সেই আদেশ পালন করার সমস্ত দায়দায়িত্বই আমার। বাধ্য মেয়ের মত আমি ট্যাক্‌সিতে গিয়ে উঠে বসলাম।

অরিন্দম এসে আমার পাশে বসলো। আরাম করে বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'চলিয়ে।' তীব্র গতিতে ছুটে চললো গাড়ি।

আমি ছুটে চলেছি। চলেছি এক নক্ষত্র থেকে আর এক নক্ষত্রে। এক জগৎ থেকে আর এক সৌর জগতে। এক সময় মনে হতে লাগলো, আমি আর শূন্যে বিচরণ করছি না, আমি নেমে এসেছি পৃথিবীর বুকে। বিরাট এক হ্রদ, ওর জলে লেগেছে গভীরতার নীল পরশ, আমি সেই হ্রদে রাজহংসী হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার আরও মনে হতে লাগলো, বরিশালের সেই ছোট্ট পাখিটা পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। ও নেচে নেচে আমাকে গান শোনাতে লাগলো। সেই সঙ্গীত আমার অন্তরে ঝঙ্কার তুলছে।

অতর্কিত আঘাতে আমি জেগে উঠলাম, নিজেকে সামলে নিতে নিতে প্রশ্ন করলাম, 'কি হলো?'

অরিন্দমের দিকে চোখ ফেরাতেই চোখাচুখি হয়ে গেল। ও হাসলো। বললো, 'রেড লাইট, গাড়ি ব্রেক কষলো।'

এত জোরে ব্রেক কষে কখনও! আর একটু হলে পড়ে যেতাম যে।

অরিন্দম আমার নীরব ভাষা শুনতে পেল। ড্রাইভারকে সতর্ক করে দিল, আর একটু সাবধান হয়ে গাড়ি চালাতে বললো।

আমার মনের ঘোর কাটেনি তখনও। আমি যেন আকণ্ঠ নেশায় ডুবে আছি। ভাল করে কোন কিছুই উপলব্ধি করতে পারছি না। আমাকে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অরিন্দম বিশ্রী একটা কাণ্ড করে বসলো। নিজের দুই হাতের মধ্যে আমার একটা হাত তুলে নিয়ে বললো, 'ভয় লাগছে?'

আমি ঘাড় নাড়ালাম। অরিন্দম বিশ্বাস করলো না। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে আবার বললো, 'ভয় কি, আমি তো আছি।'

ভয় কিংবা ভরসা কিছুই পাচ্ছি না আমি। আমি শুধু অনুভব করছি, থেমে-যাওয়া গাড়িটা আবার ছুটতে শুরু করেছে। আমাদের তুই দিকে অজস্র বাড়ি, মানুষ, ট্রাম, বাস. গাড়ি। সবাইকে পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চলেছি।

এক সময় অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় যাচ্ছি?'

অরিন্দম কি আমার কথা শুনতে পেল না? ও উত্তর না দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি ওর মুখ দেখাব চেষ্টা করলাম। ওর মুখ অন্যদিকে ফেরানো, ভালভাবে দেখা গেল না। সময় সময় চেনা মানুষের মুখও কী বিষম অচেনা বলে মনে হয়। অরিন্দমকে সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষ বলে ভ্রম হচ্ছিল।

শুধু অচেনা না, ও একজন নিষ্ঠুর মানুষ। নিষ্ঠুর না হলে মানুষ নিজের তুই হাতের মধ্যে অন্য একটা হাত এইভাবে ধরে রাখে! ও কি বুঝতে পারছে না, আমি কী ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ করছি, কী সীমাহীন অসহায়তা আমাকে বেষ্টন করে ফেলছে।

আমি নীরব ধিক্কারে মুখরিত হয়ে উঠলাম, ছিঃ অরিন্দম, তুমি না ভদ্রলোক। তোমার ব্যবহার আর একটু বেশী ভদ্রচিত হওয়া উচিত ছিল।

চেষ্টা করেও একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারলাম না। পারলে ভাল হতো। কিন্তু সময় কালে জিহ্বা কী ভয়ানক শত্রুতা করতে শুরু করলো। কথাগুলো ক্রমাগত বুকের মধ্যে পাক খেতে লাগলো, কিন্তু জিভ পিছলে একটি কথাও বাইরে বেরোতে পারলো না।

বাড়ি ফিরতে অনেক দেরী হয়ে গেল।

বড় রাস্তার ওপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে অরিন্দম চলে গেল।

আমাদের বাড়িটা যদিও এখান থেকে দেখা যায় না, আমি জানি, মাত্র কয়েক গজ দূরে রং-চটা একটা বাড়ি রয়েছে, সেই বাড়ির একতলায় গুটি তিনেক অন্ধকার-অন্ধকার মতন ঘর আছে, সেই ঘরের একটা ঘরে দোলন বলে একটি মেয়ে থাকে, যে এই সময় অন্যান্য দিন গল্প করতে করতে মার সঙ্গে বসে ভাত খায়। আমার দেরী দেখে মা নির্ঘাৎ দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সব কাজ ফেলে রেখে ব্যাকুল দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ জেগে উঠলাম। দ্রুতবেগে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম।

যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু মা তো ব্যকুল ভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নেই। মা যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই আমার পা অসাড় হয়ে গেল। একবার মনে হলো, ছুটে পালাই। কিন্তু সে শক্তিও আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

কণিকাদি আমাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'ঐ তো দোলন আসছে।'

মা আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার, পরক্ষণেই কণিকাদির সঙ্গে গল্প করতে লাগলো।

আমি কাছাকাছি যেতেই কণিকাদি বললো, 'এত দেরী যে?'

উত্তর দিতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। মনে হচ্ছিলো, গলা অসম্ভব কাঁপবে।

কণিকাদি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'এত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভাল আছে তো?'

মা সগর্বে বলে উঠলো, 'ওর স্বাস্থ্য খুব ভাল, সহজে অসুখ করে না। ছেলেবেলায় ও খুব ভুগতো। তখনই জানতাম, পরের দিকে ওর শরীর খুব ভাল যাবে। ভগবান সব কিছুই মেপে পাঠান। যে প্রথমে ভোগে, পরে ভোগ করে।' কথা বলতে বলতে মা হেসে

উঠলো, যেন দারুণ মজার কথা বলে ফেলেছে। মার মত মানুষরা, যারা কিনা জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়ে দেয় অপরের বেগার খেটে কিংবা সংসারের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি কর্তব্য পালন করতে করতে, তারা ভুলে যায় যে তাদের ভাগেও কিছুটা পাওনা বরাদ্দ আছে বা থাকা উচিত। মা হয়তো এসব ভুলে বসে আছে। ইদানীং মার একটা দোষ প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। সেটা হলো, মা যদি ঘুণাক্ষরে টের পায়, অমুক মানুষটা খুব ধনী, তা হলে দিগবিদিগজ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে, তাতে মার কোন স্বার্থসিদ্ধি হোক বা না ই হোক।

কণিকাদি মার কথা শুনেও শুনলো না। আমার একটা হাত ধরে আবার প্রশ্ন করলো, 'আজ এত দেরী হলো কেন দোলন? কতক্ষণ ধরে বসে আছি।'

মা এবং কণিকাদির পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বললাম, 'আপনি তো বসে নেই, দাঁড়িয়ে আছেন। অসম্ভব মাথা ধরেছে, চানটা করে আসি।'

যদিও মাথা ধরার কথা বললাম, কিন্তু আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে, মাথা নামক বস্তুটি এই মুহূর্তে সত্যি সত্যি আমার ঘাড়ের ওপর বসানো রয়েছে কিনা।

কণিকাদি আমাকে চান করার সুযোগটুকুও দিল না। আমার পিছন পিছন ঘরে এসে ঢুকলো। আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এই মুহূর্তে কণিকাদির সঙ্গ আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। এখন আমি একলা থাকতে চাই। সম্পূর্ণ একলা কিছুক্ষণ আগে বিরাট উত্তেজনাপূর্ণ যে নাটকের অনুষ্ঠান হয়ে গেল তার বিশিষ্ট ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল সে দোলন—আমি। আমি এখন নতুনভাবে নিজেকে অনুভব করতে চাই.। যে চরিত্রে আমি অভিনয় করেছিলাম, অনুভব করতে চাই, আমি সেই চরিত্রের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলাম কিনা। কিন্তু কণিকাদি আমাকে সে সুযোগ দিল না।

মাও সময় বুঝে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। কাজের অজুহাত দেখিয়ে রান্নাঘরে সরে পড়লো।

কণিকাদি এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কেন কণিকাদি? আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বললাম, 'অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন, না?'

কণিকাদি বললো, 'বসে না। দাঁড়িয়ে।'

কণিকাদির হালকা কথায় আমার মনে সাহস ফিরে এল। স্বাভাবিকভাবে বলার চেষ্টা কবলাম, 'নিজের অস্ত্র নিজের কাছেই ফিরে এল। একে বলে ব্যুমেরাং।'

ভেবেছিলাম কণিকাদি হেসে উঠবে। কিন্তু ও হাসলো না। উপরন্তু গম্ভীরভাবে বললো, 'কলেজ ছুটির পর বাড়ি ফিরে আসিস।'

দপ করে মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠলো। রুক্ষস্বরে বললাম, 'আমি কি কলেজের পর রাস্তায় রাস্তায় ঘুবে বেড়াই?'

কণিকাদির আচরণ রীতিমত বিস্ময়কর। রাগের বদলে কণিকাদি যেন খুশী হলো। আদর করে আমার চিবুক স্পর্শ করে বললো, 'দোলন খুব লক্ষ্মী মেয়ে, কখনও অযথা সময় নষ্ট করে না, ছুটি হলেই বাড়ি ফিরে আসে। আমি কিছু মনে করে বলি নি ভাই। জানিস তো, সুন্দরী মেয়েদের অনেক জ্বালা। তাদের নামে খুব নিন্দে রটে। অ-কারণেই রটে।'

কণিকাদিকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, 'তোমার কোন ভয় নেই, আমার নামে নিন্দে রটবে না।' ফস করে কণিকাদিকে তুমি বলে ফেললাম।

কণিকাদি কথা বললো না, আঙ্গুল দিয়ে আমার চিবুক স্পর্শ করে সেই আঙ্গুল চুম্বন করলো।

সহসা খুশীতে মনটা ভরে গেল। বললাম, 'কতদিন পরে এলে।'

'না-না ঝামেলা চলছিল, খোঁজখবরও নিতে পারিনি তোদের।' করুণ মুখ করে বললো কণিকাদি।

'তোমার আবার ঝামেলা।'

'সত্যিরে বহু ঝামেলা ছিল, বিশ্বাস কর।' কণিকাদির কথা সবাসরি অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

কথা বলতে বলতে কণিকাদি রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। মাকে উদ্দেশ করে বললো, 'দোলনকে নিয়ে আজ সিনেমায় যাব।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না, না। রোজ রোজ কী! সেদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কত কী খাওয়ালেন, আজ আবাব সিনেমা, না, না।'

'তাব বদলে তুই না হয় আজ আমাকে খাইয়ে দে। কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমাকে তুমি বলেছিলি দোলন।'

কণিকাদির কথায় লজ্জা পেলাম। কথা ঘোরাবার উদ্দেশে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'বেশ তো, খেয়ে যাও না।'

মা বিব্রতভাবে বললো, 'কী সব ছাইভস্ম রান্না, এদিয়ে কি কাউকে খেতে বলা চলে।'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'খুব চলে। বড়লোকদেরও মাঝে মাঝে শুক্তো-চচ্চড়ি খেতে ইচ্ছে করে।'

কণিকাদি আমার একটা হাত চেপে ধরে গাঢ় স্বরে বললো, 'বড়লোক হওয়াটা কি খুব দোষের যে শুধু শুধু উপহাস করবি। তাছাড়া, আমি নিজেকে বড়লোক বলে ভাবি না। আমার স্বামী হয়তো কিছু টাকা উপার্জন করে, তাতে আমার কি। আমি খুব গবীবের মেয়ে ছিলাম রে।'

বলতে পারতাম, স্বামীর্ উপার্জনেই স্ত্রীরা ধনী হয়, কিন্তু বললাম না। বরং কণিকাদিকে খুশী করতে বললাম, 'আমি কিছু মনে করে বলিনি কণিকাদি। চলো, খাবে চলো।'

কণিকাদি খুশী মনে বললো, 'চল।'

খাওয়া দাওয়ার পর কণিকাদি চলে গেল।

অরিন্দমকে নিয়ে আমি ক্রমশই বিভ্রান্ত বোধ করছি। ও আমাকে জ্বালিয়ে মারছে।

খাওয়ার পব বিছানায় কিছুক্ষণ গড়ানো আমার পুরনো অভ্যেস। সেই পুরনো অভ্যেসটাকে আজ আর নিজের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। মনে হতে লাগলো, এই ভ্যাপসা গরমে বিছানায় শুয়ে থাকার চেয়ে উন্মুক্ত ছাদে উঠে মেঘ দেখা অনেক আরামদায়ক।

মাকে ফাঁকি দিয়ে ছাদে উঠে গেলাম।

নিরালা দুপুর, নির্জন ছাদ। কাঠ ফাটা রোদ। ঘামে সমস্ত শবীর ভিজে গিয়েছে। মাথার ওপর সূর্য গনগন করে জ্বলছে। আমাকে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করছে। বর্ষার আকাশ এমন মেঘ-শূন্য হওয়ার কথা না। কিন্তু আজকের আকাশ ছিল আশ্চর্য রকমের পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন। সামান্য এক খণ্ড মেঘের উপস্থিতি নেই সেখানে। সমস্ত আকাশ জুড়ে রয়েছে প্রখর এক দীপ্তি। সেই দীপ্তি আমাকে দগ্ধাচ্ছে। ছুটে যে কোথাও পালিয়ে যাব, কোন এক কোণে, যেখানে আছে একটুকরো স্নিগ্ধ ছায়া, তেমন কোন আশ্রয় আমার চোখে পড়লো না।

এই যে তুমি অরিন্দম, দেখে মনে হয়েছিল একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তুমি—আর সেই তুমিই কিনা আমাকে দগ্ধে মারছো।

কী এমন তুমি যে দিশাহারা হয়ে ছাদে উঠে এলাম? ক্ষণে ক্ষণে তোমার কথাই ভাবছি, ভাবতে ভাবতে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি!

আমাকে এমন অস্থির করে তুলছো কেন, এমন দিশাহারা!

এই সময় কেউ ছাদে ওঠে। পাগল ছাড়া। তুমি কি আমাকে পাগল করে ছাড়বে অরিন্দম!

বিকেল পর্যন্ত ছাদেই রইলাম।

ধীরে ধীরে প্রখর আলো মন্থর হয়ে আসছে। আর সময় নষ্ট করা চলে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কণিকাদিদের গাড়ি এসে দাঁড়াবে এ বাড়ির সামনে। আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাবে বলে।

নীচে নেমে এলাম। মা তাড়া লাগালো, 'শিগগির সাজগোজ করে নে। কণিকা এলো বলে।'

কণিকাদিদের গাড়ি ক্রমাগত হর্ন টিপছে। ত্বরিতগতিতে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

গাড়ির পিছনের সীটে কণিকাদি বসে আছে। ড্রাইভারের পাশে কে ও বসে! অরিন্দম! অরিন্দম আবার কেন!

কণিকাদি তাড়া লাগালো, 'শিগগির উঠে আয়। শো আরম্ভ হয়ে গেল।'

তাড়াতাড়ি কণিকাদির পাশে গিয়ে বসলাম।

কণিকাদি বললো, 'তোর কি হয়েছে রে দোলন, একটা সাদা শাড়ি পরে এলি। এ সাজে কেউ সিনেমায় যায়।'

'আমি সিনেমায় যাচ্ছি কণিকাদি, বিয়ে করতে না।' কথা বলে দারুণ জোরে হেসে উঠলাম।

কণিকাদিও হেসে ফেললো। 'তুই যেদিন কনে হবি, আমি নিজের হাতে তোকে সাজাবো।'

কণিকাদি যদিও আমাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বললো, আমার কিন্তু মনে হলো, এ কথার সবটা শুধুমাত্র আমাকে উদ্দেশ্য করেই না, সামনে যে বসে আছে, আপাত দৃষ্টিতে যাকে মনে হতে পারে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, এর কিছুটা অংশ—বেশী অংশটাই হয়তো বা, তারই উদ্দেশ্যে বলা।

জানি না আমার বোঝার ভুল কিনা।

আমাকে উত্তর দিতে না দেখে কণিকাদি আবার বললো, 'অবিশ্যি তুই যে খুব সেজে আসিসনি ভালই করেছিস। সবাই তা হলে তোকেই দেখতো, কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকাতো না।'

এবারও মনে হলো, কণিকাদি যদিও আমার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললো, এর একটি বর্ণও আমার উদ্দেশ্যে বলা না। সেই সামনের লোকটি, যে কিনা নির্বিকারচিত্তে ড্রাইভারের পাশে বসে

আছে, তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, সেই অরিন্দম, ওর পুষ্ট ঘাড়, চওড়া পিঠ, বসার দৃঢ় ভঙ্গি, সব কিছু মিলিয়ে এক শক্তিশালী পুরুষ, যে, তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা।

আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, 'তাতে তোমার আর ক্ষতিবৃদ্ধি কি হতো। যিনি দেখার তিনি চিরদিন তোমাকেই দেখবেন।'

কণিকাদি চমকে আমার দিকে তাকালো, 'মানে? কে আমাকে চিরদিন দেখবে?'

অরিন্দম যে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে পিছনের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলো, বুঝতে পারলাম।

আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললাম, 'জামাইবাবু। অর্থাৎ তোমার বর।'

কণিকাদি জোরে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে আমার গায়ে ঢলে পড়লো।

মনে হলো, অরিন্দমের বুক থেকেও যেন বড় একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

নাকি আমার দেখার ভুল।

হলে কণিকাদিকে মাঝে রেখে আমি আর অরিন্দম দু পাশে বসলাম।

আমার বুকের মধ্যে ছোট একটা যন্ত্রণা ঘুরপাক খেতে লাগলো। ইচ্ছে করলে কণিকাদি আমাকেই মাঝখানে বসাতে পারতো। সেটা শোভন হতো। আমার অন্যপাশে বসেছে বিরাট গোঁফঅলা একটা লোক। হাজার হোক, আমি একজন কুমারী মেয়ে। বয়স কম। সবচেয়ে বড় কথা, আজকের দিনে আমি কণিকাদির অতিথি। একজন ন্যায়-পরায়ণা মহিলা হিসেবে কণিকাদির উচিত ছিল আমাকেই মাঝখানে বসানো।

কিন্তু তাহলে কি আমি এমন শান্তভাবে বসে থাকতে পারতাম।

অবিন্দমের বাহু যদি আমার বাহু স্পর্শ করতো কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে, সেই সময় কি আমার মনে প্রচণ্ড অস্থিরতা জেগে উঠতো না! তার চেয়ে এই ভাল। আমি অনেক শান্তচিত্তে সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। অনেক স্থির ভাবে বসে আছি।

ইণ্টারভেলের সময় অরিন্দম আইসক্রিমের একটা কাপ আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। আমি হাত বাড়ালাম। অরিন্দমের আঙ্গুল আমার আঙ্গুল স্পর্শ করলো। উষ্ণ স্পর্শ। চকিতে অরিন্দমের দিকে তাকালাম। অরিন্দমের চোখের তারায় তারায় একটা সুখ ঘুরে বেড়াচ্ছে। অরিন্দম সুখী হয়েছে।

অরিন্দম, তুমি যে সুখী হয়েছো, বিশ্বাস করো তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কণিকাদি অনর্গল কথা বলে চলেছে, 'জানিস দোলন, তোর মত বয়সে, তখনও আমার বিয়ে হয়নি, আমি বেজায় অহঙ্কারী ছিলাম। ধন দৌলতের অহঙ্কার না। আমার বাবা গরীব ছিলেন। অহঙ্কার ছিল অন্য ধরনের। আমি নিজেকে নিয়ে খুব গর্ববোধ করতাম। কেন যে করতাম তাও ঠিক বুঝতাম না। রূপসী ছিলাম অবশ্য। লোকে তা-ই বলতো। শুধু যে রূপের অহঙ্কার ছিল তা-ও না। আমার শুধু মনে হতো, আমি আর দশটা মেয়ের চেয়ে ভিন্ন এবং এই ভিন্ন হওয়া নিয়েই ছিল আমার গর্ববোধ। কোন ছেলের দিকে তাকিয়েও দেখতাম না। কিন্তু ওরা যে সর্বক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আমার দৃষ্টি ওদের দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করে— বুঝতাম। বুঝতাম বলে গর্ব আরও বেড়ে যেত। নিজেকে দামী বলে কল্পনা করতে পারার মধ্যে বিরাট সুখ আছে। আমি সেই সুখকে অনুভব করতাম।'

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'এখন করো না?'

কণিকাদি চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। বললো, 'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারি না।'

মনে মনে হাসলাম, বুঝতে তুমি ঠিকই পার, কিন্তু মুখ খুলতে চাও না। একথা মুখ ফুটে ওকে বলা যায় না অবশ্য।

ধীরে ধীরে বাতিগুলো নিভছে।

যদিও এখন স্পষ্টভাবে কাউকে চেনা যাবার কথা না, আমি সন্তর্পণে পাশের দিকে তাকালাম। মনে হলো, অরিন্দম এতক্ষণ আমার দিকেই তাকিয়েছিল।

নাকি আমার বোঝার ভুল।

সাধারণত রাতগুলো ভীষণ দীর্ঘ বলে মনে হয় আমার। কিছুতেই যেন শেষ হতে চায় না। শেষরাত্রের দিকে প্রায়ই ঘুম ভেঙ্গে যায়। আর ঘুম আসতে চায় না। অথচ সেই সময় উঠে কী করবো, তাই বাধ্য হয়ে শুয়ে থাকতে হয়।

সিনেমা থেকে ফিরে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুয়ে পড়লাম। অন্যান্যদিন খাওয়ার পর দাদার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প-সল্প হয়। আজ বড় রকমের একটা হাই তুলে শুয়ে পড়লাম। এই শুয়ে পড়ার দরকার ছিল। খুব দরকার ছিল। ব্যাক-প্রোজেকশনে কতগুলো দৃশ্য আমি আবার নতুন করে দেখতে চাই। সেই বৃষ্টির দৃশ্য, খোলা জানালা দিয়ে জলের ছাট ঘরের মধ্যে আসছে, জানলা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘকায় বলবান এক পুরুষ, তার চুল স্পর্শ করছে বৃষ্টির রেণু, সে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, উদ্দেশ্যহীন নির্বিকার তার ভঙ্গি; আরও কতগুলো দৃশ্য—তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি, চোখের নিমেষে পট পরিবর্তন হচ্ছে, বাড়িঘর মানুষজন কাছে আসছে, দূরে সরে যাচ্ছে। আবার কোন নতুন দৃশ্য। বিরাট মাঠ, প্রশস্ত আকাশ, সবুজ গাছ-গাছালি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রেড রোড, নিবিড় একটু স্পর্শ—স্পর্শে এত ভাষা, এত উদ্বেগ, এত সুখ, এত অস্থিরতা—সব, সব আমি আবার নতুন করে অনুভব করতে চাই।

টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলো বারংবার দেখলাম। আমার সমস্ত লজ্জা ভয় সঙ্কোচ দূর হয়ে যেতে লাগলো।

একসময় আমি হয়ে উঠলাম অত্যন্ত সাহসী। দম্ভ করে মনে মনে বলতে লাগলাম, তোমাকে আর ভয় কবি না অবিন্দম। সারাক্ষণ যদি তুমি আমাব হাত ধরে থাকো তা হলেও না। তাব চেয়ে দুঃসাহসী কোন কাজও যাদ করতে চাও, অর্থাৎ কিনা সেই বাসনা যদি তোমার মধ্যে এসে থাকে, বিশ্বাস করতে পাবো, আমি তাহলে খুশীই হবো।

কী লজ্জা, কী লজ্জা!

এমন কবে কোনদিন তো ভাবতে চাইনি। অথচ কত সহজে ভেবে বসলাম। কত সহজভাবে ব্যাভিচাবে লিপ্ত হয়ে পড়লাম! নতুন একটা জীবন কত অনায়াসে শুরু হয়ে গেল। এক পুরনো দোলন কত অনায়াসে নতুন এক দোলনে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

রাত এখন গভীর। আমাব পাশে শুয়ে আছে মা। মা গাঢ় নিদ্রায তলিয়ে আছে। অন্য ঘরে বাবা আব দাদা ঘুমোচ্ছেন। ঘুমোবাব কথা। পৃথিবীর মানুষ—স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ, সবাই এখন নিদ্রামগ্ন। শুধু দোলন বলে একটি মেয়ে, ফার্ষ্ট ইয়ারেব দোলন দত্ত কিছুতেই ঘুমোতে পাবছে না। ঘুমোতে চাইছে না, পাছে নতুন করে জন্ম নেবার এই ক্ষণটিকে সে হাবিযে ফেলে।

আমাব প্রতিটি স্নায়ু এখন সজাগ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অনবরত বলে চলেছে, আমার নতুন কবে পাওয়া যৌবন, আমার আনন্দ, আমার কামনা বাসনা, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা, আমার সব কিছু, তুমি—তুমি অরিন্দম।

একথা আমি কি কোনদিন তোমার কাছে পৌঁছে দিতে পারবো অরিন্দম!

ভাবতে ভাবতে দীর্ঘ রাত্রি—অতি দীর্ঘ রাত্রি শেষ হয়ে গেল।

মার ভারী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আমার কানে আসছে। ধীর মন্থর শব্দ। এই শব্দ মুহুর্মুহুঃ ঘোষণা করছে, একজন পরিশ্রান্ত মানুষ

ঘুমোচ্ছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর করে নতুন দিনের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছে। মার মুখ দেখাব চেষ্টা করলাম। এখনও ভোরের আলো ফোটেনি। ফুটলেও এই ঘরে ঢোকেনি। এখানে আলোব প্রবেশ ঘটে অনেক বেলায়। চারিদিকে বড় বড় বাড়ি। সেই বাড়ি ডিঙিয়ে ঘরে আলো আসতে দেবী হয়।

যদিও মার মুখ দেখা গেল না, আমি জানি, এই সময় মাকে খুব শান্ত আর নিরুদ্বিগ্ন দেখায়। মনে হয় মার কোন চিন্তা ভাবনা নেই। সত্যিকারের একজন সুখী মানুষ মা। কিন্তু আসলে মা একটুও সুখী না। সুখী হবার কথা না মার। সুখ বলতে যা বোঝায় তার সামান্য স্বাদ মা পেয়েছে শুধুমাত্র বরিশালে থাকার সময়। তারপরে যা পেয়েছে, তা আশা-ভঙ্গ দুঃখ আর বেদনা।

মার আশা ছিল বি. এ. পাশ করে দাদা কমপিটেটিভ পরীক্ষা দেবে এবং ভাল একটা চাকরি পাবে। পরীক্ষা দিয়েছিল দাদা, কিন্তু ভাল ফল করতে পারেনি। দাদার এই অক্ষমতার জন্যে মা নিজেকেই দায়ী করে। বলে, মার ভাগ্যেই নাকি সব মন্দ হচ্ছে। মার ভাগ্য দোষেই বাবার আয় বাড়লো না, দাদাকে ব্যাঙ্কের কেরানী হতে হলো। এখন পর্যন্ত যদিও আমার সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে পৌছনো সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু আমি জানি, মার বিশ্বাস, আমার কোনকালে ভাল বিয়ে হবে না; এবং এই ভাল বিয়ে না হওয়ার কারণ, মার পোড়া কপাল। জানি না এক একজন মানুষ এত নৈরাশ্যবাদী হয় কেন। আমি কিন্তু খুব আশাবাদী। আমার বরাবর বিশ্বাস, দাদা একদিন না একদিন চাকরিতে উন্নতি করবেই করবে, বাবার আয় খুব বেড়ে যাবে। আমার বিয়ে? ভাল বিয়ে বলতে কী বোঝে মানুষ? শিক্ষিত পাত্র, দেখতে শুনতে ভাল, স্বচ্ছল অবস্থা, কলকাতায় নিজস্ব বসতবাড়ি, বড় কোন অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এই তো!

উপযুক্ত পাত্র বলতে যা বোঝায় অরিন্দম হয়তো তা না। হয়তো

কেন, নিশ্চয়ই না। যদিও অরিন্দম সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কিছুই জানি না, কিন্তু আমার মন বলে, উচ্চশিক্ষিত বলতে যা বোঝায় অরিন্দম তা না। ওর উপার্জন নেহাৎ জীবনধারণের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী কিছু না। মধ্যবিত্ত ঘরের একজন সাধারণ ছেলে ও। দেখতে শুনতে মোটামুটি। খুঁটিয়ে দেখলে বহু দোষ ধরা পড়ে চেহারায়। কিন্তু আমার চোখে ও অসাধারণ। ওর মধ্যে অনন্ত যৌবন মুখর হয়ে উঠেছে। সে আমাকে আহ্বান জানায়। সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে আমার উপায় থাকে না।

অপরিসীম পুলকে আমি ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হতে লাগলাম। আমি ক্রমশ নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। লজ্জা মান ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে অরিন্দমের ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত হচ্ছি আমি। এ এক বিস্ময়কর অনুভূতি। এই অনুভূতি আমার প্রাণে নতুন এক উন্মাদনা নিয়ে এল।

আমি অরিন্দমের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম। সামান্য ইঙ্গিতেই ওর দিকে ছুটে যাওয়ার বাসনা আমার মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠলো।

লজ্জা না, এ যে বিষম লজ্জা!

মা অস্ফুট শব্দ করে নড়েচড়ে উঠলো। একটা মোরগের ডাক কানে আসছে। ডাকটা হয়তো কর্কশ, কিন্তু এই মুহূর্তে অদ্ভুত মিষ্টি শোনালো। আসলে মুহূর্তটাই হচ্ছে সব। অরিন্দমের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটা নিশ্চয় অসাধারণ ছিল, না হলে ওর মত সাধারণ একটি ছেলে আমার মনে কী করে রংয়ের এমন বন্যা বইয়ে দিল। আর এই বন্যাটাই কিনা স্থায়ী হয়ে রইলো।

টিউবওয়েলের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল লোক দিনের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। সহসা বিরক্তিতে মন ভরে গেল। অহেতুক কতগুলো শব্দ—মোরগের ডাক, টিউবওয়েলের ক্যাঁচক্যাঁচানি, একটা লরী বিকট শব্দ করতে করতে চলে গেল, কতগুলো উদ্ভট শব্দের সমষ্টি সুন্দর একটা সকালকে নষ্ট করে দিল।

দারুণ বিরক্তিতে বালিশে মুখ চেপে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলতে হলো। দমবন্ধ হয়ে আসছিল। এতক্ষণ পর খেয়াল হলো, সমস্ত রাত আমার ঘুম হয়নি। ঘুমনো দরকার ছিল। না ঘুমলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। কিন্তু কলেজ আরম্ভ হয় সকাল সাতটায়, তার আগেই সেখানে পৌঁছনো দরকার।

তারপর কলেজ ছুটি হলে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরা। এই ফেরার মধ্যে লুকনো থাকে একটি গোপন বাসনা। খুব গোপন। নিজের কাছে প্রকাশ করতেও লজ্জা।

কয়েকদিন কেটে গেল। অরিন্দমের সঙ্গে দেখা হলো না। সেইদিন যেখানে ওর ডাক শুনতে পেয়েছিলাম সেখানে একটা প্রকাণ্ড গাছ আছে। এই গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় রোজই আমার গতি শ্লথ হয়ে আসে। কেন আসে জানি না। গভীর উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে মনে। কীসের উৎকণ্ঠা বুঝি না।

কিন্তু সে তো আর ডাকে না। কোনদিন কি আর ডাকবে না?

হঠাৎ একদিন ওর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল। সাক্ষাৎটা এত অতর্কিতে ঘটলো যে আমি সাধারণ ভদ্রতাটুকুও ভুলে গেলাম। ও যখন বললো, অফিসের কাজে দিন কয়েক বাইরে ছিলাম, উচিত ছিল কিছু একটা বলা। কিন্তু আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

অরিন্দমের সঙ্গে যে এমন অভদ্র আচরণ করতে পারবো স্বপ্নেও কি ভেবেছিলাম। অথচ কত সহজে সেই আচরণ করে ফেললাম।

অরিন্দম আমার এই জঘন্য আচরণ গায়েই মাখলো না, সহজ সরলভাবে বললো, 'সেদিন ছবিটা খুব ভাল লেগেছিল, না?'

মনে মনে বললাম, ছবি তো দেখিনি।

অরিন্দম আমার নীরব ভাষা শুনতে পেল। 'নিবিষ্ট হয়ে সামনের

দিকে তাকিয়ে থাকা মানেই ছবি দেখা না অবশ্য।' বলতে বলতে ও দারুণ জোরে হেসে উঠলো।

ছি, ছি তুমি এসব কি বলছো অরিন্দম! আমি শুধুমাত্র ছবিব দিকে তাকিয়েছিলাম, কিছুই দেখিনি? ছি, একথা বলতে নেই। বললে আমি লজ্জা পাব, সামান্য এই কথাটুকু তুমি বুঝতে পার না কেন অরিন্দম! তুমি এত অবুঝ হয়ো না। অরিন্দম আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ও মৃদু মৃদু হাসছে। ইচ্ছে হলো বলতে, আমি না হয় নিবিষ্ট চিত্তে সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম, তুমি কোনদিকে তাকিয়েছিলে? আমার দিকে? না তোমাব মণি-দির দিকে?

মনে মনে জিভ কাটলাম, ছিঃ, একথা কি ওকে বলা যায়!

কিছু একটা বলা দবকার। এভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা রীতিমত অস্বস্তিকর। অথচ কী বলবো! বলার মত কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছি না। বিষম অসহায় বোধ কবছি। অরিন্দম আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এল, 'যদি সময় থাকে, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।'

আমার বলা উচিত ছিল, এখন কি বেড়াবাব সময়? এখন বাড়ি ফেরার সময়। কিন্তু চেষ্টা করেও সেই কথা উচ্চারণ করতে পারলাম না। বরং খুব সহজভাবে বলে ফেললাম, 'আমার কোন কাজ নেই এখন।'

অরিন্দম একটা ট্যাক্সি ডাকলো। সেই ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম।

অনেক্ষণ ধরে ঘুরলাম। আরও একদিন এই ভাবে ঘুরেছিলাম। সেদিন আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। কোন কিছুই দেখতে পাইনি ভাল করে। অরিন্দমের একটি কথাও ঠিক মত উপলব্ধি করতে পারিনি। আজ আমি খুব সজাগ হয়ে রইলাম। অরিন্দম যে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালো, সিগারেট ধরাবার সময় দু হাত দিয়ে সযত্নে আগুনের ছোট শিখাটাকে বাতাসের হাত থেকে বাঁচারার

চেষ্টা করলো, ওর ডান হাতের আঙ্গুলে একটা আংটি, তাতে বড় মতন একটা লাল পাথর, ও যে চকিতে একবার আমার দিকে তাকালো—কিছুই আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

বাইরের রোদ এখন খুব চড়া। গলা পীচের ওপর দিয়ে গাড়ির ছাকা গড়ানোর সপ সপ শব্দ, অরিন্দম আরাম করে সিগারেট টানছে, গন্ধটা বেশ মিষ্টি, অনেকদিন চুল কাটেনি অরিন্দম, ওর চুল মাথা ছাপিয়ে ঘাড়ে এসে নেমেছে, সার্টের কলারটা একটু ছিঁড়ে গিয়েছে—কিছুই আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

অরিন্দম এখন আর সোজাভাবে ধোঁয়া ছাড়ছে না। ও বেশ কায়দা করে ধোঁয়ার রিং তৈরী করছে। সেই রিংগুলো বাতাসে ভাসছে কিছুক্ষণ, তারপর হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। অরিন্দম বার কয়েক রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিল। ওর রুমালটা বেশ নোংরা। কোন দৃশ্য—যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন, আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

একসময় গভীর মমতায় আমার অন্তর ছেয়ে গেল। আজ যদি আমার ব্যাগে টাকা থাকতো, আমি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিতাম। কোন একটা রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে অরিন্দমকে পেট ভরে খাওয়াতাম। অরিন্দম যা যা খেতে ভালবাসে সবকিছু। সার্ট না হোক অন্তত একটা পরিচ্ছন্ন রুমাল ওকে উপহার দিতে পারতাম।

কিন্তু আমার ব্যাগে কয়েকটা খুচরো পয়সা ছাড়া কিছুই নেই।

বিরক্তিতে মন ভরে গেল। অতর্কিতে বলে উঠলাম, 'আর থাক। বাড়ি ফিরবো এখন।' একটু থেমে আবার বললাম, 'এভাবে শুধু শুধু ঘুরে লাভ কি।'

অরিন্দম ভারী গলায় হেসে উঠলো।

ওভাবে হেসো না অরিন্দম। আমার বুক কাঁপে। বন-ময়ুরী আমার বুকে নেচে ওঠে। অরিন্দম আমাকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বললো, 'ঘোরাটা তো শুধু শুধু না দোলন।' ওর মুখে নিজের নাম

শুনতে কী অদ্ভুত যে লাগলো! অরিন্দম যে আমাকে দোলন বলে ডাকতে পারে ভাবতেই পারিনি। অরিন্দম আবার বললো, 'তোমার কিছু হলো কিনা জানি না, আমার কিন্তু খুব লাভ হলো।'

অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, 'কি লাভ?'

অরিন্দম মৃদু হাসলো। বললো, 'তোমার সঙ্গে পাশাপাশি বসে থাকাই যে আমার মস্ত লাভ দোলন।'

ছি অরিন্দম, মিথ্যে বলতে নেই।

'বিশ্বাস কর দোলন।' বলতে বলতে ও আমার হাত চেপে ধরলো।

বিশ্বাস করলাম গো, বিশ্বাস করলাম।

'তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি—' অরিন্দম থামলো।

থামলে কেন, বলো অরিন্দম, বলো।

'আমার কি মনে হয়েছিল জানো? মনে হয়েছিল—' দারুণ জোরে ঝাঁকুনী দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। একটা উজবুক মার্কা লোক গাড়ির সামনে পড়ে গিয়েছিল, আর একটু হলে চাপা পড়তো।

তোমার কি মনে হয়েছিল অরিন্দম? বললে না তো! আমি তোমার কথা শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি। বলো, বলো না!

অরিন্দম আমার কথা শুনতে পেল না। ওর চোখে মুখে প্রচণ্ড বিরক্তি। দাঁত চেপে চেপে ও বলতে লাগলো, 'এই লোকগুলো যে শুধু নিজের বিপত্তি ঘটায় তা না, অপরকেও বিপদে ফেলে।'

লোকের কথা থাক, তুমি দোলনের কথা বলো।

'অ্যাক্সিডেণ্ড হলে এখন থানা পুলিশ করতে হতো।' অরিন্দম বিরক্তিতে ফেটে পড়লো।

ট্যাক্‌সি-ড্রাইভারটি বাঙালী। অর্থাৎ বেশী কথার মানুষ। সে বলে চললো, 'যা বলেছেন স্যার। নিজেও মরবে, অপরকেও মারবে। সেবারে খড়দা থেকে ফেরার সময় সে কী ঝঞ্ঝাট স্যার। কোথাও

কিছু নেই, হুট করে একটা বাচ্ছা ছেলে এসে পড়লো গাড়ির সামনে। ব্রেক কষেছিলাম অবশ্য, কিন্তু অত ক্লোজ রেঞ্জ, একেবারে খতম—'

চিৎকার করে উঠলাম, 'গাড়ি ঘোরান, বাড়ি যাব।'

হতচকিত ড্রাইভার গাড়ি ঘোরালো। অরিন্দম আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ও যেন আমার মধ্যে কথা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মধ্যে কোন কথা নেই। আমি এখন বাড়ি ফিরতে চাই। অনেক বেলা হয়ে গেছে। মা আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আমি আর মা দুজনে একসঙ্গে বসে খাই। সকালে মার বিশেষ কিছু খাওয়া হয় না।

অরিন্দম একটু দূরে সরে বসলো। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওর দূরে থাকাই ভাল। কিন্তু অরিন্দম অত সহজে আমাকে মুক্তি দিল না।

ও আমার দিকে হেলে বসলো। গাড়ি একটা সোজা সরল রাস্তা ধরে চলছে। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট চারাগাছ। ওদের ছায়া এসে পড়েছে ঘন সবুজ ঘাসের ওপর। একটা লম্বা লেজঅলা পাখি ঘাসের মধ্যে কি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। এই মুহূর্তে আমার মনে হলো, পাখিটা যদি হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে, বেশ হয়। কিন্তু ও গাইলো না। কিংবা গাইবার আগেই আমরা উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেলাম।

ছোট একটা যন্ত্রণা আমার বুকে পাক খেয়ে গেল। ইচ্ছে করলেও এখন গাড়ি থামাতে পারি না আমি। কোনক্রমেই অরিন্দমকে বলতে পারি না, এত তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফেরার প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে।

অরিন্দম আমার গা ছুঁয়ে বসেছে। ওর বাহু আমার বাহু স্পর্শ করেছে। আমি সরে বসতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। নিজের অক্ষমতার জন্যে নিজেকেই গাল দিলাম।

অরিন্দম ডাকলো, 'দোলন।'

তাকাতে গিয়েও তাকাতে পারলাম না। নিজের অক্ষমতার জন্যে নিজেকেই আবার নিজে গাল দিলাম।

'সত্যিই আমি খুব দুঃখীত দোলন, তোমাকে দেরী করিয়ে দিলাম।'

দোলন, দোলন! বারবার এই নামে আমাকে ডাকো কেন অরিন্দম। তুমি কি বোঝ না, তোমার মুখে এ নাম শুনলে আমার শরীর অবশ হয়ে আসে, মন বিকল হয়ে যায়। নাকি, বোঝ বলেই ডাকো।

অরিন্দম আর ডাকলো না। ও চুপ করে বসে রইলো। গাড়ির জানালা দিয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ বাতাস আমার মুখে এসে ঝাপটা মারছে, চুল উড়িয়ে দিচ্ছে। আমি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছি না। নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। অথচ হাত বাড়িয়ে জানালাটা যে বন্ধ করে দেব, তারও উপায় নেই। আমার হাত দুটো অসম্ভব ভারি ঠেকছে।

তোমার যদি মন থাকে অরিন্দম, সেই মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা কর, দোলন বলে যে মেয়েটি তোমার পাশে বসে আছে, বাইরের উষ্ণ বাতাস তার নিঃশ্বাস রোধ করে দিচ্ছে; লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এদিককার কাঁচটা তুলে দাও। কিন্তু তুমি কী নিষ্ঠুর! কত নির্বিকার ভাবে বসে আছ তুমি, যেন তন্ময় হয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছো।

কিন্তু বাইরে দেখার মত কি আছে। দেখার যা কিছু সে তো ভেতরে!

অরিন্দমকে এ কথা বলা যায় না।

'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বাড়ি পৌঁছে যাব।' অরিন্দম সান্ত্বনা দেবার মত করে বললো।

অন্য কথা বলো অরিন্দম। কথা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, আমার নাম ধরে ডাকতে পারো, যতবার খুশী, আমি কিছু মনে করবো না। তুমি শুনে খুশী হবে, এই মুহূর্তে তোমার মুখে আমার নাম শুনতে ভাল লাগবে। খুব ভাল লাগবে আমার।

'বাড়ি গিয়ে কি বলবে ?' চকিতে অরিন্দমের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। অরিন্দম যদিও গম্ভীরমুখে বসেছিল, আমি ওর চোখে দুরন্ত হাসির সন্ধান পেলাম।

বললাম, 'বলবো একজন দুষ্টুলোক পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।'

কোনদিন কি ভাবতে পেরেছিলাম অরিন্দমের সঙ্গে এ ধরনের পরিহাস করতে পারবো। কিন্তু কত সহজেই সে কাজ করে ফেললাম।

অরিন্দম একটুও অপ্রতিভ হলো না। ও খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, 'লোকটা বেজায় দুষ্টু, কিন্তু পথটা ভুল না।'

মনে হয়েছিল অরিন্দম আবার দোলন নামটা উচ্চারণ করবে, কিন্তু ও তা করলো না। আমার নামটা কি ভুলে গেলে অরিন্দম ?

সেই মুহূর্তে ও ডেকে উঠলো, 'দোলন।'

দৃষ্টি তুলে ধরতেই অরিন্দমের দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টির মিলন হলো। শুধু দৃষ্টি না। ওর একটা হাত আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো। শুধু যে ধরে রইলো তা না। ও নিজের দিকে আমাকে আকর্ষণ করলো। বাধা দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও বাধা দিতে পারলাম না। সময়কালে শরীর এবং মন কেন যে শত্রুর মত ব্যবহার করে।

আমাকে ওর দিকে আকৃষ্ট করেই ও ক্ষান্ত রইলো না। আমার মুখের ওপর ও ক্রমশ ঝুঁকে পড়তে লাগলো। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে আমার মুখে লাগছে। শুধু উষ্ণ নিঃশ্বাস না। ওর তপ্ত ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করে ফেললো।

বিকট চিৎকার করে আমি দূরে সরে যেতে চাইলাম। কিন্তু কী বিস্ময়কর ব্যাপার, দূরে সরে যাওয়ার পরিবর্তে ওর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। দুই হাত দিয়ে ওর গলা শক্ত করে ধরে ফেললাম। ভয় হচ্ছিল পাছে না পড়ে যাই।

কোন কথাই আপনার কাছে লুকবো না। সব কথা বলবো। সবার কথা বলবো। যে কথা বলতে না পেরে আমার এই আটত্রিশ বছরের বুকটা পাথর হয়ে গিয়েছে, সেই কথা আপনাকে বলবো।

বলবো বলেই তো এলাম।

এখন বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। বন্ধ জানালার কাঁচে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো এসে আছড়ে পড়ছে, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। রাত নিশ্চয়ই খুব গভীর। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত রাস্তায় গাড়ি চলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, এখন কোন শব্দই কানে আসছে না। শুধু তীব্র বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি পড়ার ঝম ঝম শব্দ।

এই শব্দ মানুষকে বর্তমান থেকে অতীতের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। নিজের কাহিনী তখন অপরকে শোনাতে ইচ্ছে করে।

শুনেছি, আপনি একজন স-হৃদয় ব্যক্তি; আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনবেন, সেই আশাতেই এলাম।

সব কথা আপনাকে বলবো বলেই এলাম।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বুকটা ধড়াস করে উঠলো। কণিকাদির সামনা-সামনি না পড়ে যাই আবার। কিন্তু না, কণিকাদি নেই। মাকেও দেখতে পেলাম না। ঠিকা-ঝি এসে দরজা খুলে দিল। আমাদের খাওয়া দাওয়ার পর ও আসে রোজ। বুঝলাম, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। আমার কব্জিতে কোন ঘড়ি নেই। একটা ঘড়ি ছিল, কয়েকদিন হলো খারাপ হয়ে পড়ে আছে। দাদাকে বলে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছি। ঘড়িটাকে মেরামৎ করা দরকার। খুব দরকার। কিন্তু হাতে ঘড়ি থাকলেও যে বিশেষ কোন লাভ হতো তা না। হয়তো ঘড়ির দিকে তাকাবারই সময় পেতাম না। ইচ্ছা করলে অরিন্দমের কাছ থেকে সময় জেনে নিতে পারতাম। কিন্তু যতক্ষণ গাড়িতে ছিলাম একবারও সে ইচ্ছে আমার হয়নি। অরিন্দম কাছে থাকলে কোন কথাই আমার মনে থাকে না, নিজেকেও ভুলে যাই তখন। কেন যে এমন হয়।

মার দেখা পেলাম রান্না ঘরে। মা তখনও রাঁধছিল। সাধারণত এর অনেক আগে মার রান্না হয়ে যায়। আমাকে দেখে মা একটুও

রাগ করলো না, বরং প্রসন্নভাবে বললো, 'এত দেরী যে?' মা প্রশ্ন করে কোন উত্তরের অপেক্ষা করলো না। একটা কিছু বলতে হয় বলেই বললো। আমিও অযথা মিথ্যে বলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম। মা আবার বললো, 'তোর কণিকাদি এসেছিল সকালে। তোর একটা সম্বন্ধের কথা বলছিল। ছেলেটি ভাল। ভাবলাম, শুভ কাজের শুরুতে একটু ভালমন্দ খাওয়া হোক। তাকেও নেমন্তন্ন করলাম।'

হঠাৎ একটু বেশী জোরেই চিৎকার করে উঠলাম, 'ওরা বড়লোক। আমাদের বাড়িতে খেতে বলে শুধু শুধু বিব্রত করো কেন?'

মা একটুও দমলো না। বিরক্ত ভাবে বললো, 'গরীব বড়লোকের প্রশ্ন এখানে ওঠে কেন। কণিকা তোকে ভালবাসে, তোর ভাল চায়, তাকে যদি আপনজন হিসেবে দেখি, দোষ কোথায়।'

মাকে কিছুতেই বোঝান যাবে না, মানুষ অত সহজে আপন হয় না। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যদি কাউকে ভয় করি, সে কণিকাদিকে। কাউকে যদি এড়িয়ে চলতে চাই, সে অরিন্দমের মণি-দিকে। আর মা কিনা যেচে তাকেই ঘরে ডেকে নিয়ে এল। একটা সুন্দর দিন নিমেষে তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেললো, হয়ে উঠলো কুৎসিত কদাকার।

দুমদাম পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। মা পিছন থেকে বলতে লাগলো, 'তাড়াতাড়ি চান করে নে, এক্ষুণি কণিকা এসে পড়বে।' মার কথার উত্তর দিতেও প্রবৃত্তি হলো না। দারুণ বিতৃষ্ণায় অন্তর বিষাক্ত হয়ে গেল। কী অসম্ভব লোভী হয়ে উঠেছে মা! কণিকাদি না হয়ে যদি পাশের বাড়ির রানুপীসি এই সম্বন্ধ নিয়ে আসতো মা কি এমন ঘটা করে তার জন্যে রাঁধতে বসতো? আসলে মা ঐশ্বর্য দেখতে ভালবাসে। দারিদ্রের মধ্যে সারা জীবন কেটেছে বলেই মা দারিদ্রকে ঘৃণা করে। ধনসম্পদের গন্ধ পেলেই লোভ-হয়।

মার তুলনায় নিজেকে অনেক বেশী নির্লোভ বলে মনে হতে

লাগলো। অরিন্দম কোনমতে ধনীর পর্যায়ে পড়ে না, বরঞ্চ সাধারণ মধ্যবিত্ত একজন মানুষ ও। আর আমি সেই অরিন্দমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, ভাবতেও ভাল লাগলো এবং এক ধরনের অহঙ্কার-বোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

যতক্ষণ স্নান করছিলাম শুধু অরিন্দমের কথাই মনে হচ্ছিল। অবিন্দম যে আমার হাত ধরে বসেছিল, তারপর ওর মুখ আমাব মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো, ওর ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করলো, ইচ্ছে করলে আমাকে নিয়ে অনেক-কিছু করতে পারতো অরিন্দম, কিন্তু ও সেই পথে গেল না, গেল না বলেই অন্যান্য মানুষেব মধ্যে অবিন্দম এক বিশিষ্ট মানুষ। অরিন্দমকে নিয়ে যত মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিলাম, ও যেন তত আমাকে পেয়ে বসছিল। কিছুক্ষণেব মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন শুরু হয়ে গেল আমাদের মধ্যে। আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি কাকে বেশী ভালবাস অরিন্দম, আমাকে না তোমার মণিদিকে? অরিন্দম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারলো না। স্থিব দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। এই দৃষ্টি দিয়ে ও আমাব অন্তস্থল দেখাব চেষ্টা করছিল। বললাম, উত্তর দাও অরিন্দম। অরিন্দম উত্তর দিল' না, গভীরভাবে আমাকে চুম্বন করলো।

আমাদের এই বাড়িটার মধ্যে বিলাসিতার একমাত্র উপকরণ, বাথরুমে জলের শাওয়ার। ঝাঁঝরি দিয়ে জলের তীক্ষ্ম ধারাগুলো আমার মুখের ওপর এসে পড়ছে। আমি ইচ্ছে করেই মুখ উঁচু করে রেখেছিলাম। আমার ভাল লাগছিল। অরিন্দমকে একান্তভাবে অনুভব করতে চেষ্টা করছিলাম।

আরও কতক্ষণ এভাবে কাটতো জানি না। মা তাড়া লাগালো। তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা পরে বেরিয়ে এলাম। মা বললো, 'একটু স্নো-পাউডার মেখে নে।'

'আমাকে কি কেউ দেখতে আসছে এখন?'

মা উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে গেল। মার হয়ে উত্তর দিল কণিকাদি, 'যে এসেছে তার সামনে মা সেজে এলেও কোন ক্ষতি নেই।' কণিকাদি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে।

মা অপ্রস্তুত হয়ে বলতে লাগলো, 'কী অদ্ভুত প্রকৃতি ওর। মেয়েরা সাজতে-গুজতে ভালবাসে, এটা ওটা মাখে, লোকে যাতে সুন্দর বলে তার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর সবকিছুই সৃষ্টিছাড়া।'

কণিকাদি আমার চিবুক স্পর্শ করে সেই আঙুল ঠোঁটে ছোঁয়ালো। বললো, 'ভগবান যাকে রূপ দিয়েছেন তাকে আর কষ্ট করে মেকী জিনিষের সাহায্য নিতে হয় না। এমনিতেই ওকে সুন্দর দেখায়।' কণিকাদি হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আঙুলে একটা আংটি পরিয়ে দিল।

অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করলাম, 'এ কী?'

কণিকাদি প্রফুল্ল মুখে বললো, 'আজ তোর জন্মদিন।'

আমাদের বাড়িতে কারও জন্মদিন পালন করা হয় না। সত্যি সত্যিই আজ আমার জন্মদিন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নিশ্চয় মার কীর্তি। মা-ই নিশ্চয় কণিকাদিকে বলেছে আজ আমার জন্মদিন। মা যে দিন দিন অত্যন্ত লোভী হয়ে উঠছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মা যদিও সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু এনিয়ে মাকে এখন কিছু বলা চলে না। বাধ্য হয়েই আমাকে চুপ করে থাকতে হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কণিকাদি আর আমি পাশাপাশি বসে আছি। কণিকাদি অনর্গল কথা বলে চলেছে। আমি চুপ করে শুনছি, বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছি না। এক সময় কণিকাদি বললো, 'তোর জন্যে ভাল একটা সম্বন্ধ এনেছি। ছেলেটি খুব ভাল। পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট, দারুণ স্মার্ট—'

কণিকাদি আরও কীসব বলতে যাচ্ছিল, মাঝ পথে বলে উঠলাম, 'চল খেয়ে আসি।'

কণিকাদি যেন শুনতেই পেল না। বলতে লাগলো, 'ওদের ছুটো গাড়ি।' কথার মাঝখানেই বলে উঠলাম, 'এমন ছেলে আমাকে বিয়ে করবে কেন?' বলে বাঁকা চোখে কণিকাদিকে একবার দেখে নিলাম।

'করবে না-ই বা কেন। মেয়ে আমাদের ফেল্না না।' কণিকাদি আমার চিবুক স্পর্শ করে আদর করলো।

কণিকাদির কথায় আমার খুশী হওবা উচিত ছিল কিন্তু আমার বিরক্তি ধরে গেল। বলে ফেললাম, 'আমি এখন বিয়ে করবো না। গ্র্যাজুয়েট না হয়ে বিয়ে করার মানে হয় না।'

'যে মেয়েরা সুন্দরী না, তাদের বেলায় এই কথা খাটে।'

'সুন্দর কুৎসিতের সঙ্গে লেখা পড়ার কি সম্পর্ক?'

কণিকাদি চোখের তারা নাচিয়ে হাসলো, 'সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ। মেয়েরা লেখাপড়া শেখে বিয়ের আশায়।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস না করলেও কথাটা কিন্তু সত্যি দোলন। চল খেয়ে আসি।' কণিকাদি উঠে পড়লো। ও যে ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গ পালটে দিল বুঝতে পারলাম। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, কণিকাদি হঠাৎ আমার বিয়ে নিয়ে এমন ক্ষেপে উঠলো কেন। কিছুদিন আগে হলে হয়তো এ বিয়েতে আপত্তি করতাম না। কিন্তু এখন মনে হলো, শুধু এ বিয়ে বলেই না, এখন কোন বিয়ের ব্যাপারেই আমি প্রস্তুত না।

আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে খাচ্ছিলাম। মা পরিবেশন করছিল। কণিকাদি খুব তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছিল। সময় সময় একথাও মনে হচ্ছিল, এমন ভাল রান্না কণিকাদি বুঝি জীবনে খায়নি। ও যে মাকে খুশী করার চেষ্টা করছিল বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু কেন যে এই খুশী করার প্রয়াস সেটা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা এসে শোবার ঘরে বসলাম। আজ মাকে একা একা খেতে হবে। কিন্তু উপায় নেই। কণিকাদিকে

বসিয়ে রেখে তো আর মাকে সঙ্গ দেয়া যায় না, যদিও এই মুহূর্তে সেই কাজটা আমার পক্ষে অনেক বেশী সুখকর হতো।

কণিকাদি আসার পর থেকেই আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বারংবারই মনে হচ্ছিল, একটা গূঢ় অন্যায় কণিকাদির কাছে ধরা পড়ে যাবে। অন্যায়বোধ মানুষের সবচেয়ে মর্মান্তিক যন্ত্রণা। কিন্তু যন্ত্রণা ভোগ করার মত অন্যায় তো আমি কিছু করিনি, এ কথা মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে।

সহসা কণিকাদির কথায় সংবিৎ ফিরে এল। 'দোলন তোকে একটা কথা বলবো।' কণিকাদি চুপ করলো। ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু ও একটা কথাও বললো না। না কি, বলতে পারলো না। আমার মনে হতে লাগলো, কণিকাদি কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু কিছুতেই বলতে পরছে না। অধীর উৎকণ্ঠায় ওর দিকে তাকিয়ে আছি। কণিকাদি হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো। বাচ্চা মেয়েদের মত হাসি। কে বলবে কণিকাদির এত বয়স হয়েছে, বড় বড় ছেলে মেয়ে ওর। হাসতে হাসতে কণিকাদি এক সময় বললো, 'এমন মুখ করে বসে আছিস যেন এক্ষুণি ফাঁসীর নোটিশ দেয়া হলো তোকে।' বলতে বলতে কণিকাদি আবার নতুন করে হাসতে লাগলো।

মনের মেঘ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। সেই ভয়-ভয় ভাবটা আর নেই। আমিও কণিকাদির সঙ্গে খোলা মনে হাসতে লাগলাম।

'অরিন্দম তোর কথা খুব বলে আজকাল।' অতর্কিতে কণিকাদি যে এমন উদ্ভট একটা কথা বলে বসবে মুহূর্ত আগেও কল্পনা করতে পারিনি। অপরের মুখ থেকে অরিন্দমের নাম শোনাটাই এক উদ্ভট ব্যাপার। বিশেষ করে কণিকাদির মুখ থেকে। বিহ্বল দৃষ্টিতে কণিকাদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কণিকাদিও আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি দিয়ে ও আমার মধ্য থেকে কিছু যেন খুঁজে বার করতে চাইছে। পলকের মধ্যে মনের বিহ্বলতা

কাটিয়ে ফেললাম। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করলাম, 'হঠাৎ আমার কথা? বলার মত কথা তো কিছু নেই আমার।'

কণিকাদি বিচিত্র ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, 'কে বলেছে নেই। সুন্দরী মেয়েদেব সম্বন্ধে বলার কথা অনেক থাকে। তুই তো শুনতে চাইলি না, কী বলে অবিন্দম? ঔদাসীন্য কিন্তু সময় সময় সন্দেহের কাবণ হয়ে দাঁড়ায় দোলন।'

'তাই নাকি?' ভ্রূ কাঁপিয়ে প্রশ্ন কবলাম। এমন ভাব দেখালাম যেন খুব হালকা ধরনের কথাবার্তা চলছে আমাদের মধ্যে। অথচ মনেব ভেতর যে কী হচ্ছে আমি-ই জানি। বাবংবার খোলা দরজার দিকে দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল। এই সময অনেকদিন দাদা ফিরে আসে। আজ যদি ও এসে পড়তো। কিন্তু কিছুতেই দাদা এল না। যাকে খুব গভীর আগ্রহে কামনা কবা যায সে কিছুতেই আসে না।

কণিকাদি আমাব দিকে ঝুঁকে বসলো। ওর চোখেব দৃষ্টি ক্রমশ খুব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বাঘিনী যেমন হিংস্র দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকে কণিকাদিও সেইভাবে তাকিয়েছিল। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছিল। আমি বার কয়েক কণিকাদির চোখের দিকে তাকালাম, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিল'ম। কণিকাদি হঠাৎ অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। আমার চিবুক ধরে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বললো, 'তুই কি কোন অন্যায় করেছিস?'

'কি অন্যায়? অন্যায় করতে যাব কেন?' বলতে বলতে আমার মন শক্ত হয়ে গেল। যে ভয়টা মনের মধ্যে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল, সহসা সেই ভয়টা চলে গেল। নির্ভিকভাবে কণিকাদির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কণিকাদি থতমত খেয়ে গেল। আমি যে এমন তেজস্বিনী মূর্তি ধরে তাকিয়ে থাকবো বেচারী হয়তো ভাবতে পারেনি। একটুক্ষণ ইতস্তত করে ও বললো, 'তুই নাকি একদিন অরিন্দমের সঙ্গে ট্যাক্সি করে ঘুরেছিস?'

কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, নির্লজ্জের মত বলে ফেললাম, 'একদিন না, ছু দিন।'

কণিকাদি নিশি-পাওয়ার মত বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে উঠলো 'ছ্ দিন ?'

'হ্যাঁ ছু দিন। একদিন ভিক্টোরিয়ার দিকে আর আজ।'

ট্যাক্সি করে ঘুরেছিস তোরা ?' কণিকাদি যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

'হ্যাঁ। শুধু শুধু গুচ্ছের টাকা খরচা হয়ে গেল অরিন্দমের।'

কণিকাদি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ও যেন সমগ্র বিষয়টাকে ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমার চোখে কণিকাদি ছিল সাধারণের চেয়ে অনেক উঁচুতে। সাধারণ যারা তারা নিয়মিত হেঁসেল ঠেলে, ছেলেপুলে মানুষ করে, সংসার নামক ঘানিটি সর্বক্ষণ কাঁধে বয়ে বেড়ায়। কণিকাদি ছিল ব্যতিক্রম। কণিকাদি যেটুকু রান্নাবান্না করে সবটাই করে নিজের সখ মেটাতে। ওদের বাড়ির ছেলে মেয়েরা মানুষ হয়ে ওঠে খুব সহজভাবে। কাউকে সেজন্যে মাথা ঘামাতে হয় না। আর সংসার বলতে যা বোঝায় সেটা এক সদা-আনন্দময় পরিবেশ। এখানে বাজার করা নিয়ে হৈ চৈ নেই, মাসের শেষ দিকে মাছ বন্ধ করে দিতে হয় না, হঠাৎ যদি ছু একটা বিয়ে কিংবা অন্নপ্রাশন এসে পড়ে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হলো, কণিকাদি সাধারণ মহিলাদেরই একজন। বরং একদিক দিয়ে ও আরও বেশী ছুর্দশাগ্রস্থ। নিজের বলে ওর কিছুই নেই। যে সংসারে ওর বাস সেই সংসারটা পর্যন্ত ওর নিজস্ব না।

জানি না, সহসা কণিকাদি সম্বন্ধে আমার ভাবান্তর ঘটে গেল কেন। একটা কথা বারংবার মনে হতে লাগলো, কণিকাদির জীবনে সুখ নেই। যদি সুখ থাকতো অরিন্দমের কথা শুনতে শুনতে কণিকাদির অন্তর বিষাদে ভরে উঠতো না।

কণিকাদির মনে শক্তি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম, 'যতক্ষণ বেড়াচ্ছিলাম, অরিন্দম তোমার কথা বলছিল।'

কণিকাদি আমার দিকে ফিরেও দেখলো না, উদাসভাবে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলো। সেই দিকে দেখার কিছুই ছিল না। পাশের বাড়ির একটা স্যাঁত-স্যাঁতে দেয়াল ছাড়া। কণিকাদি সেই দিকে তাকিয়ে বসে রইলো।

কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো কণিকাদি। ওর একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠলাম, 'রাগ করলে কণিকাদি ?'

কণিকাদি কথা বললো না, মৃদু হেসে হাত ছাড়িয়ে নিল। যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কণিকাদি। আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। বললো, 'অরিন্দম যখন তিন বছরের শিশু তখন ওর মা মারা যায়। ওর সাত বছর বয়সে বাবাকে হারায়। তারপর এ বাড়ি ও-বাড়ি করে ও মানুষ হয়ে উঠেছে।'

এসব ক্ষেত্রে হয়তো আহা বা ঐ জাতীয় কোন একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলে ভাল শোনাতো, কিন্তু আমি শত চেষ্টা করেও সেই জাতীয় কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারলাম না।

ধীরে ধীরে কণিকাদি ঘব ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরে ঢুকলো মা। ঢুকেই বিরক্তভাবে বললো, 'কণিকা চলে গেল ?'

আমি ঘাড় দোলাতে মা ফেটে পড়লো, 'আর একটু বসতে বললি না। কত কথা ছিল ওর সঙ্গে। ভাল সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু কপালে লাগলো না। যা পোড়া কপাল আমার।' আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে মা হাত দিয়ে কপালে আঘাত করলো।

আমি শান্তভাবে বলার চেষ্টা করলাম, 'যে যার কপাল নিয়ে জন্মায়।'

মা বিকারগ্রস্থ রুগীর মত এক নাগাড়ে বলে যেতে লাগলো, 'ছেলে বয়সেই বাপ মাকে হারিয়েছি। মামা বাড়িতে মানুষ হয়েছি। বিয়ে হবার আশাই ছিল না। নেহাৎ তোদের বাবা একরকম দয়া করেই;

দয়া ছাড়া কী বলবো, দেখতে শুনতে এমন কিছু না, লেখা-পড়া শিখি নি, শেখার সুযোগ হয় নি, দুবেলা দু মুঠো অন্ন যোগাতেই মামার প্রাণান্ত, বড় সংসার, অনেক ছেলেপুলে, মামাকে দোষ দেওয়া যায় না। এমন মেয়ের বিয়ে হবার কথা না। কিন্তু আমার ভাল বিয়েই হয়েছিল। কিন্তু কপাল মন্দ। দেশ ভাগ হয়ে গেল। সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গেল—'

মার কথার মাঝখানেই হেসে ফেললাম, 'শুধু তোমার কপাল দোষেই দেশ ভাগ হয় নি মা।'

মা আমার কথা শুনতেই পেল না যেন। বলে যেতে লাগলো, 'তারপর এলাম কলকাতায়। আসতে হলো। অভাব অনটনের সংসার, পড়া শেষ হতে না হতেই দীপুকে চাকরিতে যুততে হলো। কত আশা ছিল দীপু বিলেত যাবে, কেউকেটা হয়ে ফিরবে।'

মাকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বললাম, 'বিলেত না গেলেও মানুষ কেউকেটা হতে পারে মা।'

মা কী রকম বিভ্রান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন কথাটার সারমর্ম বোঝার চেষ্টা করছে।

আমি আবার বললাম, 'কণিকাদির স্বামী—অমরেশবাবু তো বিলেত যান নি, অথচ কত টাকা রোজগার করেন। কী সুন্দর বাড়ি কণিকাদিদের। কত দামী দামী জিনিসপত্র—' ইচ্ছে করেই কণিকাদিদের টাকা পয়সার ওপর জোর দিলাম। আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো না।

ধীরে ধীরে মার বিভ্রান্ত ভাবটা কেটে যেতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে মা নিজেকে সংযত করে ফেললো। আমার কাছে সরে এসে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, 'কণিকা বলেছে, ওর বাপের বাড়ির অবস্থা নাকি ভাল ছিল না। বিয়ের সময় স্বামীও খুব একটা কিছু করতো না। যা কিছু সবই কণিকার কপাল গুণে।'

'কণিকাদি বলেছে এ কথা?'

'মুখ ফুটে বলেনি, তবে কথা শুনে সে রকমই মনে হলো।'

মনে মনে ভেংচি কাটলাম, স্বার্থপর মেয়েমানুষ, সব সময় নিজেকে নিয়েই মরছে।

'তুই যে কেন কণিকাকে দেখতে পারিস না। অথচ ও তোকে কত ভালবাসে।'

'বলেছে বুঝি সে কথা ?'

মার মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'সব কথা কি মুখে বলতে হয়। মুখ দেখে বোঝা যায় না।'

কি জানি কেন মার কথায় সায় দিয়ে ফেললাম, 'তা অবিশ্যি যায়।'

আমর কথায় মার উৎসাহ বেড়ে গেল। আমার একটা হাত চেপে ধরে বললো, 'কথা দে, তুই কণিকার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবি। ওকে কোনদিন কটু কথা বলবি না।'

'আমি আবার কটু কথা বললাম কখন ?'

মা ছেলেমানুষের মত চোখ নাচিয়ে বললো, 'মুখে না বললেও তুমি হাবেভাবে কটু কথা বলতে পার বাপু। তোদের বাবাও ঠিক তোর মত ছিল। ইচ্ছে করলে কথা না বলেও মানুষকে খুব অপমান করতে পারতো। একবার মামাকে এমন অপমান করেছিল যে তিনি জামাইয়ের মুখোমুখি হননি আর।'

মার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মন ভারী হয়ে উঠলো। কী অসম্ভব ছেলেমানুষ মা! এই যে কথায় কথায় দুঃখ পাচ্ছে, খুশী হচ্ছে এতো অপরিণত মনেরই পরিচয়।

মার মনে সুখ এনে দেবার উদ্দেশ্যে বললাম, 'না না, হাবেভাবে কটু কথা বলতে যাব কেন শুধু শুধু। কণিকাদি তো একজন সত্যিকারের ভাল মানুষ।'

মা আবদারের ভঙ্গিতে বললো, 'তুই কিন্তু কণিকাদের বাড়িতে যাস। ও বলছিল, তুই নাকি ইচ্ছে করে ওদের এড়িয়ে চলিস।'

মুহূর্তে মনের নরম ভাবটা কেটে গেল। রুক্ষস্বরে বলে ফেললাম,

'ও কী আশা করে! যেহেতু ওরা পয়সাঅলা লোক আমি সারাক্ষণ ওদের বাড়িতে পড়ে থাকবো। পয়সা দিয়ে আর যাই হোক, মানুষ কেনা যায় না।'

'হঠাৎ কি হলো তোর? এসব কথা বলছিস কেন?'

উত্তেজনায় আমার গলার স্বর কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। সেভাবেই বলতে লাগলাম, 'বড়লোকদের চিনতে আর বাকী নেই। যেহেতু একজন লোক ওদেব অফিসে চাকরি করবে সেইহেতু সারা জীবনের মত ক্রীতদাস হয়ে থাববে সে? মালিকেব বউকে নিযে ঘুবতে হবে, ফাইফবমাস খাটতে হবে? কি পেয়েছে ওরা?'

মাব স্বচ্ছ দৃষ্টিব ওপব সংশয়ের ছায়া পড়লো। 'কার কথা বলছিস?'

কী সর্বনাশ! আর একটু হলে অরিন্দমের কথা বলে ফেলতাম।

অপরিণত বুদ্ধি হলেও সহজ সরল মানুষ বলতে যা বোঝায় মা সে জাতীয় মানুষ না। অরিন্দমের কথা শুনতে পেলে মা নির্ঘাৎ তার সম্বন্ধে সব কথা জানতে চাইতো। আমি বলতে না চাইলে কণিকাদিকে জিজ্ঞেস করতো। কী বিশ্রী ব্যাপার হতো তাহলে।

কথা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কোন বিশেষ মানুষের কথা বলছি না। বলছি, ওরা সবাইকেই এভাবে দেখে। যারা যারা ওদের নীচে কাজ করে, ওদের সংস্পর্শে আসে, সবাইকে।'

মা কণিকাদির পক্ষ নিয়ে বললো, 'সব বড়লোকই খারাপ হয় না। আমার মামা-বাড়ির পাশে একজন থাকতো, বিরাট ধনী ছিল, কিন্তু—'

'থাক ওসব কথা।' মাকে থামিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েও মার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। মা আমার পিছন পিছন আসতে আসতে বললো, 'এ বিয়েতে তোর মত আছে কিনা বল?'

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, 'কোন বিয়েতে?'

'কণিকার দেওর। ছেলেটি ভাল। এবার এম. এস. সি. দিয়েছে।'

'এম এস. সি. দিলেই ছেলেরা চাকরি পায় না।' লঘুভাবে বলার চেষ্টা করলাম।

'সবাই না পাক, ও পাবে।'

'কণিকাদির দেওর বলে?'

'আজকাল মুরুব্বির জোর থাকলেই চাকরি হয়।'

'আমি এখন বিয়ে করবো না। এই বয়সে বিয়ের কোন মানে হয়!'

'আমার বিয়ে হয়েছিল—'

মার কথার মাঝখানে অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলাম, 'দিন পালটেছে।'

'দিন যদি পালটে থাকে সে ছেলেদের বেলায়, মেয়েরা যা ছিল তাই আছে।'

মার কথায় হেসে ফেললাম, 'তোমার কথায় কোন যুক্তি নেই মা। মেয়েকে বিদায় করতে তোমার যত আগ্রহই থাক না কেন, মেয়ে কিন্তু এখন এক পাও নড়ছে না।'

মা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আবদারের ভঙ্গিতে বললো, 'তুই বিয়ে করতে আপত্তি করিস না দোলন। মেয়েদের বেশী নাক উঁচু থাকা ভাল না।'

'সেই মেয়ের বিয়ে হয় না, এই তো! যেমন বিয়ে হয়নি, তোমার মেজদার বড় শালীর মেয়েটির, তাই না?'

মা আমার কথায় রেগে উঠলো, 'হ্যাঁ তাই। সরোজিনীর বিয়ে হয়নি কেন তাহলে? ও খুব কুৎসিত কদাকার ছিল না। গায়ের রংটা একটু ময়লা ছিল, কিন্তু কালো মেয়ের কি বিয়ে হয় না। তা না। আসলে সরোজিনীর খুব অহঙ্কার ছিল। একটু লেখাপড়া শিখেছিল কিনা।'

'তোমার সরোজিনীর কেন বিয়ে হয়নি তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি এখন বিয়ে করবো না। বি. এ. পাশ করার আগে কিছুতেই না।'

'বি. এ. পাশ করে কী হবে তোর? পাখনা গজাবে? মেয়েরা লেখাপড়া শেখে কেন?' মা প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, 'কেন শেখে? ভাল বিয়ে হবে বলে?'

মা বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর কাঁদ কাঁদ গলায় বললো, 'টাইফয়েড খুব বাজে রোগ। এ রোগ শরীরের কোন অংশে কিছু না কিছু ক্ষতি করে যাবেই।'

মাকে সাহস দেবার মত করে বললাম, 'আমার মাথার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।'

মার মুখের ভাব এখন বেজায় করুণ দেখাচ্ছে। মিনতি-মাখানো কণ্ঠে মা বললো, 'তোর বুদ্ধির ওপর আমি খুব ভরসা রাখি দোলন। সংসারে একমাত্র তোর ওপরই ভরসা রাখি। তোদের বাবা তো দিবারাত্র বই মুখে নিয়ে বসে আছে। কী যে এত পড়ে বুঝি না। পসার তো হয় না।' মা বড় রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে লাগলো, 'দীপুর কথা কী আর বলবো। বয়স হয়েছে কিন্তু মন পাকেনি। ওরই বা দোষ কি। মনে তো শান্তি নেই। থাকার কথাও না। বয়স হয়েছে, চাকরি-বাকরির তেমন সুবিধা হচ্ছে না। ভাল একটা চাকরি যদি ওর হতো—'

মার কথার মাঝখানেই বলে উঠলাম, 'দাদা তো ভাল চাকরিই করে। ব্যাঙ্কের চাকরি, মাইনে পত্তর ভালই—'

'ছাই ভাল। কেরানী বইতো নয়। অথচ দীপু পড়াশুনোয় ভাল ছিল—'

'দাদার চেয়ে ভাল ছাত্ররাও আজকাল চাকরি পায় না। বাড়ির রকে বসে আড্ডা মারে।'

'আর সেই রকম ছেলেকে বেছে নিলি তুই।'

মার কথায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। 'কী বলছো তুমি। বকবাজ ছেলের সঙ্গে আড্ডা মারি আমি।'

মা একটুও না দমে বলে যেতে লাগলো, 'মারিসই তো। যে ছেলেটার সঙ্গে মিশিশ, ট্যাক্সি করে ঘুরিস, সে কি খুব ভাল ছেলে? গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত না ও, জানিস?'

আমার হাত পা থর থর করে কাঁপছিল। উত্তেজিতভাবে মাকে প্রশ্ন করলাম, 'কার কথা বলছো?'

'অরিন্দমের। ও কি ভাল ছেলে? মোটেই না। কাণকার স্বামী নেহাৎ একটা চাকরি দিয়েছে। নেহাৎ দয়া করে দিয়েছে বলেই তবু যা হোক ত্থ-মুঠো খেতে পাচ্ছে। বড় সংসার। বিধবা মা। ভাই বোনেরা ছোট। কত বড় বোঝা মাথার ওপর। আর সেই ছেলেকেই কিনা বেছে নিলি তুই।'

'কণিকাদি এত কথা বলেছে তোমাকে?'

'বলাটাই দোষ হলো?'

'হ্যা, একশো বার দোষ হয়েছে। এই কণিকাদিই আমাকে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।' এক রকম জোর করেই। জান তুমি সে কথা?'

'কণিকা বলেছে, ও নাকি বুঝতে পারেনি যে তলে তলে তোরা এতদূর এগিয়ে যাবি। পেছন থেকে ওকেই ছুরি মারবি।'

'কণিকাদিকে ছুরি মারার প্রশ্ন ওঠে কেন?'

'কণিকার মান সম্মান আছে। কত বড় ঘরের বৌ ও। ওর মানে লাগবে না?'

'টাকা পয়সা থাকলেই মানুষ বড় হয় না। বাড়ি বড় হলেই বড় ঘর হয় না।'

মা যেন আমাকে তেড়ে এল, 'হয় হয়। ধন দৌলত মানুষকে মান সম্মান এনে দেয়। প্রতিপত্তি দেয়। ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা দেয়।'

কথা বলতে বলতে মা এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লো আশঙ্কা হচ্ছিল মা না অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আমি চুপ করে আছি দেখে মা আবার বলতে লাগলো, 'কেন তুই ওর সঙ্গে মিশবি, ঘুরে বেড়াবি? রাস্তায় কত লোক চলাচল করে, কেউ যদি দেখে ফেলে? সুন্দরী মেয়েদের কলঙ্ক খুব তাড়াতাড়ি রটে। তুই ভেবেছিস, তারপর তোর বিয়ে হবে? বিয়ে না হলে সরোজিনীর অবস্থা হবে না তোর? কেঁদে কেঁদে আকুল হবি না তুই?'

'না, হবো না।'

'কেন হবি না? অ্যাঁ, বল কেন হবি না?'

মা কোনদিন আমার গায়ে হাত তোলে নি। অন্তত আমার সে কথা মনে পড়ে না। আজ না মা আমাকে মেরে বসে। মার খাওয়ার ব্যাথার চেয়ে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা আমাকে বিহ্বল করে তুললো। আমি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মাব সঙ্গে জীবনে কোনদিন তর্ক করিনি। যা বলেছে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কখন সখন যদি বা প্রতিবাদ জানিয়েছি, সে ছিল নীরব প্রতিবাদ। আজ যে এমন জঘন্য এক বিষয় নিয়ে নির্লজ্জের মত মার সঙ্গে বচসা শুরু করে দেব ভাবতেও পারি নি।

আমি পালাবার পথ খুঁজতে লাগলাম। কী রকম অসহায় বোধ হতে লাগলো। চকিতে একবার মনে হলো, অরিন্দমের সঙ্গে না বেড়ানোই উচিত ছিল। মার চতুর চোখ আমার এই অসহায় রূপ আবিষ্কার করতে পেরে যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

'আর কোনদিন ঐ ছেলেটার সঙ্গে মিশবি না। আবার যদি জানতে পারি, ওর সঙ্গে মিশেছিস, কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে দেব।'

আমি আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, 'মা!'

মা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার সর্বাঙ্গ দেখে নিয়ে বললো, 'মেয়েদের রূপ ভগবানের দান। এ দান মাথা পেতে নিতে হয়। ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়ার জন্য এ রূপের সৃষ্টি হয় না।'

আমার মাথা ক্রমশ নুয়ে আসছিল। একটা অপরাধবোধ আমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। আমার এই দুর্দশায় মার মনে একটুও করুণা হলো না। মা আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে লাগলো। মার গলার স্বর কী অসম্ভব কর্কশ শোনাচ্ছে এখন, 'কণিকার দেওরের সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয়, ভাগ্য বলে জানবি। কণিকার মন নেহাৎ খুব উদার, না হলে এমন মেয়েকে ঘরের বৌ করতে চায় কেউ।' মা দম নিয়ে বাকী কথাটা শেষ করে ফেললো, 'যে মেয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে ট্যাক্সিতে ফুর্তি করে বেড়ায়! ছিঃ।'

মা যেন এক দলা থু থু আমার মুখে ছিটিয়ে দিল।

আজ রাতে আমার খাওয়া হয়নি। ইচ্ছে করে খাইনি। খেতে ইচ্ছে করেনি। না খেয়ে শুয়ে রইলাম। মা একবারও আমাকে ডাকলো না। রোজ খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা পাশাপাশি শুয়ে কিছুক্ষণ গল্প করি। তারপর ঘুমোই। দৈনন্দিন জীবনের এই রূপ পালটে গিয়ে আজ নতুন এক রূপ নিল। মা খেয়েছে কিনা জানি না। উঠে গিয়ে যে দেখবো, সে ইচ্ছেটুকুও আমার মধ্যে নেই। পঙ্গুর মত আমি বিছানায় পড়ে আছি।

ভাগ্য ভাল, দাদা আজ দেরী করে ফিরবে। কোথায় নাকি নেমন্তন্ন আছে। বাবা উদাসীন মানুষ। আমি খেলাম কি না খেলাম তাঁর দৃষ্টিতে পড়বে না। কিন্তু দাদা থাকলে নির্ঘাৎ এ নিয়ে হৈ হল্লা বাধিয়ে তুলতো। নানা রকমের ওজর আপত্তি দেখিয়েও ওকে নিরস্ত করা যেত না। বাধ্য হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে উঠতে হতো, খেতে হতো। ভাগ্য ভাল, দাদা আজ বাড়িতে নেই।

ছি, ছি, কী লজ্জা, কী লজ্জা! পুঞ্জ পুঞ্জ লজ্জার আড়ালে হারিয়ে যেতে লাগলাম। ক্রমশ আমি এক ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়ে গেলাম।

অরিন্দম, অরিন্দম, তুমি আমাকে এ কী লজ্জার অতলে তলিয়ে দিলে! আজ দুপুর পর্যন্ত যে মেয়েটি নিজেকে নিয়ে তিলমাত্র বিব্রত বোধ করেনি বরং তার রূপ-যৌবন-দীপ্ত দেহকে ঈশ্বরের অকৃপণ

হাতের দান বলেই ভেবে নিয়েছিল, সেই আমি—দোলন নিমেষে কী করে নিজের কাছে নিজে এমন ছোট হয়ে গেলাম!

সে তো শুধু মাত্র তোমারই জন্যে।

কেন তুমি অন্ধকারের অতলে আমাকে তলিয়ে দিলে অরিন্দম?

কেন, কেন, কেন?

বাবা আগে এরকম ছিলেন না। বরিশালে থাকতে তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী এবং রসিক। বাবা তখন এত কথা বলতেন যে মাঝে মাঝে মাকে ধমক লাগাতে হতো। বাবা তখনও খুব পড়াশুনো করতেন। আমি আর দাদা বাবার মুখে কত গল্প যে শুনেছি! বাবা ইংরেজী বই পড়ে বাংলায় তর্জমা করে শোনাতেন। তখন খুবই ছোট ছিলাম। সব হয়তো বুঝতাম না, কিন্তু শুনতে খুব ভাল লাগতো। মনে হতো আমি যেন গল্পের সেই রাজ্যে চলে গিয়েছি, যেখানে দুঃখ বলে কোন বস্তুর অস্তিত্বই নেই। আছে শুধু অনাবিল সুখ। রোমাঞ্চকর এক জগৎ।

ধীরে ধীরে সেই জগৎ হারিয়ে গেল। হয়তো এমন দিন আসবে, তখন আর মনেই পড়বে না, আমি কোন একদিন এমন একটা জগৎকে অনুভব করেছিলাম, যাকে ঘিরে আমার আশা আকাঙ্খা স্বপ্ন ও সুখ গড়ে উঠেছিল। সেই জগৎ যে হারিয়ে গেল, তার জন্যে কাকে দোষ দেব? বাবাকে? নিজেকে? না কি সেই জগৎটাকে যে ইচ্ছে করে আমার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল? এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। দোষ আমি কাউকে দিতে চাই না। কিন্তু যা হারিয়ে গেল, তা আর ফিরে আসবে না। বাবাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। পাওয়া সম্ভব না।

বাবা আজকালও চোখের সামনে বই খুলে বসে থাকেন। আইনের মোটা মোটা বই। কিন্তু আমার সন্দেহ জাগে, তিনি কি সে সব বই

পড়েন, না শুধু মাত্র তাকিয়েই থাকেন? যদিও অনেকদিন আগের কথা, কিন্তু ছবিটা আমার বেশ মনে আছে। একটা টেবিল-লাইট জ্বেলে বাবা বই পড়ছেন। অনেকক্ষণ ধরে বাবার আশে পাশে ঘুরছি। ইচ্ছে, বাবা মুখ তুলে তাকান, আমাকে আদর করে কাছে টানেন, গল্প বলেন। বাবা কিন্তু একবারও মুখ তুলছেন না। আমি যে একটা মানুষ, সেই মানুষটা ঘুরছি তাঁরই কাছাকাছি, ইচ্ছে করে মাঝে মধ্যে দু একটা শব্দও করে ফেলছি, অথচ ধ্যানমগ্ন ঋষির মত তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। যদিও তখন বাবার এই একাগ্রতা আমাকে পীড়াই দিত, কিন্তু এখন মনে হয় বাবার সেই মৌন মমাহিত মূর্তি আমি কি আর কোনদিন দেখতে পাব না। এখনও মাঝে মাঝে বাবা যখন বইয়ের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন, আমি খুব সন্তর্পণে বাবার পিছনে এসে দাঁড়াই; ভাবি, বাবা যেন আমাব উপস্থিতি অনুভব কবতে না পারেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, বাবা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে আমাব দিকে তাকান। তাঁর মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তিনি কোন কথা বলেন না। আমার কাছ থেকে হয়তো কিছু শোনার প্রত্যাশা করেন। কিন্তু কী করে তাঁকে বলি, আগে তো তুমি কখনও এমন অমনযোগী ছিলে না, ছোটখাট শব্দ তোমার কানে গিয়ে পেঁছিতও না। আজ যে এই নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালাম, কেন তুমি আমার দিকে ফিরে তাকালে, তোমার বহুদিন আগেকার একটি রূপ দেখার যে বাসনা আমার অন্তরে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, কেন তাকে গলা টিপে হত্যা করলে?

বাবাকে এ কথা বলা যায় না।

বাবার দুঃখকে আমি স্পর্শ করতে পারি। বাবা যে একটা বই খুলে সর্বক্ষণ তাকিয়ে বসে থাকেন, আমি জানি এই তাকানোর মধ্য দিয়ে তিনি বিরাট এক অতীতকে অনুভব করার চেষ্টা করেন। বরিশালের সেই বাড়ি, পিছন দিকে বাগান, বাগানের এক কোণে শিকল দিয়ে টাঙ্গানো দোলনাটা, পুলিশ সাহেবের মালি যে বিলেতী

ফুলের চারাগুলো এনে দিয়েছে তাতে নানা বর্ণের ফুল ফুটেছে, বেঁটে কাঁঠাল গাছটার ডালে ডালে ফল, ছোট একটা ঘর—বাবার লাইব্রেরী ঘর, আলমারী-ঠাসা বই, বাবা ইচ্ছেমত বই নিয়ে পড়ছেন, কিছু আইনের বই, বেশীর ভাগই অন্য বই, যার মধ্যে লেখা রয়েছে দেশ-বিদেশের কথা, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাবা আমাদের গল্প বলে শোনাচ্ছেন, দাদাকে আমাকে, আমি বাবার কোলে বসে আছি, দাদা একটা চেয়ারে, মা হয়তো একবার এসে তাড়া দিয়ে গেল খাওয়ার সময় হয়েছে বলে, বাবা আড়চোখে মার দিকে তাকিয়ে আমাকে নামিয়ে দেওয়ার ভান করলেন, যেন কত ভয় পেয়েছেন—সব কিছুই কি তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন? এক এক সময় বলতে ইচ্ছে করে, পিছন দিকে তাকাতে নেই বাবা। সামনের দিকে তাকাও। ভরসা পাবে।

বাবাকে এ কথা বলে লাভ কি। হয়তো বুঝবেন না।

বুঝবেন না বলেই আমার ভয়। বাবা ছিলেন কল্পনাবিলাসী মানুষ। এই সব মানুষ বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে। সেই ভাঙ্গা টুকরো সহজে জোড়া লাগে না। জোড়া লাগলেও চিড় থেকে যায়। সময় অসময় সেখানে স্পর্শ লাগলে এই সব মানুষ দিশাহারা বোধ করে। বাবাকে আমার একজন দিশাহারা মানুষ বলেই মনে হয়। উত্তাল তরঙ্গের মাঝে নাবিকবিহীন এক জাহাজ ভেসে চলেছে। উদ্দেশ্যবিহীন, গন্তব্যহীন যাত্রা। এই যাত্রার পরিসমাপ্তি গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার মধ্যেই। সবার অলক্ষ্যে। অসার্থক, মূল্যহীন, গ্লানিকর পরিসমাপ্তি।

বাবার তুলনায় মা অনেক বেশী সার্থক। জীবনের একটা অর্থ মা হয়তো খুঁজে পেয়েছে। জীবন অর্থে একটি সংসার, তাতে গুটিকয়েক মানুষ। তাদের নিয়ে সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য ভালবাসা। জীবনকে অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে না। মার জগৎ ছোট একটা গণ্ডিতেই আবদ্ধ। মা চায়, তার সংসার স্বচ্ছল হোক। স্বামী প্রচুর

অর্থ উপার্জন করুক। ছেলেটির সুন্দরী বৌ হোক। মেয়েটির বিয়ে হোক বড় ঘরে। এর চেয়ে বেশী কিছু চাওয়ার নেই মার।

জীবনকে মা ভালবাসতে পেরেছে, শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। প্রতিদানে জীবন থেকে কিছু পাওয়ার আশা করা মার পক্ষে খুবই ন্যায়সঙ্গত অধিকার। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে মাকে খুব সুস্থ এবং স্বাভাবিক বলে মনে হয় আমার।

যদিও মার চরিত্রে বহু দোষের প্রকাশ দেখতে পাই, তথাপি সময় সময় মাকে একজন উদারচেতা মানুষ বলে মনে হয়। উদারচেতা এবং ক্ষমাশীল। ক্ষমা মানুষের মহৎ গুণ। সেই দিন কণিকাদির দেওর নিয়ে আমার এবং মার মধ্যে কী বিশ্রী রকমের গোলযোগ বেধে উঠলো। ভেবেছিলাম, তারপর মা আমার বিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে লেগে যাবে। কণিকাদির দেওরের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে জিদ ধরে বসবে। মা কিন্তু সে পথে গেল না। এমন কি সেই বিশ্রী ব্যাপারটাও ভুলে গেল। ভুলে না গেলেও ভোলার ভান করলো। আমি বলবো, এটা মার চরিত্রের এক মস্ত গুণ।

দুদিন যেতে না যেতেই মা নিজে থেকে আবার আমার চুল বেঁধে দিল। কী সব গায়ে মুখে মাখিয়ে দিল। আমি যখন প্রচণ্ড বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, এসব কী মাখাচ্ছো, মা তখন মিষ্টি হেসে বললো, 'বর্মাদেশে তানাখা বলে একরকম জিনিষ পাওয়া যায়। অনেকটা চন্দনের মতন। মাখলে রং খুব ফর্সা হয়। রায়-দিদির এক দেওর থাকে বর্মায়, সেই এনেছিল।' একটু থেমে মা আবার বললো, 'ব্যাসনেও রং ফর্সা হয়। বরিশালে থাকতে দুধের সর মাখাতাম তোকে। কত দুধ ছিল।' শেষের কথাটা ক্ষেদোক্তির মত শোনালো।

নির্ঘাৎ মার ইচ্ছে, আমাকে দুধের সর মাখায়। কিন্তু যে সংসারে পরিমাণমত দুধের যোগাড় হয়ে ওঠে না, সেখানে সরের প্রশ্ন অবাস্তব।

মা কণিকাদির প্রসঙ্গ তোলে না আজকাল। ইচ্ছে করেই যেন কণিকাদির কথা এড়িয়ে চলে। এটাও মার এক বিশেষ গুণ। গুণই

বলবো। এই যে আপোষ মীমাংসার একটা ভাব, গুণ নয় এটা। সেদিন আমার সঙ্গে যে বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটে গেল, সেটা কণিকাদিকে কেন্দ্র করেই তো।

আমি বুঝতে পারছি মা মনে মনে কণিকাদির ওপর অসন্তুষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। কণিকাদি দূরের মানুষ, অসন্তুষ্ট হতে হলে তার ওপর হওয়াই ভাল। মা নিশ্চয় এই কথাটা মনে মনে বুঝতে পেরেছে। পেরেছে বলেই আমি বেঁচে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম কণিকাদির দেওরের সঙ্গে কস্মিনকালে আমার বিয়ে হবে না। হবে না, যেহেতু আমি কণিকাদির দেওরকে বিয়ে করতে প্রস্তুত না।

যদিও সময় সময় মা একজন জেদী মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে ভালবাসে, আমি জানি, সেটুকু অভিনয় ছাড়া আর কিছু না। অভিনয় শেষ হয়ে যায়। মা হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে মা একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ। জোর করে অন্যের ওপর নিজের ইচ্ছা-শক্তি আরোপ করতে ভরসা পায় না।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মাকে লোভী এবং স্বার্থপর মনে হয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এই স্বার্থপরতার পিছনে এক ধরনের স্নেহ বা অতিরিক্ত মমতাবোধ কাজ করে চলেছে। এই যে বড়লোক দেখলে মা সেদিকে আকৃষ্ট হয়, অকারণে তাদের কাছে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করে ফেলে, এর পিছনে রয়েছে সন্তানদের প্রতি অপরিসীম মমতাবোধ। কণিকাদি আমাকে ভালবাসুক, আমার মঙ্গল চিন্তা করুক, কণিকাদির কৃপায় আমার ভাল হোক, এই আকাঙ্খার তাড়নায় মা যে কত নীচে নেমে যেতে পারে! অহর্নিশ এই যে টাকা টাকা করে বাবাকে পাগল করে তুলছে, আমি জানি, বাবা যদি সখ করে কোনদিন মার জন্যে একটা দামী শাড়ি কিনে নিয়ে আসেন সেদিন সংসারে তুমুল কলহের সৃষ্টি হবে। অথচ ভাল একটা শাড়ি নেই বলে কতদিন যে বাবাকে খোঁটা দিয়েছে মা। বাবা

কোন উত্তর দিতে পারেন না সেই সময়। শুধু বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তখন মাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। নিষ্ঠুর এবং লোভী।

আমাব মনে মার সম্বন্ধে ভাল এবং মন্দর দুটি চিন্তাধারা বয়ে যেতে থাকে একই সঙ্গে।

এই সংসারের তৃতীয় ব্যক্তি দাদা।

দাদা ভালমানুষ না। তাকে মন্দও বলা চলে না। জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় যে মানুষ, তার আলাদা সত্তা থাকে না। থাকাব কথাও না। দাদার কাছে জীবন মোটেই বহস্যময় না। জীবন অর্থে গোটা কয়েক বছর, যা ভাল হোক মন্দ হোক, একভাবে কেটে যাবেই। এই কাটানোর দায়িত্ব যদি কারও ওপর ন্যস্ত হয়ে থাকে তা আছে স্বয়ং জীবনেরই ওপর। দাদার মতে, তার নিজস্ব কোন দায় দায়িত্ব নেই এ ব্যাপারে। বিরাট একটা চাকার ওপরে বসে আছি সবাই। চাকাটা দিবারাত্র ঘুবছে। আমি থামতে চাইলেও সে থামবে না। শুধুই ঘুরবে—ঘুরতেই থাকবে। এই হচ্ছে জীবনের সাব মর্ম। সুতরাং জীবন নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন। দাদা যে মুখেই একথা বলে তা না। আমার ধারণা এটাই ওর বিশ্বাস।

কলেজে পড়তে দাদা একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই দাদা টুক করে সরে পড়লো। তারপরেও মেয়েটা আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতো। আমার সঙ্গে, মার সঙ্গে গল্প গুজব করতো। দাদা তখন এমন ভাব দেখাতো যেন মেয়েটিকে ও চেনে না। যদি বা চেনে, ওর সঙ্গে পরিচয় এত সংক্ষিপ্ত যে তার সূত্র ধরে অন্তরঙ্গ হওয়া যায় না। দাদা সেই সময় মেয়েটির সঙ্গে একজন উদাসীন মানুষের মত আচরণ করতো।

একদিন দাদাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। ও নিপাট ভাল মানুষের মত মুখ করে উত্তর দিয়েছিল, 'প্রথম প্রথম পুতুলকে ভাল

লাগতো। যদ্দিন ও আমাকে এড়াতে চাইতো, তদ্দিন। তারপর যেদিন থেকে ও আমাকে ভালবাসতে শুরু করলো, আমার কেমন বিশ্রী লাগতো। অবিশ্যি ভালবাসা বলে কোন পদার্থ যদি জগতে থেকে থাকে।' ও এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলেছিল যে সরাসরি ওর কথা অগ্রাহ্য করতে পারিনি। সেদিন একটা কথা মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছিলাম, দাদার বয়স যাই হোক না কেন, ও একজন সত্যিকারের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ।

দাদার চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটাও আমার কাছে কম বিস্ময়কর না। যেদিন ও চাকরি পেল আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, 'আমাকে কিন্তু অনেকগুলো সিনেমা দেখাতে হবে। আর খুব সুন্দর একটা শাড়ি।'

দাদা নিরাসক্ত মুখে উত্তর দিয়েছিল, 'তোরা খুব অল্পতেই খুশী হতে পারিস।'

আমি সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম। আজ মনে হয়, দাদা একজন সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ। জ্ঞানী না হলে মানুষ পার্থিব লাভ ক্ষতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে না।

দাদার বন্ধু বান্ধবদের সংখ্যা ছিল বিরাট। কিন্তু অন্তরঙ্গ বলতে একজনও ছিল না। যদিও দাদা বলতো, প্রবীর ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি কিন্তু বুঝতে পারতাম প্রবীর সম্বন্ধে দাদার কোন দুর্বলতাই ছিল না। প্রবীর দাদাকে খুব ভালবাসতো এবং আশা করতো দাদাও ওকে সেভাবে ভালবাসুক।

প্রবীরের সেই আশা বারংবার ব্যর্থ হয়েছে। সেজন্য প্রবীরের মনে গভীর দুঃখ ছিল। সেই দুঃখের কথা আমি জানতাম। প্রবীর একদিন বলেছিল, 'জান দোলন, দীপু কাউকে ভালবাসতে পারে না। ও দেখাতে চেষ্টা করে, আমাকে খুব ভালবাসে। কিন্তু আমি যদি হঠাৎ একদিন মরে যাই, ও ঘটা করে শ্মশানে নিয়ে আমাকে পুড়িয়ে আসবে, কিন্তু এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না।'

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, 'চোখের জলের ওপর আপনার এত লোভ কেন ?'

সত্যিই কি চোখের জলের ওপর মানুষের লোভ থাকে না ?

অনেকদিন অরিন্দমের সঙ্গে দেখা করিনি। ইচ্ছে করেই করিনি। কলেজ ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ট্রামে উঠে পড়ি। এদিক ওদিক তাকাই না পাছে অরিন্দমকে দেখতে পাই। কেন যে হঠাৎ অরিন্দমকে ভয় পেতে শুরু করলাম। বাড়ি ফেরার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মনে হয়, কোথায় যেন কী হয়ে গেল। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ি। আমার পাশে শুয়ে মা দিব্যি ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ঘুরে ফিরে সেই দৃশ্যই আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। গাড়ি ছুটে চলেছে। রাস্তার দুপাশে গাছের সারি। ছায়া-ছায়া পথ। সেই পথে আমরা দ্রুত ছুটে চলেছি। তারপর একসময় অরিন্দমের ঠোঁট আমার ঠোঁট ছুঁয়ে গেল। সমস্ত শরীরেব মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়েছে। এক্ষুণি হয়তো খণ্ড খণ্ড হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বো।' ইচ্ছে হয় দু হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরি। ভরসা খুঁজে নিই। কিন্তু মার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। মা যখন ঘুম-ঘুম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করবে, কি হলো, কী উত্তর দেব ? কি উত্তর দিতে পারি ?

কণিকাদি আজকাল আর আসে না। ভেবেছিলাম ওর না-আসা নিয়ে মা আমাকে প্রশ্ন করবে, নিজের ভাগ্যকে দোষ দেবে অমন একজন মুরুব্বি আমার জীবন থেকে সরে গেল বলে। কিন্তু মা সেরকম কোন আচরণ তো করলই না বরং আমাকে বিস্মিত করে একদিন বলে বসলো, 'তোর সঙ্গে এই ছেলেটার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল কণিকা আর ঢং করে দেওরের সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে এল।'

বাধ্য হয়ে আমাকেই বলতে হয়েছিল, 'এক জায়গায় তুজন মানুষের দেখা হলে আলাপ করিয়ে দিতে হয়।'

মা যদিও মুখে কোন উত্তর দিল না কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, কণিকাদির ওপর মা ক্রমশই বিরূপ হয়ে উঠছে। কণিকাদি যদি অরিন্দমের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে না দিত, আমি কখনই ওর সঙ্গে ট্যাক্সিতে ঘোরার সুযোগ পেতাম না। মা সেই কোণ থেকে সমস্ত বিষয়টাকে দেখতে শুরু করেছিল।

'কণিকার বর কিছু বলে না?'

মার মুখ থেকে হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্ন শুনবো বলে আশা করিনি। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'কণিকাদির বর কিছু বলবেন কেন?'

মার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ, 'এই যে যখন তখন একটা ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে, আসছে, লোকেও তো বলাবলি করতে পারে।'

ঠোঁট উল্টে বললাম, 'লোকের খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই। কিন্তু তুমি জানলে কি করে, কখন ওরা বেরোয়, কখন ফেরে? তুমি কি ওদের দিকে তাকিয়ে থাক?'

মা কেমন অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলো। বললো, 'আগে তাকাতাম না। আজকাল মাঝে মাঝে ওদিকে চোখ যায়।'

মনে মনে হাসলাম। চিরদিনই ওদিকে তোমার চোখ যায়।

মা যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলো, সাফাই গাওয়ার মত করে বললো, 'এক পাড়ায় থাকি, সব বাড়ির দিকেই তো নজর যায়। সেদিন যে রায়-দিদির বড় ছেলেটা মদ খেয়ে এসে অমন চেঁচামেচি করলো, সবই তো দেখলাম।'

'মানুষ মদ খায় কেন মা?'

আমার প্রশ্নে মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর বললো, 'কি জানি, কেন খায়। হয়তো তুঃখ ভুলতে।'

'রায়-দিদির বড় ছেলের আবার কি তুঃখ?'

'কি জানি, কি দুঃখ। আছে হয়তো কিছু। আয় তোর চুল বেঁধে দি-ই।'

'থাক।'

'থাকবে কেন, আয় বেঁধে দি-ই।'

'কি হবে শুধু শুধু চুল বেঁধে।'

মা কথা শুনলো না। জোর করে চুল বাঁধতে লাগলো। চুল বাঁধা শেষ করে বললো, 'স্নো পাউডার মেখে আয়। শাড়িটাও পাল্টে নিস।'

'কি হবে শুধু শুধু সেজে?'

মা রেগে গেল, 'শুধু শুধু হলেও চুল বাঁধতে হয়, সাজতে হয়।'

আমি হেসে ফেললাম, 'তোমার সরোজিনী সাজতো, চুল বাঁধতো?'

মা আমাকে ধমক লাগালো, 'সরোজিনীর কথা থাক। ভাবলেও বুক কাঁপে আমার।'

মার কথায় আরও জোরে হেসে উঠলাম, 'সব কথায় বুক কাঁপে কেন তোমার। সরোজিনীর বিয়ে হয়নি বলে আমারও বিয়ে হবে না। খুব ভাল বিয়ে হবে আমার।'

আমার কথায় যে মা খুশী হলো বুঝতে পারলাম। মা বললো, 'আগে তো সেজেগুজে ছাদে পায়চারি করতিস।'

মাকে কী করে বলি, সে ইচ্ছাটা মরে গেছে।

মরে গেছে ঠিক না, মেরে ফেলেছি। ছাদে উঠতে আজকাল আমার দারুণ আলস্য লাগে। কেন লাগে বুঝি না। শুধু কি আলস্য? একটু ভয়ও বা। মনে হয়, অবাধ্য চোখ দুটো যদি কণিকাদিদের বাড়ির দিকে চলে যায় এবং সেখানে কণিকাদিকে দেখতে পাই, সঙ্গে যদি অরিন্দম থাকে!

কিন্তু কী এসে যায় আমার? আমি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে অরিন্দমকে কক্ষচ্যুত করে আমার দিকে আকৃষ্ট করতে পারি। সে শক্তি আমার আছে। শত ইচ্ছা করলেও কণিকাদি অরিন্দমকে

ফিরিয়ে নিতে পারে না। কথাটা মনে হতেই দুর্জয় এক শক্তিকে অনুভব করি নিজের মধ্যে। আমি সুন্দরী, বিদুষী, আমার এই দেহ সৌষ্ঠব যে কোন পুরুষ মানুষের কামনার বস্তু। কলেজ থেকে ফেরার সময় ছেলেদের জটলা দেখি। দেখি ওদের চোখে মুখে দুরন্ত লোভ। লোভ ছাড়া আর কি।

সেই আমি কিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাব কণিকাদির মত একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে, যে কিনা যৌবনের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। হাস্যকর, রীতিমত হাস্যকর ব্যাপার।

কণিকাদি সম্বন্ধে এমন করে ভাবিনি কোনদিন। ভাববো বলে ভাবিনি।

কণিকাদি সম্বন্ধে যতই ভাবি, কণিকাদি ততই নেশার মত আমার মনে ছড়িয়ে পড়ে। আমাকে বিহ্বল করে তোলে। সময় সময় পথহারা পথিকের মত আমি দিশাহারা বোধ করি। কণিকাদি যে আমার জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিজেকে বিস্তার করে নিয়েছে, সেকথা বুঝতে পারি। বুঝতে পারি বলেই অসহায় বোধ করি। অকারণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। নিজের ওপর, ওর ওপর।

সেদিন কী একটা কথা বলতে এসে দাদা চুপ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর কাছে সরে এসে একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'খুব চালিয়ে যাচ্ছিস তলে তলে।'

আমি দারুণ চমকে গিয়ে বললাম, 'কী আবার চালিয়ে যাব। যদি চালাই তলে তলে চালাবো কেন, ওপরে ওপরেই চালাতে পারি।'

দাদা খুব ভারিক্কি চালে বললো, 'অন্যায় কাজ মানুষ তলে তলেই চালায়।'

আমি সাহস দেখিয়ে বললাম, 'আমি কোন অন্যায় করি না।'

দাদা এবারও ভারিক্কি চালে জানালো, 'তুই খুব ছেলেমানুষ দোলন। অন্যায় করে না, এমন মানুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটিও

নেই। শিশুরাও জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। না হলে শীতের রাতে কোন ব্যাটা বিছানা ভাসায়। যে মা তাকে এত যত্ন আত্তি করে তাকে দিয়েই কিনা ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাঁথা বদলিয়ে নেয়।' দাদা সমানেই হাসতে লাগলো।

'এবারে বল তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি ?'

দাদা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, 'আসল নকল কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই। তোর সঙ্গে একটু গল্পসল্প করতে এলাম। এই আর কী।'

আমি উত্তর না দিয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'বিশ্বাস হলো না তো ?'

বললাম, 'না।'

'এই তোদের মস্ত দোষ। মানুষকে সহজে বিশ্বাস করতে পারিস না। ছাখ, বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল। অবিশ্বাসের জ্বালা বড় ভয়ঙ্কর রে।'

'তত্ত্ব কথা থাক। আসল কথা বলো।'

'রাগ করবি না ?'

'আমার রাগকে কত যেন ভয়, তোমার।'

'সময় সময় করতে হয়। আচ্ছা বলেই ফেলি। শুনতে চাস যখন। তোদের সেকশনে তুতুল বলে যে মেয়েটি পড়ে, তাকে একদিন বাড়িতে নিয়ে আয়।'

'আমাদের ক্লাসে কোন তুতুল পড়ে না।'

দাদা অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলো, 'পড়ে পড়ে। সেই যে লম্বা মেয়েটি। ছিপাছিপে। প্রায় দিনই লম্বা বিনুনী ঝুলিয়ে আসে। ওর একটা মুদ্রাদোষ আছে, মাঝে মাঝে নখ খায়।'

'কার কথা বলছো, জয়তির ?'

'হ্যাঁ রে, তুতুলও যে, জয়তিও সে।'

'পুতুলকে নিয়ে সাধ মিটলো না ?'

'পুতুল নিয়ে কি মানুষের সাধ মেটে রে। মানুষ চায় রক্তমাংসের মানুষ।'

রক্ত বাদ দিয়ে শুধু মাংস বলো। কথাটা মুখে আসতেই গিলে ফেললাম। একথা দাদাকে বলা যায় না।

আমি চুপ থাকায় দাদা আবার বললো, 'জীবনে প্রেম ট্রেম না থাকলে কী রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তাই—'

'বিয়ে করলেই পার।'

দাদা একটা চেয়ারে বসলো। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়তে লাগলো। 'বিয়ে কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু প্র্যাকটিকাল দিক থেকে ওর কোন মূল্য নেই। অযথা বাইণ্ডিং—'

ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'দায়িত্ব না নিয়ে মজা লুঠতে চাও, তাই না। তা হবে না।'

আমার এই আকস্মিক উত্তেজনায় দাদা কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালো। বললাম 'কি হলো?'

'তোকে দিয়ে কাজ হবে না। নিজেকেই নিজের পথ দেখতে হবে।'

'কিভাবে পথ দেখবে?'

'যেভাবে আর দশটা গুণীজন দেখে।'

'কিভাবে?'

'ভয় নেই, তোদের কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো না। অত ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গে না। তাছাড়া তখন মেজাজটাও দারুণ তিরিক্ষি থাকে।'

'কলেজ ছুটির পর ওর পিছু নিলেই পার, তারপর ট্যাক্সি করে হুস—' যদিও দাদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অনেকটা বন্ধুর মত, কিন্তু কী জানি কেন, কথাটা বলে ফেলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। আরও বেশী বিব্রত বোধ করতে লাগলাম ওর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা দেখে। দাদার চোখ দুটো বেশ বড়। শান্ত চাহনি। এইসব দৃষ্টি যদিও মনে শঙ্কা ঘনিয়ে তোলে না, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ওর দৃষ্টিকে

এড়িয়ে যেতে চাইলাম। চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বললাম, 'জয়তিটা ভীষণ বোকা। ও হয়তো তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে যাবে।'

দাদা মানুষটা বেশ সরল। সহজেই ওকে নিজের পথে তুলে নিয়ে এলাম। 'ভয় কেন?'

'তুমি সময় সময় যেভাবে বিকট শব্দে হেসে ওঠো।'

'সে তো বন্ধুদের সঙ্গে হাসি তামাশা করে, মেয়েদের সামনে কখনও সেভাবে হাসে!'

ওর ভাবভঙ্গি দেখে হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু হাসলাম না। গম্ভীরভাবে বললাম, 'একটা সর্তে জয়তিকে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারি। তুমি কণিকাদিকে একদিন খুব কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। কী সাহস মহিলাটির! জানো, সেদিন মার কাছে আমার জন্যে একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল। ওর দেওরের সঙ্গে। কী বিশ্রী দেখতে লোকটা। কালো, মোটা, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। নির্ঘাৎ চব্বিশ ঘণ্টা মদের মধ্যে ডুবে থাকে।'

দেখতে দেখতে দাদার মুখে রাগ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। দাঁত চেপে চেপে ও বলতে লাগলো, 'টাকার গরম বার করছি ওদের।'

'আর বলে কি জানো, আমাকে নাকি ও দারুণ ভালবাসে এবং ভালবাসে বলেই দেওরের সঙ্গে সম্বন্ধ করছে।'

দাদা হঠাৎ চিৎকার করে মাকে ডাকতে লাগলো। যত ওকে থামাতে চেষ্টা করি তত ও চিৎকার করে। মা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, 'কি হয়েছে রে দীপু?'

'তোমার ঐ মহিলাটিকে সাবধান করে দিও মা। আগুন নিয়ে যেন খেলতে না আসে। ছারখার করে দেব।'

মা বিভ্রান্তভাবে আমাকে প্রশ্ন করলো, 'কার কথা বলছে রে?'

আমি ভালমানুষের মত মুখ করে বললাম, 'কি জানি।'

দাদা কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মা ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বললো, 'কটা বাজে খেয়াল আছে? ন'টা কুড়ি।'

'সর্বনাশ! আমি চান করে আসছি, শিগগির ভাত বাড়ো। এজেন্টটা আজকাল ঘড়ি ধরে বসে থাকে। সাতকুলে কেউ নেই, বিয়েথা পর্যন্ত করেনি, ঘরে মন টেঁকে না ব্যাটার। সাতসকালে এসে অফিসে বসে থাকে।' বলতে বলতে দাদা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দাদার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক বিচিত্র অনুভূতি আমার মনে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আমরা দুজনে একই বাপ-মায়ের সন্তান। বলতে গেলে এক বৃন্তে দুটি ফুল। একই বৃন্তের ফুল যখন, এক জাতীয় ফুল হওয়ারই কথা। এক বর্ণ, এক গন্ধ। কিন্তু কী ভয়ানক পার্থক্য আমাদের দুজনের মধ্যে! দাদা কত সহজে জয়তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার কথা বললো। আমি যদি জয়তিকে এ বাড়িতে নিয়ে না আসি, দাদা হয়তো দু-একদিন অনুযোগ করবে, তারপর ভুলে যাবে। এটাই ওর রীতি। কোন একটা জিনিষকে আঁকড়ে ধরে থাকার মত ধৈর্য বা একাগ্রতা ওর নেই। বা এমনও তো ভাবা যেতে পারে, এখানে ধৈর্য বা একাগ্রতার প্রশ্ন ওঠে না। ও একজন সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ, ও বুঝতে পেরেছে, পৃথিবীতে বাঁচতে হলে, সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে হলে, সবচেয়ে প্রথমে যে বস্তুটিকে নিজের আয়ত্বে আনা প্রয়োজন সেটা হলো নিজেকে স্বাভাবিক করে নেওয়া, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। মানুষের রীতিনীতি চালচলন যেভাবে দ্রুত পালটে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় কারও কাছ থেকে আন্তরিকতা আশা করা যায় না। কারও অপেক্ষায় বসে থাকলে চলে না।

অনেকদিন পর আজ অরিন্দমের কথা মনে পড়লো। মনে পড়া ঠিক না, মনে রোজই পড়ে কিন্তু কঠিন হাতে ওকে আমি দূরে সরিয়ে দিই। এক ধরণের বিতৃষ্ণা পোষণ করে চলেছি নিজের অন্তরে। অরিন্দম একজন ব্যর্থ পুরুষ। ব্যর্থ না হলে কেউ কি মেয়েমানুষের আঁচলের তলায় তলায় নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করার ফিকির খোঁজে? কণিকাদিদের বাড়িতে যেদিন প্রথম গিয়েছিলাম সেদিন ছিল

ববিবার। অথচ ওর দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে কণিকাদিব স্বামী যে ছুটির দিনেও ওকে দিয়ে কাজ কবিয়ে নিচ্ছিলেন, কণিকাদি তবু যা হোক (আমাকে দেখাবাব জন্যেই কিনা জানি না) একটা প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু সেই লোকটা সামান্য একটা কথাও বললো না, ঘাড় গুজে কাজ কবে গেল. কী বলা যায এইসব মানুষকে, মেরুদণ্ডহীন জড়-পদার্থ না এবা! অন্তত আমি সেবকমই মনে করি। সঙ্গে সঙ্গে দাদাব কথাও মনে পড়লো। এ অবস্থায পড়লে দাদা যে অরিন্দমের থেকে সম্পূর্ণ বিপবীত ব্যবহাব কবতো সে-বিষযে আমি নিশ্চিত, যদিও জানি, সেই অবস্থায় দাদাকে নিয়ে আসাব মত মানুষ এখনও পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ কবেনি। দাদাব কথা মনে হতেই গবে আমাব বুক ভবে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যথাও। অত্যন্ত নগণ্য, ব্যথাটা আছে কি নেই, কিন্তু তবু তো ব্যথা. সেই ব্যথাটা ক্রমশই যেন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

অরিন্দমের ঠোঁট যে মুহূর্তে আমার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল আমি একটা ঘন গন্ধ আবিষ্কার করেছিলাম। এই গন্ধ আমার অচেনা। দাদা এবং বাবা দুজনেই সিগারেট খান। কিন্তু অরিন্দমের সিগারেটের গন্ধটা অন্য বকম ছিল। মৃদু অথচ গাঢ়। এই গন্ধের সঙ্গে ওর চরিত্রগত একটা মিল ছিল যেন। গন্ধটা ছিল খুব মৃদু। এমন মৃদু যে সময় সময় মনে হচ্ছিল কোন গন্ধই বুঝি নেই। কিন্তু ঘুরেফিরে সই মৃদু গন্ধটাই বারংবার নাকে আসে। এমন হয়েছে কতদিন, তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, বাত গভীর, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, অন্ধকারেব মধ্যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি সহসা এক গন্ধময় জগতে চলে গেলাম। আমাব চতুর্দিকে মৃদু সৌরভ। খুব চেনা, খুব আপন। হাত বাড়ালে যেন স্পর্শ করতে পারি। কিন্তু পারছি না। শুধু অনুভব করছি অফুরন্ত সুখ। নাকি সুখ না। দুঃখ। বা কিছুই না। শুধু মৃদু এক ঘ্রাণ, যা কিনা সম্পূর্ণ অর্থহীন অবাস্তব, যেহেতু সেই ঘ্রাণ আমার জীবনে সুখ কিংবা দুঃখ কিছুই বহন করে

আনতে পারে না। পাবে শুধু অফুরন্ত শূন্যতার ব্যূহ রচনা করতে। সেই মুহূর্তে অবিন্দমকে আমি ঘৃণা করতে চেষ্টা করি। ঘৃণার মধ্যে দিয়ে ভালবাসতে।

জয়তিকে এ বাড়িতে নিয়ে আসার আগেই এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যাতে আমি সব কিছু ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম জয়তিকে, দাদাকে এবং হয়তো নিজেকেও।

কলেজ সেদিন সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেল। গভর্নিং-বডির কে নাকি মারা গেছেন। এই একটি দিনে কলেজ শুদ্ধ সবাই পরোক্ষভাবে এক মৃত্যুতে পুলকিত হয়ে ওঠে। মানুষ এক আজব জীব, শুধু নিজের কথাই ভেবে মরছে সর্বক্ষণ। যে মরে গেল তার যে সংসার রয়েছে, হয়তো গোটা কয়েক নাবালক ছেলে মেয়ে, তাদের কী হবে, বউটা কেঁদে কেঁদে অন্ধই হয়ে গেল বা, কেউ কিন্তু সে কথা ভাবছে না। মৃত্যু-সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বল্লি-তল্পা গুটিয়ে বাড়ির দিকে ছুটতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে সবাই। অথচ বাড়িতে যে বিরাট কোন আনন্দ অপেক্ষা করে রয়েছে তা না। অভ্যাসবশত সে প্রথমে বাড়ির দিকেই ছুটতে চায়। সেখানে শান্তি বা আনন্দ থাকুক আর না থাকুক।

আমার কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। অথচ যাবার মত জায়গাও খুব কম আছে এই পৃথিবীতে। পৃথিবীটাকে সময় সময় আমার খুব ছোট বলে মনে হয়। আবার এক এক সময় মনে হয়, বিশাল এক সমুদ্রের মাঝে আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটি প্রাণী, ঢেউয়ের তালে তালে উঠছি, নামছি, অথচ এই ওঠা নামার ওপর আমার নিজের কোন হাত নেই। যা আছে তা হলো, সীমাহীন ব্যর্থতা।

এই ব্যর্থতাবোধ সময় সময় আমাকে নতুন পথের ইঙ্গিত জানায়। তখন মনে হতে থাকে, যা আমি চাই, তা পাই না কেন? যাকে

যেমন ভাবে পেতে চাই, তাকে তেমন ভাবে পাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ?

এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, অরিন্দম আমার সামনে এসে দাঁড়াক। সেই যে ছোট্ট পাখিটা একদিন বরিশালের এক ঝুপসি গাছের আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তেমন ভাবে।

কী আশ্চর্য। কে যেন কানে কানে আমার নাম ধরে ডাকলো। এদিক ওদিক চোখ ফেরাতেই রাস্তার অন্য পাশে অরিন্দমকে আবিষ্কার করলাম। চলতে চলতে অরিন্দম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

কয়েকটা মুহূর্ত। সেই মুহূর্তে পৃথিবী আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটা চড়ুই পাখিও যদি এখন আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, আমি নির্ঘাৎ ওর ডানা-কাঁপানোর শব্দ শুনতে পাব।

অরিন্দম রাস্তা পেরিয়ে এদিকে আসছে। ওর দীর্ঘ শরীর ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। ও দ্রুত গতিতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা ট্রাম এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। নিমেষে সেই ট্রামে চড়ে বাড়ি ফিরতে পারতাম। কিন্তু পারলাম না। আমার পা দুটো অসম্ভব রকমের ভারী হয়ে উঠেছে। সেই পা নাড়াবার মত শক্তি আমার দেহে অবশিষ্ট নেই। অরিন্দম আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে বলতে চাইলাম, সরে দাড়াও অরিন্দম, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু আমার গলায় কোন আওয়াজ নেই। শুধু নিদারুণ এক শুষ্কতা আমাকে পুড়িয়ে মারছে। আমি কী ভয়ঙ্কর অসহায় বোধ করছি!

অরিন্দম কোমল কণ্ঠে ডাকলো, 'দোলন।'

আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। ও মৃদু কণ্ঠে বললো, 'এসো।'

না, না। আমি এখন বাড়ি যাব। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা

দরকার আমার। মা বসে থাকবে। আমি না ফিরলে চিন্তা করবে। বলতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। সময় কালে কেন কথা হারিয়ে ফেলি আমি ?

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি এক অখণ্ড নৈঃশব্দেব মাঝে দাঁড়িয়েছিলাম। সহসা নিস্তব্ধ পৃথিবী শব্দমুখর হয়ে উঠলো। মানুষজন চিৎকাব চেঁচামেচি কবছে, গাড়ি চলছে, ট্রাম ঘণ্টা পেটাচ্ছে। সেই শব্দমুখব জগৎ আমাব প্রাণে জীবনের স্পন্দন বয়ে নিয়ে এল। আমি স্বচ্ছ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে অবিন্দকে দেখলাম। ও পবিচ্ছন্ন ভাবে দাড়ি কামিয়েছে। সকালের নবম বোদ্দুব ওব মুখের ওপর এসে পড়েছে। ওকে গ্রীক ভাস্করের তৈরী মূর্তিব মত দেখাচ্ছে।

অরিন্দম নির্বাক বিস্ময়ে আমাব দিকে তাকিয়ে বয়েছে। বললাম, 'কি দেখছেন ?'

অরিন্দম সহসা উত্তব দিতে পাবলো না। ওব অসহায় রূপ আমার প্রাণে খুশীব বন্যা বইয়ে দিল। আবাব প্রশ্ন কবলাম, 'কি দেখছেন ?'

অরিন্দম নিজেকে সামলে নিয়েছে ততক্ষণ। বললো, 'তোমাকে। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে দোলন।'

তুমি আবার বলে বসো না অরিন্দম, আমাকে কোন গ্রীক ভাস্করের তৈবী মূর্তির মতন দেখাচ্ছে। তাহলে আমি নির্ঘাৎ হেসে ফেলবো।

অরিন্দম সে কথা বললো না। ও বললো, 'আজ সকালটা খুব সুন্দর। চলো বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায় ?' অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

'যেখানে হোক। এসো দোলন।' অরিন্দম আমার হাত ধরলো।

এ কী, তুমি এ কী করছো অরিন্দম! পৃথিবী তো এখনও আলো-শূন্য হয়ে যায়নি। এই উজ্জ্বল আলোর মাঝে তুমি আমাকে স্পর্শ করছো কেন ? কেন আমার নাম ধরে ডাকছো ? দোলন,

দোলন ! এক নাম বার বার উচ্চারণ করে কী সুখ তুমি পাও ? বলো না গো, কি সুখ পাও তুমি ?

আমরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

এখন যদি কণিকাদিদেব বিরাট গাড়িটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে চলতে থাকে, বেশ হয়। কণিকাদি কি সেদিনের মত আমার নাম ধরে ডাকবে আজ ? গাড়িতে উঠে আসার জন্যে আহ্বাণ জানাবে ? নাকি গভীর হতাশায় দুহাতের আড়ালে নিজের মুখ লুকোবে ?

একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। চমকে উঠলাম। না, কণিকাদির গাড়ি না। ট্যাক্সি। খুশী মনে গাড়িতে উঠে বসলাম। অরিন্দম এসে আমার পাশে বসলো।

আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

না। স্বপ্নেব জগৎ এমন মোহময় হয় না। জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে জগৎ হারিয়ে যায়। আমার জগৎ হারিয়ে গেল না।

হাত বাড়ালাম। কোমল স্পর্শ। কোমল শয্যা। আমি কোথায় এলাম, কী করে এলাম ? কে আমাকে এমন স্বপ্নময় জগতে নিয়ে এল ? সে কি অরিন্দম ?

কিছুক্ষণ আগেও আমরা দুজনে পাশাপাশি বসেছিলাম। অরিন্দমের বাহু অহরহ আমাব বাহু স্পর্শ করছিল। মাঝে মাঝে গাড়ি দাঁড়াচ্ছিল, আবার ছুটছিল। এক সময় অরিন্দম বলেছিল, 'এভাবে চলতে বেশ লাগে, না ?'

আমি নির্লজ্জেব মত ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম। অরিন্দম আর কথা বলেনি। শুধু আমার একটা হাত ওর হাতের মধ্যে নিয়ে গাঢ় স্বরে আমার নাম বারংবার উচ্চারণ করছিল। ও খুব আদর করে আমাকে ডাকছিল। ওর এই ডাকের মধ্যে কী ছিল জানি না, ক্ষণে ক্ষণে আমি চেতনা হারিয়ে ফেলছিলাম।

স্বপ্নময় জগতের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলাম।

এক সময় গাড়ি থেমেছিল। আমার হাত ধরে গাড়ি থেকে নামিয়েছিল অরিন্দম। বলেছিল, 'এসো।' বলতে চেয়েছিলাম, আমি এখন বাড়ি যাব। কিন্তু একটা অবাধ্য মেয়ে আমার মধ্য থেকে ক্রমাগত বিপরীত সুরে কথা বলছিল। সে বলছিল, যেখানে নিয়ে যেতে চাও, নিয়ে যাও।

ও আমাকে পাতালে নিয়ে গেল। বাধা দিলাম না। দিতে চাইলাম না।

ধীরে ধীরে আমার ঘোর কাটছে। মৃদু স্বরে ডাকলাম, 'অরিন্দম।'

অরিন্দম উত্তর দিল না। ঘরেব কোণে শব্দ করে দেশলাই জ্বলে উঠলো। দেখলাম, অরিন্দম একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। ও একটা সিগারেট ধরালো। মৃদু সৌরভ ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। দাদা এবং বাবা তুজনেই সিগারেট খান। কিন্তু এ ঘ্রাণের সঙ্গে সেই ঘ্রাণের কোন মিল নেই। এ সৌরভ অরিন্দমের নিজস্ব সৃষ্টি, যার তুলনা সংসারে নেই।

আবার ডাকলাম, 'অরিন্দম'।

অরিন্দম উঠে এসে আমার পাশে বসলো। একটা হাত আমার কপালে রেখে বললো, 'তুমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, তাই এখানে নিয়ে এলাম।'

চুপ কর অরিন্দম। এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে বলো না। আমি একটুও অসুস্থ হয়ে পড়িনি। বরং পৃথিবীতে আসার পর এমন সুস্থ কোনদিন বোধ করিনি।

'এখন কেমন লাগছে?' অরিন্দম আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো।

আমি নিঃশ্বাস রোধ করে পড়ে রইলাম। গভীর উৎকণ্ঠা

আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। অবিন্দমের মুখ আরও নীচে নেমে আসুক, ও একবার দোলন বলে ডাকুক।

কিন্তু অবিন্দমের মুখ আর নামলো না। ও একবারও দোলন বলে ডাকলো না।

ওর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস যদিও আমাকে স্পর্শ করছে, কিন্তু দগ্ধাচ্ছে না। আমি এখন দগ্ধ হতে চাইছিলাম।

'কতদিন ধরে তোমাকে খুঁজে বেরিয়েছি।' অবিন্দমটা কি সুন্দরভাবে মিথ্যে বলতে পারে। কী এমন আমি যে খুঁজলে পাওয়া যায় না। আমি তো তোমার কাছে কাছেই থাকি, তবু আমাকে খুঁজতে হয় কেন অবিন্দম।

কিন্তু এ কথা অবিন্দমকে মুখ ফুটে বলা যায় না। লজ্জা লাগে।

'কতদিন তোমার কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছি। তুমি মেয়েদের সঙ্গে ট্রামে উঠে বাড়ি চলে গেছ। সেই ফাঁকা জায়গার দিকে তাকিয়ে কতদিন দাঁড়িয়ে রয়েছি।' অবিন্দম এখন আর কথা বলছে না, ও খুব মৃদু স্বরে গান গেয়ে চলেছে যেন।

সেই যে ছোট্ট পাখিটা একদিন শীতের এক সকালে পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, নরম ঘাসের মধ্যে ওর পা ডুবিয়ে নেচেছিল আর গাইছিল এমন এক গান, যে গান দোলন ভেবেছিল আর কোনদিন বুঝি শুনতে পাবে না, কিন্তু আজ পেল, পেয়ে ধন্য হলো।

'তোমাদের বাড়ির সামনে কতদিন দাঁড়িয়ে রয়েছি। ভেবেছি, মুহূর্তের জন্যেও তুমি জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু তুমি এলে না।'

না, না, তোমার একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মত সাহস কোনদিন তোমার জীবনে আসবে না। তোমার হিসেবী মন কোনদিন ভুলতে পারবে না, সেই বাড়ির কাছাকাছি আর একটা বাড়ি আছে, ঐ বাড়ির সামনে বিরাট

পাগড়িঅলা একটা লোক বসে থাকে, ঘরে ঘরে দামী আসবাবপত্র, ভেতরে ঢোকার মুখে বড় একটা হল ঘর—অফিস ঘর, সেখানে ছুটির দিনেও কাজ করে একজন ভীরু-প্রকৃতির মানুষ, যে কিনা নিজের ন্যায্য দাবীটুকুও মুখ ফুটে জানাতে পারে না, সাহস পায় না ; তার পৌরুষ নিয়ে আর যাই কর, দম্ভ দেখাতে এসো না তুমি, অরিন্দম।

'আজ এতদিন পর তোমার দেখা পেলাম, এত কাছে পেলাম তোমাকে।' বলতে বলতে অরিন্দম আরও ঝুঁকে পড়লো। পাগলের মত আমাকে চুমু খেতে লাগলো।

গভীর আবেশে ওর গলা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে শুধু নিমেষের ভুলে। চকিতে সে ভুল ভেঙ্গে গেল। ছহাত দিয়ে অরিন্দমকে ঠেলে দিয়ে উঠে বসলাম। অরিন্দম ছিটকে দূরে সরে গেল। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। যদিও ঘরের আবছা অন্ধকারে ওর চোখ পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল না, আমি অনুভব করতে পারলাম, ছুটি বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে।

'আপনি কোনদিন আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াননি। সে সাহস আপনার নেই।' বলতে বলতে উত্তেজনায় আমার গলা কাঁপতে লাগলো।

'বিশ্বাস কর দোলন—'

'না না, আপনার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করি না।'

ভেবেছিলাম, অরিন্দম উত্তর দেবে। কিন্তু ও কোন উত্তর দিতে পারলো না। যেমন দাঁড়িয়েছিল, সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো।

'আপনার কোন উত্তর নেই। যদি থাকতো কিছুতেই চুপ করে থাকতেন না।'

'কি বলবো আমি জানি না। সত্যিই আমি জানি না, কি বলতে পারি।' বলতে বলতে গভীর হতাশায় অরিন্দম ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগলো।

অরিন্দমের এই বিক্ত রূপ কখনও দেখিনি। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা বুকটা খুব হালকা হয়ে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত একটা ভারী বোঝা আমার বুকে চেপে বসেছিল, সহসা সেই বোঝা সরে গেল। খুশী মনে হেসে ফেললাম। হাসতে পেরে খুব ভাল লাগলো।

হেসে হেসে বলতে লাগলাম, 'এতক্ষণ পর্যন্ত কাছে ছিলাম, নিমেষে কত দূরে সরে গেলাম।'

অরিন্দম এখনও কথা বলছে না। বলতে পারছে না। বলার মত কথা নেই ওর।

'কত দূরেব মানুষ হয়ে গেলেন অরিন্দমবাবু, তাই না।' উঠে দাঁড়ালাম। দ্রুত পায়ে অরিন্দমের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকালাম। সে চোখে কোন ভাষা নেই। ওর সদা-উজ্জ্বল চোখে বিষাদের ছায়া নেমেছে। ভেবেছিলাম, অরিন্দমের এই নির্বাক মূর্তি আমার প্রাণে খুশীর বন্যা বইয়ে দেবে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে যে সুখের পরশ পেয়েছিলাম, সহসা সেই সুখ হারিয়ে গেল। এক ধবণের বিচিত্র উত্তেজনা আমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে শুরু করেছে এখন।

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'ইচ্ছে করলে আবার আমরা কাছে আসতে পারি। খুব কাছে।'

আমার এই আহ্বাণে অরিন্দম সাড়া দিল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘরের অন্ধকার এখন চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। অরিন্দমকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ওকে একজন গ্রীক-ভাস্করের তৈরী মূর্তি বলে ভ্রম হয়েছিল, এখন মনে হতে লাগলো, ওর সর্ব শরীর মাটি দিয়ে গড়া—রং মাখানো একটা পুতুল ও, যে কিনা সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে পড়বে, একটু জল ছিটিয়ে দিলেই এত বাহারের রং সব চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। অরিন্দম হয়ে উঠবে হৃত-শ্রী এক মূর্তি। প্রাণহীন, উত্তাপবিহীন।

ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বললাম, 'কিন্তু সে ইচ্ছা আমার নেই।'

'কেন নেই দোলন?' স্পষ্টত অনুভব করতে পারছি, অরিন্দমের গলা কাঁপছে।

'যেহেতু আপনি একজন কাপুরুষ। কাপুরুষ না হলে কোন পুরুষমানুষ শাড়ির আঁচলের তলায় গা ঢাকা দেয় না।'

আশা করেছিলাম, অরিন্দম প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করে উঠবে। কিংবা দুহাতের শক্ত আঙ্গুল দিয়ে আমার গলা টিপে ধরবে। তাহলে আমি হয়তো নিজেকে কিছুটা সুখী বলে ভাবতে পারতাম। কিন্তু তুমি সে রকম কিছুই করলে না অরিন্দম। একজন বাধ্য ক্রীতদাসের মত দৃষ্টি নত করে দাঁড়িয়ে রইলে।

'অথচ ভেবেছিলাম, আপনি একজন সত্যিকারের পুরুষমানুষ।' বলতে বলতে আমার গলার কাছে কী একটা উঠে এল। আমি কথা হারিয়ে ফেললাম। গভীর হতাশায় আমার অন্তর ছেয়ে গেল। মনে হতে লাগলো, সুখ নামক বস্তুটি চিরদিনের জন্য আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল।

কী অভূতপূর্ব ব্যাপার! অরিন্দম যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলো। ও প্রখর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এখন। ওর এই দৃষ্টি আমার প্রাণে পুলকের সঞ্চার করছে। একজন সুপ্ত মানুষ জেগে উঠছে। কিছুক্ষণ আগে যাকে অসহায় বলে ভেবেছিলাম, তার মধ্যে পৌরুষ মাথা উঁচু করতে শুরু করেছে। এ যে কী অভূতপূর্ব দৃশ্য তা আমি কেমন করে বোঝাই, কাকে বোঝাই! ওকে বিদ্রূপ করে বললাম, 'কি দেখছেন অমন করে? ভেবেছিলেন, মাটির পুতুল আমি। তার মধ্যে প্রাণ এল কি করে, তাই না!'

অরিন্দম আমার কথার উত্তর দিল না। ওর দৃষ্টি আমার মধ্যে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন। অরিন্দমের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে নিতে বললাম, 'এ বাড়ি কার? এই ঘর, এই খাট, বিছানা? বালিশটা নোংরা, বিশ্রী একটা তেলের গন্ধ মাখানো।'

'আমার বন্ধু নিখিলের বাসা। কয়েক দিনের জন্য বাইরে গেছে। ও সেলস-এ কাজ করে।'

'চাবি বরাবর আপনার কাছে রেখে যায়?'

'হ্যাঁ।'

'কেন রেখে যায়? কাকে নিয়ে আসেন এখানে?' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর বিশ্রীভাবে কেঁপে উঠলো। নিজের ব্যবহারে নিজেই বিস্মিত বোধ করছি। কয়েক মুহূর্ত আগে কত স্বাভাবিক ছিলাম। নিমেষে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, বিষম উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। অথচ এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ার মত যথার্থ কোন কারণ আছে কিনা জানি না।

আমাকে আরও বিস্মিত করলো অরিন্দমের ব্যবহার। ও আশ্চর্য কৌশলে নিজেকে বলবান এক পুরুষে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। ও দৃঢ় পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমার খুব কাছে এগিয়ে এল। আমি ওকে বাধা দিতে চাইলাম। হাত দিয়ে দূরে ঠেলে দিতে চাইলাম ওকে। কিন্তু এই মুহূর্তে অরিন্দম আমার চেয়ে শত সহস্র গুণে বলবান হয়ে উঠেছে। ওকে দূরে সরানো গেল না। প্রচণ্ড শক্তিতে অরিন্দম আমাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলো।

চাপা কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলাম, 'আমাকে যেতে দিন।'

অরিন্দম আমাকে মুক্তি দিল না। কঠিন পেষণে আমাকে বিহ্বল করে তুললো।

আমার মুখের সঙ্গে নিজের মুখ লাগিয়ে এক সময় ও বলতে লাগলো, 'মাটির পুতুল যদি হয়ে থাক, ক্ষতি নেই। তোমার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবো আমি।' বলতে বলতে আমার বুকে মুখ চেপে ধরলো অরিন্দম।

'মিথ্যে মিথ্যে। আপনি কোনদিন আমার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চান না। সে ইচ্ছা আপনার নেই।' প্রাণপণ শক্তিতে

নিজেকে মুক্ত করতে চাইলাম। কিন্তু হা ঈশ্বর, অরিন্দমের বাহু বন্ধন একটুও শিথিল হলো না।

আমি ক্রমশ অবসন্ন বোধ করছি। দাঁড়িয়ে থাকা রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠছে।

অরিন্দম আমাকে এনে খাটে বসালো। নিজে এসে পাশে বসলো।

বলতে চাইলাম, আমি এখন বাড়ি যাব। মা ভাববে। কিন্তু কোন কথাই উচ্চারণ করতে পারলাম না।

অরিন্দম আবার আমাকে আকর্ষণ করছে। ওর বলিষ্ঠ বুকে আমাকে চেপে ধরেছে। ওর হৃদপিণ্ডের আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছি। সেখানে একটা নামই কি উচ্চারিত হচ্ছে অরিন্দম ? সত্যি করে বলো, কি নাম ? কার নাম ?

হঠাৎ আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

অরিন্দমের বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে গেল। আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললো 'চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দি-ই।'

বাড়ি, বাড়ি !

কে তোমাকে বলেছে, আমি এখন বাড়ি যেতে চাই ?

তুমি কি মনের কথা বোঝ না অরিন্দম ? শুধু কি মুখের কথা শুনে দিন কাটে তোমার ?

জয়তিকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো না। সত্যি বলতে কি আমি জয়তির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি সব কিছুই ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। নিজেকেও। সেই দিনের ঘটনার পর থেকে আমি যেন নিজের মধ্যেই নিজে হারিয়ে গেলাম। দিন কয়েক কলেজে গেলাম না। কী রকম অর্থহীন লাগছে সব কিছু। মনে হচ্ছে, এই যে সাতসকালে উঠে কলেজে যাওয়া, প্রফেসররা মুখস্ত বুলির মত কী সব আউড়ে যায়, মনোযোগের ভান করে সবাই তা শুনি, এসব

একান্ত মূল্যহীন। জীবনের সঙ্গে কোন যোগ নেই। জীবন অর্থে তো গোটা কয়েক বইয়ের বাঁধা-ধরা নীতিজ্ঞান না। জীবন অনেক বড়। আমি আছি বলেই তো এই জগৎ। অথচ সেই আমিটাকে কী অবহেলাই না করে এসেছি এতদিন। অরিন্দমকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার মধ্যে জীবন-বোধ এনে দিয়েছে সে। মাঝে মাঝে ওকে ঘৃণা করতে চাই। ঘৃণা যত তীব্র হতে থাকে, বিচিত্র একটা সুর আমার অন্তরে বেজে ওঠে। মন-মাতানো সেই সুর আমাকে বিহ্বল করে তোলে। মনে হয় ছুটে চলে যাই অরিন্দমের কাছে। তারপর সোজা সরল রাস্তা ধরে দুজনে ছুটে চলি। সোজা সরল রাস্তা, দুপাশে বিরাট গাছের সারি, ঘন ছায়ার নীচে আমি আর অরিন্দম। শুধু আমরা দুজন, আর কেউ না।

নিজেকে নিয়ে যখন এমন একটা উদ্ভট খেলায় মেতে উঠেছিলাম, সেই সময় অতর্কিতে জয়ন্তি এসে হাজির হলো একদিন। ওকে দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট্ট অপরাধ-বোধ। দাদা জয়ন্তিকে নিয়ে আসতে বলেছিল, কিন্তু ওকে বাড়িতে আনা হয়ে ওঠেনি। ইচ্ছে করে যে আনি নি, তা না। আমি ওর কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

জয়ন্তি খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করলো, 'কীরে, সবকিছু ভুলে গিয়ে শুধু নিজের খেলায় মেতে আছিস?'

উত্তর দিতে গিয়ে বিব্রত বোধ করলাম। 'আমার আবার কি খেলা? কোন খেলা নেই।'

জয়ন্তি হেসে উঠলো। ও যেন ইচ্ছে করেই জোরে হাসলো। 'খেলা কিছু না কিছু সবার জীবনেই থাকে।'

কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললাম, 'এত সকাল সকাল এলি? কলেজের কেউ মারা গেছে? বা কোন নেতা টেতা?'

জয়ন্তি একটা আঙ্গুল নিজের বুকে ঠেকিয়ে বললো, 'আমি।'

আমি চমকে উঠলাম, 'তুই? তুই মরতে যাবি কেন জয়ন্তি?'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে এসে ঢুকলো দাদা। ও অফিসের সাজপোশাক পরে এসেছে। জয়তিকে দেখে দাদা একগাল হেসে বললো, 'এসেছো! গুড! দোলনটা কিছুতেই তোমাকে নিয়ে এল না।' দাদা বিজয়ীর দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখতে লাগলো।

জয়তি দাদার দিকে কটাক্ষ হেনে বললো, 'আমি কিন্তু দোলনের সঙ্গে গল্প করতেই এলাম। ও কলেজে যায় নি কেন দেখতে এলাম।'

দাদা একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললো, 'ঠিকানাটা আগেই জানা ছিল বোধ হয়।'

জয়তি একটুও অপ্রস্তুত হলো না, স্বাভাবিকভাবে বললো, 'সেটা তো আপনার কাছ থেকেই পেলাম।'

আমি যেন এতক্ষণ কোন সিনেমার দৃশ্য দেখে যাচ্ছিলাম। দাদার কথায় চমক ভাঙ্গলো, 'কীরে, তুই অমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছিস কেন? দ্যাখ জয়তি, ওকে ঠিক গরুর মত দেখাচ্ছে না!'

কী চরম বিস্ময়। দাদা জয়তির নাম ধরে ডাকছে, ওকে তুমি বলে সম্বোধন করছে। কত স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে ওরা। আমি হঠাৎ হেসে উঠলাম। ওরা দুজনেই আমার দিকে তাকালো। আমি হাসতে হাসতে বলতে লাগলাম, 'দাদা আজ খুব সেজেছে। এমনিতে ও সাজে না। চুলটাও ভাল করে আঁচড়ায় না।'

জয়তি মুখ বেঁকিয়ে বললো, 'আজ আমি আসবো যে।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো দাদা, 'অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি চলি।'

দাদাকে হাতের ইসারায় বসতে বলে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। যেতে যেতে বললাম, 'জয়তি আজ প্রথম আমাদের বাড়িতে এল, চা করে নিয়ে আসি। তুমি যেন ওকে একলা ফেলে রেখে চলে যেও না দাদা।' ওদের সুযোগ দিতে পেরে খুব ভাল লাগলো। মনে হলো, আমি মস্ত বড় উদারচেতা মানুষ। দারুণ এক মহৎ কাজ করে ফেলেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি বেশ আরাম বোধ করছি

এখন। একঘেয়ে একটা চিন্তা—অরিন্দমের চিন্তা আমাকে বেশ দুর্বল করে ফেলছিল। সেই দুর্বলতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি বেচে গেলাম। মনে হলো, জয়তি যে শুধুমাত্র আমার কলেজ জীবনের বান্ধবী তা ই না। ও একজন খুব কাছের মানুষ, যাকে অন্তর দিয়ে স্পর্শ করা যায়। এই মুহূর্তে আমি ওদের মঙ্গল কামনা করলাম।

ইচ্ছে করেই অনেকটা সময় নষ্ট করলাম চা করতে। মা জিজ্ঞেস করলো, 'দীপুর গলার আওয়াজ পাচ্ছি না? ও আপিসে যায়নি এখনও?'

'আমার এক বান্ধবী এসেছে, দাদাকে তার সঙ্গে বসিয়ে রেখে এলাম।'

মার চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ, 'আপিস কামাই করে দীপু তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করবে? ওর কাজের ক্ষতি হবে না?'

'দাদা তো অনেকদিনই অফিস ফাঁকি দেয় মা।'

মা যেন আমার কথা শুনতেই পেল না, আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগলো, 'দীপুর না হয় জ্ঞান বুদ্ধি নেই, ও পুরুষ মানুষ, ওরা সব সময় নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে পারে না, কিন্তু তুই?'

মার হাবভাব দেখে হেসে ফেললাম, 'তিল দেখে তালের কথা কল্পনা করছো কেন মা? মেয়েদের সাথে দু একটা কথা বললে দাদা তো আর খারাপ হয়ে যাচ্ছে না।'

মা অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলো, 'খারাপ ভালর প্রশ্ন না। দীপুর সাংসারিক জ্ঞান খুব কম। মেয়েটাকে যদি কোন কারণে ভাল লেগে যায়, এক্ষুণি বিয়ে করতে চাইবে।'

'তাতে ক্ষতি কি। দাদার তো বিয়ের বয়স হলো।'

'ছেলেদের বিয়ে বয়স দেখে হয় না, হয় সুযোগ সুবিধা বুঝে।'

'দাদা তো ভাল চাকরিই করে।'

'কিন্তু তোদের বাবার আয় দিনকে দিন কমছে। শরীরও ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে। হঠাৎ যদি কিছু একটা হয়—'

'মা!'

'মেয়েদের সবদিকে নজর দিয়ে চলতে হয়। পুরুষ চলে হাতির মত, শুধু সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে। আর মেয়েরা ' মা বড় একটা দম নিয়ে কথাটা শেষ করলো, 'শেয়ালের মত। সতর্ক চোখে এদিকে ওদিক দেখতে দেখতে।'

'আমরা মোটেই শেয়ালদের মত না।' লঘু কণ্ঠে বললাম।

'কী জানি, দীপুকে নিয়ে আমার সব সময় ভয় হয়। ওর মধ্যে মায়া মমতা খুব কম। যে নিজেকেই ভালবাসতে জানে না, সে অপরকে ভালবাসবে কী করে।'

'দাদা নিজেকে খুব ভালবাসে। শরীরের কত যত্ন করে। ভাল মন্দ খায়।'

'সেদিন ভাল খাবার ফেলে ও উঠে গিয়েছিল।'

মনে পড়লো, গত রবিবার বাড়িতে মাছের মাথা দিয়ে বাঁধা-কপির তরকারি হয়েছিল, কিন্তু দাদা সেই খাবার ফেলে খুব অনায়াসে উঠে চলে গিয়েছিল। মার সঙ্গে সামান্য একটু তর্কাতর্কি হয়েছিল। এমন কিছু না। এর চেয়ে অনেক গুরুতর ব্যাপার দাদা খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছে বহুদিন। আসল কথাটা হলো, মুড। মুড যদি ঠিক না থাকে—

মা বলছে, 'দীপু সাধারণ আর দশটা মানুষের মতন না। ওর সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। ও যখন কথা বলে চেঁচিয়ে বলে, হাসিটা সময় সময় হয়ে দাঁড়ায় বিকট। সামান্য একটু জ্বরে বুড়োধারি ছেলে বাচ্চাদের মত কাঁদতে বসে।'

চা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। চা নিয়ে যাচ্ছিলাম। মা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, 'সংসারে তোর বুদ্ধিই সব চেয়ে বেশী। মেয়ে হয়েও তুই আমার ছেলের মত। তোকে আমি খুব বিশ্বাস করি।'

অসাবধানতায় খানিকটা চা চলকে পড়ে গেল। সামলে নিয়ে বললাম, 'আমি তো বিশ্বাস নষ্ট করার মত কোন কাজ করিনি মা।'

মা স্নেহের হাসি হেসে বললো, 'না, করিসনি। করবি বলে ভাবিও না। সেদিক থেকে বলছি না। বলছি সংসারের কথা ভেবে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, সংসার ক্রমশই অচল হয়ে আসছে। তোদের বাবার শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, আয় কমে যাচ্ছে, এই অবস্থায় দীপু যদি বিয়ে করে, ওর যদি আলাদা সংসার হয়, ভাবতে পারিস কী অবস্থা হবে আমাদের। না খেয়ে মরবো না সবাই?'

'তা বলে দাদা বিয়ে করবে না? ওর সাধ আহ্লাদ নেই?'

মা একটুক্ষণ চুপ থেকে বিড় বিড় করতে লাগলো, 'গরীবের বিয়েতে আর যাই থাক সাধ আহ্লাদ থাকে না। মেয়েদের বিয়ে করতে হয়, একটা অবলম্বন চাই বলে। কিন্তু ছেলেদের বেলায় সেকথা ওঠে না। তোদের বাবার কথা ভাব তো। মাথার ওপর যদি এতবড় একটা সংসার না থাকতো, যদি বিয়ে না হতো তার, তা হলে কি অনেকটা মুক্ত থাকতে পারতো না? নিশ্চয়ই পারতো।'

কথা বলতে বলতে মা উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। মার উত্তেজনা কমাবার জন্য হেসে বললাম, 'চা-টা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তুমি কিছু ভেবো না মা, আমার দৃষ্টি খুব সজাগ। সেই দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা দাদার নেই। তাছাড়া জয়তির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।'

কেন যে হুট করে মিথ্যে কথাটা বলে ফেললাম। ফল হলো বিপরীত। মা দাদাকে ছেড়ে জয়তিকে নিয়ে পড়লো, 'কার সঙ্গে বিয়ে হবে রে? পাত্রটি কী করে, দেখতে কেমন, পাশটাশ?'

সর্বনাশ! কথায় কথায় চোরা বালিতে পা দিয়ে ফেলেছি। মা নির্ঘাৎ আমার জন্যে হা-হুতাশ জুড়ে দেবে এখনই। সমবয়সী মেয়ের ভাল বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আর আমার মত সুন্দরী মেয়ের ভাগ্যে যে এখন পর্যন্ত একটি সুপাত্র জুটছে না, সে শুধু মাত্র মার কপাল দোষেই। এমনিতে মা একজন দুঃখী মানুষ। অন্তত আমার সেরকমই ধারণা।

যে মানুষ অপরের সুখে দুঃখ বোধ করে, ব্যথা পায়, সে দুঃখী না তো দুঃখী কে!

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'ছেলেটা একদম বাজে। বেঁটে, কালো। ম্যাট্রিক ফেল। বেকার। শুনেছি, বাবার অবস্থা নাকি মোটামুটি ভালই। কালীঘাটের দিকে একটা বাড়িও নাকি আছে। বহু সরিক অবশ্য।'

মা যদিও মুখ কোঁচকালো, আমি স্পষ্টত মার চোখে আলোর আভাষ পেলাম।

মা সরে দাঁড়ালো। চা নিয়ে দ্রুতপায়ে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

দাদা আর জয়তি চুপচাপ বসে আছে। আমাকে দেখে দাদা ছোট্ট একটা ধমক লাগালো, 'এত দেরী করলি চা আনতে? আসামে গিয়েছিলি?'

গম্ভীর মুখে বললাম, 'না, দার্জিলিং। দার্জিলিং টি ইজ দ্য বেষ্ট টি'।

দাদা হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লো। জয়তি চমকে দাদার মুখের দিকে তাকালো। হাসতে হাসতে দাদা বললো, 'দেখেছো জয়তি, দোলনটার কী বুদ্ধি, প্রশ্নের সারমর্মটা ঠিক ধরে ফেলেছে।'

মার কথা মনে পড়ে গেল। শুধু যে কথাটাই মনে পড়লো, তা না। মার কথার মধ্যে যে খানিকটা যুক্তি আছে, সেটুকুও যেন আমাকে স্পর্শ করে গেল। সত্যিই তো, দাদা যদি হুট করে বিয়ে করে বসে এখন, কী গতি হবে আমাদের? বাবার স্বাস্থ্য যেভাবে ভেঙ্গে পড়ছে, আজ হোক কাল হোক, বাবাকে অবসর নিতেই হবে। তখন?

'আর বুদ্ধির তারিফ করতে হবে না, অফিস যাও তো এখন। ক'টা বাজলো খেয়াল আছে?' আমার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ কর্কশতার আভাষ।

কব্জির দিকে তাকিয়েই দাদা লাফিয়ে উঠে পড়লো। তারপর

হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জয়তি বললো, 'বেচারীকে চাটাও খেতে দিলি না।'

'চা খেয়ে আর কাজ নেই। এত দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ। মনে করিয়ে না দিলে সমস্ত দিন বসে আড্ডাই মারতো। আবার অফিসে গিয়ে যখন কাজের মধ্যে ডুবে যায়, তখন বাড়ির কথা একদম মনে থাকে না।'

'অদ্ভুত মানুষ তো।'

'অদ্ভুত বলে অদ্ভুত। এদের নিয়ে ঘর করা চলে না।'

জয়তি কথা বললো না। মৃদু হেসে চুপ করে রইলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়তি উঠে পড়লো। দাদা চলে যাবার পরই ওর উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তারপর যে কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা চালিয়ে গেল, সে অনেকটা জোর করে চালানোর মত।

জয়তি চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই অরিন্দম এসে আমার মনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। যার কথা ভাবতে চাই না, সে যে কেন চুপি চুপি এসে দরজায় কড়া নাড়তে থাকে বুঝি না। দরজা খুলবো না ভাবি, কিন্তু ভাবতে ভাবতেই খুলে দিই। খুলে দিলে অস্থিরতা বাড়ে, না খুলেও তো স্বস্তি পাই না।

অরিন্দম খুব মৃদুস্বরে, অনেকটা ঘুমপাড়ানি গানের সুরে আমার কানে কানে বলতে শুরু করেছে, দোল দোল দুলুনি, রাঙা মাথায় চিরুনি, বর আসিবে এখুনি—। খাটের এক কোণায় বসেছিলাম। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লাম।

এখন শোয়ার সময় না। যে দিন কলেজে যাই এমন সময় বাড়ি ফিরি না। ছুটির দিনে এসময় রান্না ঘরে থাকি মার সঙ্গে। মাকে কাজে সাহায্য করি। আজ এই অসময়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে অশ্রুত এক সঙ্গীত হৃদয়ে অনুভব করতে লাগলাম।

আমি যখন অব্যক্ত সুখের যন্ত্রণায় অরিন্দমের গলা জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলাম ও তখন সবল দুটি বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

যখন বারংবার ওর নাম উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছিলাম, ও তখন আমার বুকে নিজের মুখ লুকিয়েছিল। শত চেষ্টা করেও আমি সেই মুখ তুলতে পারিনি।

কেন অরিন্দম? তুমি মুখ লুকোতে চেয়েছিলে কেন? তোমাব মধ্যে কি কোন অপরাধ-বোধ জেগেছিল?

নাকি, তোমার বিদগ্ধ জীবনে ক্ষণিক শান্তির আশায় তুমি আমাব মাঝে আশ্রয় খুঁজে পেতে চেয়েছিলে? তাই কি আমাব প্রাণবিন্দুতে আত্মসমর্পণ করেছিলে?

সত্যি কবে বলো অবিন্দম, কি চেয়েছিলে তুমি?

নাকি কিছুই চাওনি। চেয়েছিলে শুধু আমার যৌবনপুষ্ট নধর এই দেহ? তোমার কামনাসিক্ত মন সেই মুহূর্তে শুধুমাত্র আমার সঙ্গসুখই কামনা করেছিল, অন্য কিছু না?

সত্যি করে বলো।

বলো না গো। বলো, বলো, বলো।

মার কথা যে এত তাড়াতাড়ি ফলতে শুরু করবে ভাবিনি।

বাবার শরীর ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। সঠিক কোন অসুখে যে তিনি ভুগছেন তা না। এক রকম আছে না, শরীরে কোন রোগ নেই, অথচ দিনকে দিন মানুষটি শুকিয়ে যাচ্ছেন। মনের দিক থেকে একজন মৃতপ্রায় মানুষ বাবা।

কিন্তু কিছুদিন আগেকার একটা ছবি, একটা না, বহু খণ্ড খণ্ড দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে—কোর্ট থেকে ফিরে বাবা আমাকে এবং দাদাকে ডাকছেন, আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বাবা আদর করে আমাকে কোলে তুলে নিলেন, দাদা হাততালি দিতে দিতে বেদম চেঁচাতে শুরু করেছে, ছুয়ো বুড়োধাড়ি মেয়ে কোলে চড়েছে, মা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, হয়তো রান্নাঘরে কোন খাবার-টাবার তৈরী করছিল, শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রাগের ভান করে আমাকে

ধমক লাগালো, এই অসময় ক্লান্ত মানুষটির কোলে চড়েছি বলে; আমি যখন তাড়াহুড়ো করে নামতে চাইলাম, বাবা আরও নিবিড় করে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর উষ্ণ বুকের স্পর্শে আমার ছোট্ট বুকটাকে গভীর সুখে ভরিয়ে তুললেন—এসব কি ভোলা যায়!

এখন সেই বাবা যখন কোর্ট থেকে ফেরেন মনে হয় ভগ্ন-স্বাস্থ্য এক বৃদ্ধ, বুক-ভরা ব্যর্থতা নিয়ে করুণা ভিক্ষা করছেন আমাদের কাছে। একটু স্নেহ, একটু যত্ন, একটু সঙ্গ-সুখ। কিন্তু হৃদয়হীন মানুষ আমরা। তাঁর ব্যর্থতাকে অনুভব করার চেষ্টা করি না।

দাদা বিরক্ত হয়। বলে, 'দেশ ভাগ হয়ে অনেকেরই ক্ষতি হয়েছে। মানুষের মত মানুষ যারা তারা ঠিক কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের পাওনা আদায় করে নিয়েছে। জমি জবর-দখল করে সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরী করে ফেলেছে। সেদিন অনিলের সঙ্গে দেখা হলো, জোর করে ধরে নিয়ে গেল। কী চমৎকার বাড়ি করেছে যাদবপুরের দিকে। মাসে মাসে ভাড়া গুণতে হয় না, খোলামেলা জায়গা। ওরা লড়ে যাচ্ছে। আর আমরা?' দাদা মুখ বিকৃত করে। আমি জানি, মা-ও দাদার মত মনে মনে মুখ বিকৃত করে যাচ্ছে।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকি। বাবা কিছু বলুন বা করুন। হয় দাদার কথার প্রতিবাদ করুন, না হয় অনিলদের দলে যোগ দিন।

বাবা কিছুই করেন না। কোন কথা বলেন না। তাঁর মাথা আরও ঝুঁকে পড়ে। বাবা এমন ভাব দেখান যেন দেশ ভাগের সমস্ত দায়-দায়িত্ব গ্লানি সবকিছুই তাঁর। আমার মনে সংশয় জাগে। ইচ্ছে করলে বাবা কি আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ সুখ আহরণ করতে পারতেন না। কিছুটা নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা। এক টুকরো ঘন ঘাসে ছাওয়া মাটি। বিস্তৃত একটা আকাশ। ধোঁয়াশূন্য নির্মল বাতাস, যা এনে দিতে পারতো ভবিষ্যৎ দিনের সুখকর ইঙ্গিত। হয়তো পারতেন।

দেশ ভাগ হওয়ার কিছু পরে আমরা চলে এসেছিলাম। তখন পর্যন্ত বহু মাঠ খালি পড়েছিল। একটু ইচ্ছা করলে বাবা হয়তো একটা জমি দখল করতে পারতেন, যেমন করেছে অন্যান্য বহু লোকেরা।

ছোট একটা বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান, পেছনে দু-একটা নারকেল সুপারির গাছ বা লাউ কুমড়োর মাচা—অন্তত পায়ের নীচে একটু ভেজা দুর্বার স্বাদ। কত আলো, কত স্বপ্ন, কত ভাললাগা মুহূর্ত। সব হারিয়ে গেল।

কিন্তু এই প্রবঞ্চনার মূলে কি শুধুমাত্র বাবাই? আর কেউ না? যারা বড় বড় কথা বললো, এত সব আশার বাণী শোনালো, শত সহস্র সাজানো সংসার তছনছ করে দিল, তারা এখন কোথায়? তারা কাছে আসে না কেন? আমাদের দুঃখ দুর্দাশা ঘোচাবার চেষ্টা করে না কেন?

আমার প্রশ্ন শুনে দাদা বিরক্ত হয়। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাতাসে হাত নেড়ে বলে, 'বাদ দে ওদের কথা। সব ব্যাটা স্বার্থের ধান্দায় ব্যস্ত। আমাদের কথা ভাবার সময় নেই তাদের। দোষই বা দেব কি। তুই আমি হলেও এরকমই করতাম। আফটার অল ওরাও তো রক্তমাংসের মানুষ। যদিও লোভ জিনিষটা ওদের একটু বেশী।' দাদা বড় একটা দম নিয়ে আবার বলে, 'কিন্তু এই মানুষটিকে ছাখ। কেমন মহাদেবের মত নির্বিকার চিত্তে বসে আছেন।'

দাদা যে বাবার কথা বলে বুঝতে পারি। বলতে ইচ্ছে হয়, তুমিও তো একটু চেষ্টা করে দেখতে পার। কিন্তু বলি না। কী হবে বলে। শুধু শুধু চেঁচাবে দাদা। ও এমন একজন মানুষ, যারা জীবনভর অপরকেই দেখে, কখনও নিজেদের দিকে তাকায় না। বিশেষ করে নিজের দোষ সম্বন্ধে এরা থাকে উদাসীন। এদিক দিয়ে কণিকাদির স্বামী অমরেশবাবুকে আমার অনেক বেশী সার্থক মানুষ বলে মনে হয়। কণিকাদির মুখেই শোনা, বিয়ের সময় নাকি অমরেশবাবুর

অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। চেষ্টা এবং পরিশ্রমে উনি নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছেন। অবশ্য সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের ভাগ্য বলে যে বস্তুটি রয়েছেন, তিনি থাকেন সবার ওপরে, কখন যে কার ওপর সদয় হবেন তা তিনিই জানেন।

দোষী আমাব দুজনকেই মনে হয়। বাবা এবং দাদাকে। সময় সময় অপরাধের ছোট একটা বোঝা নিজের মধ্যেও অনুভব কবি। আমার করণীয় কি কিছু নেই? কত মেয়েবা চাকরি করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কে আমাকে চাকরি দেবে। গ্র্যাজুয়েট না হলে কেরাণীগিরি বা স্কুলমাষ্টারীও ভাগ্যে জোটে না।

কিছুদিন হয়তো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো কবতে থাকি। অরিন্দমকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিই। চোখ রাঙিয়ে ওকে বলতে চাই, এখন দুষ্টুমি করো না অবিন্দম, আমাব আনাচে কানাচে ঘুর-ঘুব করো না। আগে বি. এ. পাশ করি, তারপর—

বাবাকে যতটা বুড়ো দেখায় আসলে বাবার বয়স তত না। ষাট বছরে আজকাল মানুষ অথর্ব হয় না। বাবা অথর্ব হয়ে পড়ছেন। আসলে বাবাব মনটা পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে দেহ। মনের দিক থেকে বাবা যদি আর একটু সবল হতেন, নিজের সঙ্গে যদি একটু লড়াই করতেন, বাঁচাব মত বাঁচতে চাইতেন, অন্তত সেরকম একটু চেষ্টা থাকতো তাঁর, তাহলে আমাব বিশ্বাস, বাবার শরীব এমন ভেঙ্গে পড়তো না।

ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। এর মধ্যে অরিন্দমের সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি। দেখা হয়নি ঠিক না, ইচ্ছে করেই দেখা করিনি। ট্রামে যেতে যেতে ওকে দেখেছি। রাস্তার অপর পাশে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কোন বাস বা ট্রামের অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি তো জানি, এটা ওর ছল। ও দাঁড়িয়ে আছে দোলনের জন্যে। কিন্তু দোলন ধরা দেবে না। সে এখন পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো, সেদিনই ঘটনাটা ঘটলে। ভয়ঙ্কর ঘটনা! সন্ধ্যের দিকে কয়েকজন লোক একটা গাড়ি থেকে বাবাকে ধরে নামালো। বাবা নাকি ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ভাগ্য ভাল সেকেণ্ড-ক্লাসে ছিলেন বাবা। না হলে নির্ঘাৎ ট্রামের চাকায় কাটা পড়তেন। আমাদের দেখে বাবা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। একজন পূর্ণ-বয়স্ক লোককে এভাবে কাঁদতে দেখিনি কোনদিন। বাবার কান্না দেখতে দেখতে একটা কথাই আমার মনে হতে লাগলো, বাবার এই দুর্দশার জন্যে আমরা সবাই দায়ী। বিশেষ করে দায়ী মা। কয়েকদিন ধরে বাবার শরীর ভাল যাচ্ছিল না। লো-ব্লাড প্রেসার। সর্বক্ষণ মাথা ঘোরে। সেই অবস্থায় মা কী করে বাবাকে কোর্টে যেতে দিল। বাবা জীবনে কোনদিন মার কথার অবাধ্য হননি। আজও হতেন না। মা যদিও মুখে বলেছিল, এই শরীর নিয়ে না বেরোনই ভাল, কিন্তু সে কথার মধ্যে কোন প্রাণের উত্তাপ ছিল না। যা ছিল, তা নিছক গোটা কয়েক শব্দের সমষ্টি। বাবা হয়তো সেটা উপলব্ধি কবতে পেরেছিলেন। তাই জোর করে শরীরটাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দাদা আজকাল রাত করে বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে বাবাব অবস্থা দেখে দাদা ভাল মন্দ কিছুই বললো না। কিছুক্ষণ একটা চেয়ারে বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল। বাবাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। উনি খুব শান্তভাবে ঘুমোচ্ছিলেন। দাদার পিছন পিছন আমিও বেবিয়ে গেলাম।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাদা যখন যত্ন নিয়ে নিজেকে দেখছিল আমি ঘরে ঢুকলাম। দাদা আমার উপস্থিতি আগেই টের পেয়েছিল কিন্তু একটা কথাও বললো না। নিবিষ্ট চিত্তে নিজেকেই দেখতে লাগলো। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাদা আমার দিকে পিছন ফিরে আছে। আমি জানি আয়নায় আমার ছায়া পড়েছে। দাদা সেই ছায়াকে এই মুহূর্তে অস্বীকার করতে চায়।

কিন্তু আমি তা হতে দেব না। কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু কী বলবো, কোথা দিয়ে শুরু করবো।

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'জয়তির খবর কি?'

দাদা মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'কোন জয়তি?'

'ক'টা জয়তি আছে তোমার?' সামান্য কথাটা বলতে গিয়েই আমার গলার স্বর কেঁপে উঠলো। বুঝলাম, আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।

দাদা খুব শান্ত গলায় বললো, 'জয়তি নামে কোন মেয়ের সঙ্গে আপাতত আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

অনেকগুলো দোষের মধ্যে দাদার একটা মস্ত গুণ আছে। ও সচরাচর মিথ্যে কথা বলে না। অবিশ্যি এর একটা কারণও আছে। মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নেয় তখনই, যখন প্রাণে ভয় থাকে। এ সংসারে দাদা কাউকে ভয় করে না। সুতরাং মিথ্যার আশ্রয় তাকে নিতে হবে কেন।

'তুমি তাহলে এত দেরী করে বাড়ি ফেরো কেন?'

দাদা এবার আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো। কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'তোরা কি মনে করিস্, প্রেম করি বলেই দেরী করে ফিরি?'

দাদার কথার উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাদা আরও কাছে এগিয়ে এল। কী একটা বলতে গিয়েও বললো না। ধীরে ধীরে সার্ট খুলতে লাগলো।

দাদা সার্ট খুলে ফেলেছে। গেঞ্জিটাও। দাদা অনেক রোগা হয়ে গেছে।

বললাম, 'সময় মত খাওয়া দাওয়া করতে হয়। হাত মুখ ধুয়ে এসো, তোমার জন্যে চা জলখাবার নিয়ে আসি।'

দাদা বললো, 'থাক। এখন আর কিছু খাবো না।' একটুক্ষণ চুপ থেকে ও আবার বললো, 'সময়মত বাড়ি ফিরতে যে ইচ্ছে হয়

না, তা না। ইচ্ছে হয় বাড়ি ফিরি, তোদের নিয়ে বেড়াতে যাই, সিনেমা থিয়েটার দেখাই। মা কতদিন ঘরের বাইরে বেরোয় না। আগে মা ফর্সা ছিল না, আজকাল মাকে ফর্সা দেখায়। তোর মনে আছে দোলন, বরিশালের বাড়ির পিছন দিককার মাঠে একটা হাঁড়ি উপুড় করে রেখেছিলাম, তোকে একটা জিনিষ দেখাবো বলে। অনেকদিন বাদে যখন হাঁড়িটা তুলে ধরেছিলাম, সেখানকার ঘাসগুলো সব হলুদ মতন হয়ে গিয়েছিল। তুই খুব অবাক হয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলি, সবুজ ঘাস হলুদ হলো কেমন করে? মনে আছে তোর? সূর্যের আলো এ বাড়িতে ঢোকে না। মা ক্রমশ হলুদ হয়ে যাচ্ছে দোলন।'

দাদা যেন ডুকরে কেঁদে উঠলো।

দাদার এমন রিক্ত রূপ কোনদিন দেখিনি। দেখবো বলে কল্পনা করিনি। দাদার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিতে নিতে বললাম, 'কোন একটা উপায় বার করতেই হবে। এভাবে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারি না।'

দাদা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়তে লাগলো, 'কোন উপায় নেই। একদল মানুষ ধ্বংস হবেই। একদল ধ্বংস না হলে আর একদল বাঁচতে পারে না। কিছুতেই না।'

দাদাকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হতে লাগলো। মনে হলো, আজ সকালে যে মানুষটা সাজগোজ করে অফিসে বেরিয়ে গিয়েছিল, অন্য কেউ তার মূর্তি ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একে আমি চিনি না। দেখিনি কোনদিন।

বললাম, 'বাবার যে অবস্থা, অনেকদিন শুয়ে থাকতে হবে। তার ওপর ওষুধ পথ্য। কোথা দিয়ে যে কী হবে।'

দাদা কথা বললো না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

দাদার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে কোমল কণ্ঠে বললাম, 'তুমি চিন্তা করো না দাদা, উপায় কিছু একটা হবেই।'

দাদা উত্তর দিল না। যেমন দাঁড়িয়েছিল দাঁড়িয়েই রইলো।

পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমার এমন অখণ্ড অবসর। কণিকাদি সেই যে গেছে আর আসেনি। অনেকদিন মনে হয়েছে কণিকাদিদের বাড়ি যাই। কিন্তু যেতে গিয়েও যেতে পারিনি। একটা বাধা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছে করল যে বাধাটা অতিক্রম করতে না পারতাম, তা না। কিন্তু ইচ্ছেটাই মরে গেছে। প্রচণ্ড এক আলস্য আমার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কোথাও যেতে ভাল লাগে না। এমন কি ছাদে উঠে যে আকাশ দেখবো, তাও না। আকাশের রং এখন গাঢ় নীল। মেঘের বড় বড় স্তূপ স্থির হয়ে রয়েছে গোটা আকাশে। গাছের ডালে ডালে নতুন পাতা গজাতে শুরু করেছে। সেদিন কোকিলের ডাক কানে এল। আমি বুঝতে পারি এই কোকিল বসন্তের কোকিল। এই আকাশ বসন্তের আকাশ। সন্ধ্যের সময় ছাদে উঠলে মৃদু বাতাস আমাকে নিয়ে খেলা করবে। সব বুঝতে পারি, লোভও হয়। তবু ছাদে ওঠা আমার হয়ে ওঠে না।

মা মাঝে মাঝে বাইরে থেকে বেরিয়ে আসতে বলে। কিন্তু কোথায় যাব। এতবড় পৃথিবী, কিন্তু আমার মনে হয়, পৃথিবীটা কী অদ্ভুত রকমের ছোট হয়ে গেছে। অধিকাংশ সময়ই বাবার ঘরে বসে থাকি। খাটে শুয়ে আছেন বাবা। ক্রমশই তিনি বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। কিছু খেতে চান না। ওষুধের কথা শুনলে মুখ বিকৃত করেন। আগে বাবা কখনও মার অবাধ্যতা করতেন না। এখন মা কিছু বললেই বাবা মুখ ঘুরিয়ে নেন। ওষুধ পথ্য যা কিছু দেওয়ার আমাকেই দিতে হয়। দাদা সকালে সন্ধ্যায় নিয়ম করে এ ঘরে এসে বসে। চুপচাপ বসে থাকে, কোন কথা বলে না। দাদা চিরদিনই বাবার সঙ্গে কম কথা বলে। বাবার প্রতি দাদার একটা ক্ষোভ আছে। এই ক্ষোভের উৎপত্তি বরিশালে থাকার সময় থেকেই। বাবা যে কোর্ট থেকে এসে আমাকে কোলে তুলে নিতেন, দাদা নীচে

দাঁড়িয়ে থাকতো, গল্প বলার সময় বাবা প্রায় সর্বক্ষণ আমার দিকেই তাকিয়ে থাকতেন, সেই সময় থেকেই এই ক্ষোভের উৎপত্তি। অন্তত আমার সেরকমই মনে হয়। দাদা কোনদিনই বাবার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। চেষ্টাও করেনি। দাদার জগৎ ছিল মাকে নিয়ে। সেখানে দাদা ছিল একছত্র সম্রাট। সেই রাজত্বে আমার কিংবা বাবার প্রবেশের অধিকার ছিল না। তারপর আমরা কলকাতায় চলে এলাম। দাদা চাকরি পেল। চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে মা কিন্তু মনে প্রাণে একটুও খুশী হয়নি। যেদিন দাদা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এনে আমাদের দেখাচ্ছিল, মা বিষণ্ণ মুখে চুপি চুপি আমাকে বলেছিল, দীপুর দিকে তাকালে আমার চোখ ফেটে জল আসে। ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা নষ্ট হয়ে গেল। জানি না, মা কী করে দাদার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পেয়েছিল। গরীবের ঘরে ছেলেদের ভবিষ্যৎ কখনও উজ্জ্বল হয় না। বিশেষ করে দাদা মেধাবী ছাত্র ছিল না। কষ্টে স্বষ্টে পরীক্ষার বেড়াগুলো ডিঙিয়ে গেছে মাত্র। এসব ছেলেদের ভবিষ্যৎ কি করে উজ্জ্বল হয়।

আমি একা বাবার ঘরে বসেছিলাম। ঘরে যদিও অন্ধকার নেমে এসেছে, বাইরে কিছুটা আলো এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। আর কিছুক্ষণ পরে দাদা ফিরবে। মা রান্নাঘরে দাদার জন্যে জলখাবার তৈরী করছে। বাবা চুপচাপ শুয়ে আছেন। সব সময়ই এভাবে শুয়ে থাকেন তিনি। বলার কথা সব কি শেষ হয়ে গেছে বাবার? কিন্তু একদিন তো বলার মত কথা না থাকলেও কথা বলতেন তিনি। অবান্তর সব কথা। এক এক সময় মাকে ধমক লাগাতে হতো, 'আপন মনে কী সব বকে যাচ্ছো। কে তোমার কথা শুনছে?' বাবা কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত হতেন না। আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন, 'ও শুনছে। ও শোনে বলেই তো বলি।' সত্যি কথা বলতে কি, সব সময় যে বাবার কথা শুনতাম তা না। একজন লোক

অনর্গল কথা বলে চলেছেন, আপন মনে হাসছেন, চেঁচাচ্ছেন, আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে মজার মজাব মুখ-ভঙ্গি কবছেন, আমি যাতে খুশী হই, হাসতে থাকি—কথা না শুনলেও তাকিয়ে থাকতে হতো। এখন কত সময় মনে হয়, বাবা যদি আগের মত অনর্গল কথা বলতে থাকেন, অর্থহীনভাবে হেসে ওঠেন, ঈশ্বরেব নামে শপথ কবছি, আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁর প্রতিটি কথা শুনবো।

কিন্তু তিনি কথা বলেন না। চোখ বুজে নিসাড় হয়ে পড়ে থাকেন। আমাব মনে শঙ্কা ঘনিয়ে ওঠে। বাবা কি মৃত্যুব পদধ্বনি শুনতে পান? তার আশাতেই কি এমনভাবে প্রতিক্ষা কবে আছেন?

ঘব অন্ধকাব মতন ছিল। আমি একটা চেয়াবে বসেছিলাম। কাছে পিঠে কেউ কোথাও ছিল না। পৃথিবীটা অসম্ভব নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। নিজের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেব শব্দও বড় হয়ে কানে বাজছে। হঠাৎ বাবা কথা বলে উঠলেন, 'তোব মনে আছে দোলন, আমাব জ্বব হয়েছিল বলে তোকে একবার মার সঙ্গে শোয়ানো হয়েছিল। কিন্তু কী দুষ্টু ছিলি তুই। গভীব বাত্রে জেগে উঠে কান্না জুড়ে দিলি, আমার সঙ্গে শুবি বলে। তোর মা যত বলে রুগীব সঙ্গে এক বিছানায় শুতে নেই, তোর কান্না তত বেড়ে যায়। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তুই বলতে থাকিস, রুগীর সঙ্গে শোব না, বাবাব সঙ্গে শোব।' সামান্য এইটুকু কথা বলেই বাবা হাঁপিয়ে উঠলেন।

আমি গিয়ে বাবাব খাটে বসলাম। একটা হাত ধীরে ধীরে মাথায় বুলিয়ে দিতে লাগলাম। বাবা আমাব হাত চেপে ধবলেন। বাবার হাত কী অসম্ভব রকমের ঠাণ্ডা!

একটুক্ষণ পরে বাবা আবার বলতে লাগলেন, 'সাইক্লোনের সময় বড় জাম গাছটা ভেঙ্গে পড়ে গেল। তোর সে কী কান্না! কাঁদছিস আর বলছিস, লোক ডেকে গাছটাকে আবার সোজা করে পুঁতে দাও।

নতুন ফুলের চারা লাগালে রোজ এসে আমাকে প্রশ্ন করতিস, কবে ফুল ফুটবে বাবা। একটুও তর সইতো না তোর।

মাকে ফাঁকি দিয়ে শীতের দিনে খালি পায়ে বাগানে ঘুরতিস। আমি কিন্তু ঠিক টের পেতাম। কিন্তু কিছু বলতাম না। তোর মা তো জানে না, শিশিরের ঠাণ্ডায় অসুখ করে না।

যেবার তোর টাইফয়েড হয়, একনাগাড়ে একুশ দিন তুই আমার কোলে শুয়েছিলি। একটুও বিছানায় শুতে চাইতিস না।'

বাবার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'ওসব কথা থাক বাবা।'

বাবা খুব হাঁপাচ্ছেন। বাবার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, সব শুনবো।'

হঠাৎ বাবা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। কাঁপা কাঁপা হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আব্দারের সুরে বলে উঠলেন, 'একুশ দিন তোকে কোলে শুইয়ে রেখেছিলাম দোলন, তুই আমাকে একটু কোলে নে।'

বলতে বলতে বাবা এলিয়ে পড়লেন। দুই হাতে তাঁর শীর্ণ শরীর বুকে চেপে ধরে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলাম, 'মা, শিগগির এসো, বাবা কীরকম করছেন।'

বাবা মারা গেলেন।

পৃথিবী শূন্য হয়ে গেল। আমার বুকের ভেতর কোন দুঃখের অনুভূতি নেই। শুধু হৃদপিণ্ডটা শব্দ করে চলছে। একঘর লোকের মাঝে আমি কী প্রচণ্ড নিঃসঙ্গ বোধ করছি! কেউ কোন কথা বলছে না। এমন কি মা, যে কিনা সারাক্ষণ আপন মনে কথা বলে, সেই মাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিষ্পলক চোখে মা বাবার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গভীর উৎকণ্ঠায় আমি মার দিকে তাকিয়ে আছি। মা কিছু বলুক, না হয় শব্দ করে কেঁদে উঠুক। বাবার পায়ের দিকে বসে আছে দাদা। ও যেন গভীর মনযোগ দিয়ে একজোড়া শীর্ণ পায়ের মাঝে কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে। আমার হৃদপিণ্ড

ক্রমাগত বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমি কিছুক্ষণের জন্যে ওকে থামিয়ে দিতে চাই। কিন্তু সে শক্তি আমার নেই। একজন অসহায় দর্শকের মত আমি সমস্ত দৃশ্যটা দেখে চলেছি।

কণিকাদি ত্বরিত গতিতে আমার কাছে এগিয়ে এল। দু হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো। এতক্ষণ পরে এই প্রথম কান্না শুনলাম। শুনে ভাল লাগলো। 'একজন মানুষ এতদিন পৃথিবীতে রইলেন, সুখে দুঃখে জীবন কাটালেন, সবাইকে ভালবাসলেন, তাঁর চলে যাবার পর কেউ দু-বিন্দু চোখের জলও ফেলছে না, সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কী ভয়ানক রকমের করুণ বলে মনে হচ্ছিল! কণিকাদির কান্না শুনতে শুনতে আমার বুকের শূন্যতা কেটে যেতে লাগলো। একটা গুর গুর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। একঘেয়ে ধুক ধুক শব্দটা আব নেই। পরিবর্তে জেগে উঠছে মেঘ ডাকার শব্দ। গভীর উৎকণ্ঠায় আমি অপেক্ষা করে আছি। মেঘের গর্জন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। বৃষ্টি নামছে। আমার দুচোখ বেয়ে কান্না নামছে। এতক্ষণ যা পারিনি, কত সহজে সেই কাজটা করতে পারলাম। বাবার বুকে মুখ চেপে ধরে আমি কেমন কাঁদতে পারছি এখন। কত স্বস্তি পাচ্ছি।

কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলাম জানি না। কণিকাদি একসময় আমাকে টেনে তুললো। অন্য ঘরে নিয়ে গেল আমাকে। সেখানে মা বসেছিল। আমাকে দেখে মা শব্দ করে কেঁদে উঠলো। আমার মাথা নিজের বুকে চেপে ধরলো।

গভীর রাত্রে ওরা বাবাকে নিয়ে গেল। কণিকাদির স্বামী অমরেশবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করলেন। খাট এল, ফুল এল। এত লোকজন কোথা থেকে এল? এদের অনেককেই আমি চিনি না। কিন্তু ওরা সবাই কত আপনজনের মত ব্যবহার করছে।

অরিন্দম, এমন সময় তুমি কোথায়? সবার আগে যার আসা উচিত ছিল, সেই তুমি কি এখন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছো? একবারও কি তোমার মনে হচ্ছে না, এই মুহূর্তে তোমার ঘুমিয়ে থাকা চলে না। দোলন বলে একটি মেয়ে যে কিনা কোন একদিন তোমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, তার এমন বিপদের দিনে তোমার অন্তত একবার আসা উচিত ছিল, নীরব ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত ছিল।

কণিকাদি সমস্ত রাত এ বাড়িতে রয়ে গেল। সমস্তক্ষণ আমাকে জড়িয়ে ধরে রইলো। যদিও কণিকাদি মুখে কোন সান্ত্বনা-বাক্য উচ্চারণ করেনি, আমি অনুভব করছিলাম ও সর্বক্ষণ বলে চলেছে, ভয় নেই দোলন, আমি আছি।

দিন কাটছে, সংসার চলছে। সংসার যেমন চলছিল তেমন ভাবেই চলতে লাগলো। দাদা সকালে উঠে বাজারে যায়, মা রান্না করে, খেয়ে-দেয়ে দাদা অফিসে বেরোয়। আমার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমি সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছি। বি. এ. ক্লাশ-এ ভর্তি হয়েছি। নিয়মিত কলেজে যাচ্ছি, বাড়ি ফিরছি। আজকাল সন্ধ্যের দিকে ছাদে উঠি। মাকেও নিয়ে যাই। আমি পায়চারি করি, মা বসে থাকে। বাবার কথা মনে হয়। বাবা যে বলেছিলেন, তুই আমাকে একটু কোলে নে, সেই কথাটা কোন কোন অসতর্ক মুহূর্তে আমার কানে আসে। বিষম চমকে উঠি তখন। আমি যদি সেই মুহূর্তে চিৎকার না করে বাবাকে কোলে নিয়ে বসতাম, তিনি হয়তো শান্তি পেতেন। একজন মানুষ আজীবন সবার জন্যে করে গেলেন, অথচ সেই মানুষটির অন্তিম ইচ্ছাটুকু পূরণ করা হলো না। আমি যদি সেইক্ষণে আর একটু স্বাভাবিক হতে পারতাম!

অরিন্দমের সঙ্গে দেখা হয় না। ওকে একজন নিষ্ঠুর মানুষ বলে

কল্পনা করতে চাই আমি। নিষ্ঠুর না হলে ও একদিন না একদিন আসতোই। এসে অনায়াসে বলতে পারতো—কিছু না বললেও ওর উপস্থিতিই আমার মনে খানিকটা শান্তি এনে দিত। ওকে একজন নিষ্ঠুর মানুষরূপে কল্পনা করার যে বেদনা, তার হাত থেকে অন্তত নিষ্কৃতি পেতে পারতাম।

কণিকাদি আজকাল আর নিয়ম করে আসে না। যখন আসে, হাসি দিয়ে গল্প দিয়ে আমাদের মন মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কণিকাদি যতক্ষণ থাকে, বেশ লাগে। ও চলে গেলে মন ভারী হয়ে ওঠে। একটু ক্ষোভও জমা হতে থাকে যেন। অমরেশবাবুও মাঝে মধ্যে আসেন। প্রথম দিকে মা আড়াল থেকে কথা বলতো। ইদানীং অমরেশবাবুর সামনাসামনি কথা বলে। দাদাও বেশ প্রাণ খুলে গল্প করে তাঁর সঙ্গে।

দাদা একদিন বললো, 'মানুষ শুধু শুধু বড় হয় না। বড় হতে গেলে সব চেয়ে আগে যে জিনিষটার দরকার, সেটি হলো গিয়ে দরাজ মন।'

আমার কী রকম সন্দেহ হলো, 'অমরেশবাবুর মনের হদিস তুমি পেলে কি করে?'

দাদা কথা না বলে মুচকি হাসলো।

আবার বললাম, 'তুমি কি সেই মনের পরিচয় পেয়েছো?'

দাদা ঘাড় কাৎ করে হ্যাঁ জানালো। বিষম অবাক লাগলো। দাদা হঠাৎ অমরেশবাবুর মনের পরিচয় পেল কী করে! ও তো কোনদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মেশেনি। মেশা দূরের কথা, বাবা মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দাদার পরিচয়ই ঘটেনি।

দাদা যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। 'ছাখ দোলন, আ-জীবন একজনের সঙ্গে ঘর করেও মন বোঝা যায় না, আবার কারও সঙ্গে দুদণ্ড কথা বললেই মনের হদিস মেলে! যেমন ধর,

বাবা। বাবার মত মানুষের মন বুঝতে গেলে এক জন্ম তো বটেই পর জন্মও কেটে যায়। ভদ্রলোকের অনেক গুণ ছিল। যেমন, উনি খুব পড়াশুনা করতেন, বুদ্ধিও ছিল প্রখর। কিন্তু সবই কেমন বিফলে গেল। আসল কথাটা কি জানিস, লাইফ সম্বন্ধে তাঁর কোন সুনির্দিষ্ট মত ছিল না। এলোপাথারি ঘুরে মরেছেন শুধু।'

'তুমি এমন ভাবে কথা বলছো যেন বাবা তোমার অন্তরঙ্গ মানুষ ছিলেন না।'

'দেয়ার ইউ আর। আমি কোনদিনই ওঁর অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করিনি। করিনি কেন জানিস?'

'কেন?'

'তিনি গুরুজন, অশ্রদ্ধা নিয়ে বলছি না, বিলিভ মি, উনি ছিলেন আজকালকার দিনে একজন বাতিল মানুষ। আজকালকার দিন বলে না, সত্যযুগে জন্মালেও ভদ্রলোক সাক্‌সেসফুল-ম্যান বলতে যা বোঝায় কোনদিন তা হতে পারতেন না। অথচ প্রত্যেক মানুষেরই মটো হওয়া উচিত, কি করে জীবনে সফল হওয়া যায়। তুই যদি মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবিস, দেখবি বরিশালে আমাদের জন্য এমন কিছু স্বর্গসুখ ছড়ানো ছিল না। তোদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাই, আমাদের অমুক ছিল, তমুক ছিল, হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল। ঘোড়ার ডিম ছিল!' দাদা মুখ বিকৃত করলো। 'কিছুই ছিল না। ছিল শৈশবের অফুরন্ত সুখ আর উচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাসের বশে বস্তির ছেলেমেয়েরাও অকারণে হাসে, নোংরা ফুটপাতে লুটোপুটি খেয়ে ওরা আনন্দ পায়। বৃষ্টির সময় দেখিস না, কী তারস্বরে চিৎকার করে রাস্তায় ছুটোছুটি করে ওরা। ওদের বাড়ির পিছনে কিংবা সামনে বাগানের চিহ্ন মাত্র নেই, ওদের বাবারা অফিস থেকে ফিরে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে দেশবিদেশের গল্প বলতে বসে না কিংবা এটা ওটা নিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাবার প্রয়াস তাদের নেই। তবু ওদের ছেলেমেয়েরা খুশী মনে নাচে গান গায়, যেমন আমরা করতাম।'

দাদার কথা শুনতে শুনতে কেমন ঘোর লেগে গেল। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে বললাম, 'কিন্তু তখন সব কিছুই ভাল লাগতো। ওখানকার আকাশ, বাতাস, পাখির গান, ফুল, ফল, সব কিছু।'

দাদা বিজ্ঞের মত মুখ করে বললো, 'কারণ সব কিছু ভাললাগার মত মন ছিল তখন। সেই সময় কোন আশি বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে যদি তোর বিয়ে দেওয়া হতো সেই বিয়েটাও তোর দারুণ ভাল লাগতো। আসল কথা, তোর মন তখন সব কিছুই খুশী মনে গ্রহণ করার জন্যে তৈরী ছিল।'

'কিন্তু বাবাকে তুমি বাতিল-মানুষ বলতে পারো না।'

'সেন্টিমেণ্টের প্রশ্ন বাদ দিলে, তুইও আমার সঙ্গে একমত হবি, আমরা যে সময় কলকাতায় এলাম, তখনও বেশী লোক এসে এখানে ভিড় করেনি। জমি জবর দখলের কথা ছেড়ে দিলেও উনি চেষ্টা করে ওকালতিতে ভাল পসার জমাতে পারতেন। অনেক উকীলবাবুরা এখন গাড়ি চড়ছেন, বালিগঞ্জে বড় বাড়ি তৈরী করে ফেলেছেন। বাবার মত হা-হুতাশ করে দিন কাটান নি তাঁরা। আমি তাঁদের অনেক বেশী শ্রদ্ধা করি।'

দাদাকে আঘাত করার লোভ সামলাতে পারলাম না। 'সেই সব ঘরে জন্মালে তুমি অনেক টাকার মুখ দেখতে পেতে। বাবা যথেষ্ট টাকা রোজগার করতে পারেন নি, এটাই কি তাঁর একমাত্র অপরাধ।'

'উনি যদি চেষ্টা করতেন, বলার কিছু ছিল না। তুই জানিস না দোলন, আমি স্বচক্ষে দেখছি, কোর্ট ফাঁকি দিয়ে বাবা কতদিন গাছ তলায় বেঞ্চির ওপর বসে শুধু অতীতের জাবর কেটেছেন। তাঁর বিলাসিতায় একটা সংসার আজ ভেসে যেতে বসেছে।'

'বিলাসিতা? বাবা বিলাসী মানুষ ছিলেন?'

'দুঃখ-বিলাস এক ধরনের বিলাসিতা ছাড়া কি। এবং দারুণ মারাত্মক বিলাসিতা।'

দাদার কথার উত্তর দিতে গিয়েও দিতে পারলাম না। কোথায় যেন আমরা একে অপরকে স্পর্শ করতে শুরু করেছি। কথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললাম, 'তুমি কিন্তু আদি প্রশ্নটার উত্তর এখনও দাওনি। অমরেশবাবুর মনের হদিস তুমি পেলে কি করে?'

'যেহেতু না চাইতেই ভদ্রলোক এক গুচ্ছের টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। তুই কি ভাবিস, বাবার মৃত্যুর দিন থেকে শুরু করে অত জাঁকজমক করে যে শ্রাদ্ধ শান্তি হলো, সব কিছুই আমার টাকায় কিংবা বাবার জমানো টাকা থেকে? ফর ইওর ইনফরমেশন, আমার ব্যাঙ্কে কোন অ্যাকাউন্ট নেই, পোষ্টাল সেভিংস বইয়ে বাবার জমানো টাকার অঙ্কটা শুনবি? সাঁইত্রিশ টাকা। দুঃখে ঘেন্নায় সেই টাকা তোলার চেষ্টা পর্যন্ত করিনি আমি।'

'তুমি অমরেশবাবুর কাছে হাত পেতে টাকা নিয়েছো?'

'হাত আমি পাতিনি। আমার উপুর হাত উনি সযত্নে চিৎ করিয়ে টাকা ঢেলে দিয়েছেন। আপত্তি করেছিলাম, শোনেন নি। এই সব মানুষদের বুঝি। এরা দাম্ভিক হয়, দান করাটাও এক রকমের দম্ভ। ধনের দম্ভ সহ্য হয়, কিন্তু দারিদ্র্যের অহঙ্কার অসহ্য!'

'অমরেশবাবুর টাকাটা তুমি ফেরৎ দিও দাদা।'

'সদ-ইচ্ছাটা রইলো। কিন্তু ফেরৎ দেয়া হয়তো হয়ে উঠবে না। কারণটা মাথা না ঘামিয়েও তুই বুঝতে পারবি। বাবা প্রতি মাসে যা হোক কিছু সংসারে দিতেন। সেই টাকাটা বন্ধ হয়ে গেল, আমার মাইনে কিন্তু বাড়লো না।'

'আমি যদি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করি।'

'ভেরি গুড প্রোপোজাল। চেষ্টা করতে পারিস। তবে চাকরি পাওয়া অত সহজ না।'

'মা একথা জানে?'

'কি কথা?'

'এই যে অমরেশবাবুর কাছ থেকে তুমি টাকা নিয়েছো?'

'কোনদিন প্রশ্ন করেনি অবশ্য, কিন্তু আমি জানি, মা জানে। মার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। মা অমরেশবাবুর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। তোর কণিকাদিটি কিন্তু দারুণ খলিফা মহিলা। মুখে ইনিয়ে বিনিয়ে কত কী বলে, কাঁদাকাটিও করলো খুব, কিন্তু পয়সার বেলায় টাইট।'

'পয়সা দিলেই মানুষ ভাল হয়?'

'হ্যাঁ। বড়লোকদের সব কিছু আমার ভাল লাগে। বিশেষ করে সেই সব বড়লোকদের, যারা দরাজ হাতে টাকা ছাড়ে। এই সব বড়লোকদের গায়ের গন্ধটাও আলাদা। অমরেশবাবু যখন ঘরে ঢোকেন, লক্ষ্য করে দেখিস, বাতাসে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ ভুর ভুর করে।'

'হয়তো কোন সেন্টটেন্টের গন্ধ।'

'হয়তো। কিন্তু সেই সেণ্ট তুই কোনদিন বাজারে পাবি না। পেলেও তোর আমার গায়ে গন্ধটা তেমন খুলবে না রে।'

রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেললাম, 'তোমাকে টাকার নেশায় পেয়েছে।'

দাদা তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাৎ করে বললো, 'তা পেয়েছে। এমন নেশা কি আর কিছুতে আছে। মদ, গাঁজা, চরশ, আফিম, সিদ্ধি, ভাং, এ ছাড়া আরও যদি কোন নেশা থাকে, দেখবি, বড়জোর এক ঘণ্টা দুঘণ্টা বা তার চেয়ে কিছু বেশীক্ষণ নেশাটা টিকে থাকে। কিন্তু টাকার নেশা একবার ধরলে মরার আগে পর্যন্ত ছাড়ে না। আমাদের ব্যাঙ্কে একজন ক্লায়েন্ট আছে, লোকটা মাড়োয়ারী, শরীরে নানা ব্যাধি, ডাক্তার বলে হাওয়া বদলি করো, উত্তরে ও কি বলে জানিস। বলে আগে পুরনো শরীরটা বদল করি তারপর হাওয়া বদলের প্রশ্ন। এই হলো টাকার নেশা। এই নেশায় যে ডুবেছে, সেই বেঁচেছে।'

'বেঁচেছে বলো না, মরেছে।'

'মরার মধ্য দিয়েই বাঁচা বল। আমরা—তুই আমি এবং মা যদি

রাস্তায় ঝাণ্ডা নিয়ে চেঁচাতে থাকি, টাকার নেশা মুরদাবাদ, তা হলে সবার আগে কারা হাসবে জানিস ? গরীব লোকেরা।'

'সত্যি তুমি একজন জ্ঞানী লোক দাদা।'

'ঠাট্টা করছিস!'

'ঠাট্টা না, সত্যি সত্যি বলছি, তোমার কথায় সাব বস্তু যথেষ্ট রয়েছে। কিছুদিন আগে হলে তোমাব লেকচার শুনে মনে হতো বাচ্চা ছেলের প্রলাপ।'

'হঠাৎ তোর এই তৃতীয় নয়ন উন্মোচনের কারণ ?'

'এই তৃতীয় নয়নটা বড় সাংঘাতিক দাদা। পুট করে কখন যে কার নয়নটি খুলে যায়!'

'যা বলেছিস। আমার চোখ বরাবরই খোলা ছিল। কিন্তু পুরো খোলা ছিল না। পুরোটা খুললো বাবার মৃত্যুর দিন। বাবার পায়ের কাছে যখন বসেছিলাম, সবাই হয়তো ভাবছিল আমি নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি। আসলে আমি তখন অন্য কথা ভাবছিলাম। কী ভাবছিলাম শুনবি ? আমি ভাবছিলাম, আমি বুড়ো হবার আগে পটাসিয়াম সাইনাড খেয়ে মৃত্যু ববণ কববো। সেটা হবে অনেক বেশী রোমান্টিক এবং অনেক যন্ত্রণা এড়ানোর সরল এবং সহজ পন্থা। বাবার ডেড বডিটা কী অসম্ভব করুণার উদ্রেক করছিল! কে বলবে, এই মানুষটি এককালে সুন্দরের পর্যায়ে পড়তেন। তোর মনে আছে দোলন, বাবা যখন খালি গায়ে ঘুরে বেড়াতেন, ধুতিব কোঁচাটা পেটের পাশে গোঁজা, তখন জমিদার জমিদার দেখাতো না! আবার কোট প্যান্ট পরে যখন কোর্টে যেতেন তখন সাহেব সাহেব মতন। আর সেই মানুষের মৃতদেহ দেখে কঠিন হৃদয়ের মানুষও বলে উঠতো, আহা। বলা খুব স্বাভাবিক। আমার খুব খারাপ লাগে, কেউ আমাকে করুণা করুক। এক এক সময় মরে যেতে ইচ্ছা হয়। এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি। কিন্তু মরতে ইচ্ছে হলেও মরতে পারি না।

চাইও না। সবাই বলবে, আহা অমুক লোকটা মরে গেল। তোরাও করুণার পাত্রী হয়ে যাবি।'

দাদার একটা হাত ধরে বলে উঠলাম, 'কী সব হিজিবিজি কথা বলছো, চুপ করো।'

দাদা জেদী মানুষের মত এক নাগাড়ে বলে যেতে লাগলো, 'বাঁচতে যখন হবেই, তখন মানুষের মত বাঁচা দরকার। অন্তত সেই চেষ্টা করতে হবে। কথায় আছে না, বেগ বরো অর ষ্টিল। প্রথমটা বড্ড নোংরা। ভিক্ষে করবো? ছি! ভাবছি কলকাতার বাইরে চলে যাব।'

সঙ্গে সঙ্গে চাপা আর্তনাদ করে উঠলাম, 'আমরা একা একা থাকবো?'

দাদা হাসলো। 'দুজনে একা একা হয় না। একা থাকলেই বা ক্ষতি কি। কেউ তো আর টপ করে গিলে খাচ্ছে না তোকে?'

দাদাকে কী করে বলি, গিলে খাওয়া বলতে ও কী বোঝাতে চায়। মেয়েদের পক্ষে পুরুষ-ছাড়া হয়ে থাকা যে কী বিপজ্জনক, দাদা তা বুঝবে না। বুঝতে চাইবে না।

'ট্র্যান্সফার চাইবো কেন জানিস? মফস্বলে গেলে উন্নতির আশা খুব বেশী থাকে। কপালগুণে যদি এজেন্ট-ফেজেন্ট হয়ে যেতে পারি, উপরি পাওনা দু-দশ টাকা পকেটে আসবে। ওভার-ড্রাফট দেবো, লোন দেবো—'

'তোমাকে আর টাকা-টাকা করতে হবে না।'

দাদা মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, 'ঠিক আছে, আর কোনদিন টাকা-টাকা করবো না। কথাটা মুখ থেকে মুছে ফেললাম।' পরক্ষণেই হেসে ফেললো দাদা, 'কিন্তু যে কথাটা মনে গেঁথে গেছে; সেখান থেকে তাকে উপড়ে ফেলা যাবে না। ফেলতে গেলে অযথা মনটা ক্ষত-বিক্ষত হবে।'

'তোমার তো আরও নেশা ছিল দাদা। অসম্ভব সিগারেট খেতে আগে। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে একটা সিগারেটও তো ধরালে না। মেয়েদের পেছনেও ঘুরতে, সেই নেশাটাও কি গেছে?'

দাদা চোখের বিচিত্র ভঙ্গি করে বললো, 'আগে শাড়ির পাড় দেখে ভুলতাম রে, এখন শাড়ি দেখে সুতোর পরখ করি। একেই বলে ম্যাচুরিটি।'

'ম্যাচুরিটির বয়স তোমার এখনও হয়নি।'

'ম্যাচুরিটি বয়সের লেজ ধরে আসে না, আসে অভিজ্ঞতার তরণী বেয়ে।'

দাদাকে যত দেখছি, যত ওর কথা শুনছি, বিস্মিত বোধ করছি। কিছুদিনের ব্যবধানে কি দাদা কী হয়ে গেল!

'তুইও একদিন আমার মত করে চিন্তা করবি। যত তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে শুরু করবি, ততই মঙ্গল। বাবাকে চোখের সামনে উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারিস। আজকালকার দিনে এমন সৎ লোক দুর্লভ। সৎ কথাটা অবিশ্যি দারুণ রিলেটিভ। আমার মতে সৎ কথার ব্যবহার না করে অক্ষম কথার ব্যবহারটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতো। যাক গে। সৎ বলতে এখন কাদের বোঝায় জানিস। অমরেশবাবুদের। যুদ্ধের মধ্যে ভদ্রলোক একটা ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়েছিলেন। ব্যাঙ্কটা ছোট ছিল। ডিপোজিটারদের মধ্যে বেশীর ভাগ সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কিছু বিধবা। ধনী যারা ছিল টুং টাং শুনে তারা আগেই টাকা তুলে নিয়েছিল। ধনীদের ইন্দ্রিয়গুলো বিষম সার্প হয়, অবিশ্যি সব কটা ইন্দ্রিয় না। ত্বক বলে যে ইন্দ্রিয়টা, সেটা হয়তো থাকেই না।'

'এই সব জেনেও তুমি অমরেশবাবুর টাকা হাত পেতে নিলে?'

'টাকার আবার জাত বেজাত আছে নাকি?'

'তা নেই, তবু—'

'তবু টবু কিছু না। বাঁচতে গেলে টাকা চাই। অমরেশবাবুর

টাকা আছে, আমাদের নেই। জল উঁচু লেভেল থেকে নীচুতে বয়। দোষটা কোথায় ?'

দাদা এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, যে আমার মনে হতে লাগলো, সত্যি সত্যি এর মধ্যে কোন দোষ নেই। না নিলেই হয়তো দোষ হতো।

'আর একটা কথা তোকে বলবো দোলন। খুব ডেলিকেট ব্যাপার। যদিও কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো আমার নীতিবিরুদ্ধ, তবু তোকে বলছি। বলছি তুই নিতান্তই ছেলেমানুষ বলে এবং তোকে হয়তো কিছুটা ভালোও বাসি—'

'তবু একজনকে খানিকটা ভালবাসো।'

'ঠাট্টা করিস আর যাই করিস, লাভ ইজ এ উইকনেস অফ মাইণ্ড। দুর্বলতা জিনিষটা কোনদিনই ভাল না। যে ফরমেই সেটা আসুক না কেন। তুই নিচু স্তরের লোককে ভালবাসতে যাস না দোলন।'

'আমি আবার কাকে ভালবাসতে গেলাম ?'

'ভাল যদি না বেসে থাকিস, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। দারিদ্রের সঙ্গে প্রেমের একটা লড়াই পৃথিবীর আদি থেকে চলে আসছে। আদিমযুগে সেই সমস্যাটা হয়তো বড় হয়ে দেখা দিত না কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষকে প্রতিটি পদক্ষেপ খুব চিন্তা করে ফেলতে হয়। একটু এদিক ওদিক হলেই কুপোকাৎ।' দাদা শরীর হেলিয়ে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করলো।

'আমি খুব হিসেব করে পদক্ষেপ ফেলি। আমার বিষয়ে তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'আশ্বস্ত হলাম। সুন্দরী মেয়েদের অনেক জ্বালা। তাদের কুৎসা খুব তাড়াতাড়ি রটে। অনেক সময় বিনা কারণেই রটে। সেদিক দিয়ে কুৎসিৎ হওয়ার সুবিধা অনেক। জীবনে অনেকটা বেশী স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়। যত্রতত্র ঘুরে বেড়ালেও কেউ তাদের তাকিয়ে দেখে না।'

দাদার কথায় কী রকম সন্দেহ হলো। প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি আমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছো ?'

'হ্যাঁ।'

'কি শুনেছো ?'

'তুই একটা বাজে ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াস।'

'বাজে ছেলে ?'

'যে ছেলের আর্থিক সঙ্গতি কম, তাকে আমি বাজে বলি।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, 'ঘুরে বেড়াই ঠিক না, ঘুরেছিলাম দু-একদিন।'

'আর ঘুরিস না।'

'ঘুরলে কি হয় ?'

'আগেই বলেছি, সুন্দরীদেব অনেক জ্বালা। সবাই তাদেব দেখে, কী কবে, কাব সঙ্গে মেশে, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে। সুতবাং একটু সাবধান হয়ে চলতে হয়।'

'ওব যে আর্থিক সঙ্গতি কম, তুমি কি করে জানলে ?'

'সেটা প্রশ্ন না। প্রশ্ন হচ্ছে তুই কেন ওর সঙ্গে ঘুরবি। ঘুরতে ঘুরতে যদি শেষ পর্যন্ত একটা ভালবাসা জন্মে যায় এবং যদি তাকে বিয়ে করে বসিস—'

'কি হয় তাহলে ?'

'কি হয় ? এই ছাখ, আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছে।' বলে দাদা একটা হাত আমার সামনে বাড়িয়ে ধরলো।

দাদাব বলাব ধরনে হেসে ফেললাম।

দাদা আমাকে ছোট ধমক দিয়ে বললো, 'প্রাণে ফূর্তি আছে, যত পারিস হেসে নে। কিন্তু একদিন যখন ফূর্তি ফুরিয়ে যাবে—'

'কাঁদবো।'

'কথাটা বলতে ভাল, কিন্তু কান্না জিনিষটা ভীষণ বিশ্রী। চোখের জলের স্বাদ মোটেই মিঠা না।'

'তোমার কোন কাজ নেই আজ ?'

'রোববার আবার কি কাজ ?'

'আগে তো বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা মারতে।'

'করার কিছু ছিল না বলেই মারতাম।'

'এখন করার মত কি কাজ পেলে ?'

'অমরেশবাবুর সঙ্গে দুটো সুখ দুঃখের গল্প করা। তাতে ফয়দা আছে।'

'তুমি আবার টাকা ধার নেবে ?'

'ধার ধার করিস না। যে লোকটার ধার শোধ দেবার ক্ষমতা নেই, কথাটা বললে তাকে অপমান করা হয়।'

দাদা আর দাঁড়ালো না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দাদা কি সত্যি সত্যি অমরেশবাবুদের বাড়িতে গেল ? কার কাছ থেকে অরিন্দমের কথা শুনেছে দাদা ? সে কি কণিকাদি ?

অনেকদিন পর কণিকাদিদের বাড়ি গেলাম। গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার মুখে সেই চিরাচরিত দৃশ্য। বিরাটকায় লোকটি মাথায় পাগড়ি এঁটে টুলের ওপর বসে আছে। ও উদাস দৃষ্টিতে সামনের বড় নিম গাছটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ কি খেয়াল হলো, ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিমফল কি তেঁতো হয় ?'

আমার প্রশ্নটা বুঝতে ওর সময় লাগলো পুরো একটা মিনিট। ও আমার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে থাকার পর লোকটি জেগে উঠলো। জেগে উঠলো প্রচণ্ডভাবে। উৎকট স্বরে হেসে উঠলো ও। যেন দারুণ মজার কথা শুনে ফেলেছে। বার কয়েক নিম গাছটার দিকে তাকিয়ে একসময় ও বললো, 'আমার খেয়াল নিম ফল মিঠা হয় দিদিমণি। আমার দেশের বাড়ির সামনে ভি একঠো নিম গাছ

আছে। ফল পাকলে সেখানে মৌমাছিরা ভিড় করে। তেঁতো খেতে কে আর আসে, বলুন।'

'তা বটে।' বলে বাড়িব দিকে যাচ্ছিলাম।

ও বলে উঠল, 'মাইজী বাড়ি নেই। গিরিডি গিয়েছেন।'

'কণিকাদি গিরিডি গেছে? কার সঙ্গে গেছে?' শেষের প্রশ্নটা অবাস্তব। শ্রুতিকটুও বটে। অথচ কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'অবিন্দমবাবুব সঙ্গে।'

'কণিকাদি একা গেছে?'

'খোকা খুকুরাও গিয়েছে।'

'বাবু?'

'বাবু আছেন। বাড়িতেই আছেন।'

উচিত ছিল ফিরে আসা। কণিকাদি নেই। অরিন্দমেব সঙ্গে বিদেশে গেছে। নিশ্চয়ই বেড়াতে গেছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে ছেলেমেয়েদেব সঙ্গে নিয়ে গেছে। গিবিডি স্বাস্থ্যকব জায়গা। এখন শীতকাল। ওখানকাব আবহাওয়া নিশ্চয়ই খুব ভাল। হাওয়া বদলাতেই গেছে কণিকাদি। অমবেশবাবু সঙ্গে যান নি। পুরুষ মানুষেব সব সময় কাজ ছেড়ে যাওয়া চলে না। কিন্তু যে লোকটা সঙ্গে গেল, সেও তো পুরুষ-মানুষ।

'বাবুকে খবর দেব দিদিমণি?'

'তোমায় যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।' বলে দ্রুতপায়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম।

এ বাড়ি আমার চেনা। এই তো সেই বিরাট ঘরটা। অমরেশবাবু এই ঘরে বসে কাজ করেন। একদিন কাজ করছিলেন। ঘরের কোণায় সেদিন আর একজন লোকও ছিল। মাথা গুঁজে কাজ করছিল। আজ সমস্ত ঘরটা ফাঁকা। বাড়িটাও অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলাম। দাদা বলেছে বড়

লোকদের গা দিয়ে নাকি মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। আমার মনে হতে লাগলো, শুধু বড়লোকদের গা দিয়ে না, ওদের বাড়ি, বাড়ির আসবাব-পত্রের মধ্যেও সেই গন্ধ মাখানো থাকে। কণিকাদিদের বাড়িতে পা দেওয়ার মুহূর্তে থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ আমাব নাকে আসছিল।

কী প্রশস্ত সিঁড়ি! পাশাপাশি ছ সাতজন লোক অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে। সেই তুলনায় আমাদের সিড়িটা কী বিশ্রী বকমের সঙ্কীর্ণ! ধনীদের সব কিছুই প্রশস্ত। মনও। না হলে পর-পুরুষের সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দেয় কেউ? মনে করতে চেষ্টা করলাম, মা কোনদিন বাবাকে ছেড়ে ঘরেব বাইরে গিয়েছে কিনা। একবার গিয়েছিল। দাদু সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে তো পর-পুরুষ বলা যায় না।

সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা। সুদৃশ ঝকঝকে পেতলেব দাঁড়ে একটি বয়স্ক কাকাতুয়া বসে আছে। আমাকে দেখে সে কী বলে উঠলো। অনেকটা যেন প্রশ্ন করার মত, তুমি কে হে বাপু! এতক্ষণ পর এই বাড়ি মধ্যে তবু একটা শব্দ পাওয়া গেল। কণিকাদি এবং তার ছেলে মেয়েরা যদিও বাড়িতে নেই, কিন্তু আমি অনুমান করতে পারি, চাকর ঝি মিলিয়ে অন্তত গোটা পাঁচ সাত লোক এ বাড়িতে আছে এখন। অমরেশবাবুও ঘুমোচ্ছেন না নিশ্চয়। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। এই সময় কোন সুস্থ লোক ঘুমোয় না। অথচ বাড়িটা অসম্ভব রকমের নিস্তব্ধ।

পর পর অনেকগুলো ঘর। সব ঘরের সামনে ভারী পর্দা ঝুলছে। অহেতুক একটা কৌতূহল আমার মধ্যে জেগে উঠলো। অহেতুক ছাড়া কী বলবো! এই বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। বড় বাড়িতে অনেক ঘর থাকাই তো স্বাভাবিক। এত ঘর নিয়ে কি করে কণিকাদিরা? কণিকাদি এবং অমরেশবাবু নিশ্চয়ই এক ঘরে শোন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, বাবা এবং মা কোনদিন এক ঘরে শোন নি।

আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সেভাবে শুতে তাঁদের দেখিনি। হয়তো কণিকাদি এবং অমরেশবাবু আলাদা আলাদা ঘরেই ঘুমোন। হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না।

ততক্ষণে আমি একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। গাঢ় সবুজ রঙয়ের পর্দাটা আমার দৃষ্টি রুদ্ধ করে রেখেছে। এমনিতে সবুজ রং আমার ভাল লাগে না। বড় উগ্র মনে হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এই রংয়ের মধ্যে উষ্ণতার আভাষ পেলাম। মনে হলো, গাঢ় সবুজ রংয়ের মধ্য দিয়ে একটা বাড়ির প্রাণ প্রাচুর্যের সংবাদ ঘোষিত হচ্ছে। পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম। আবছা অন্ধকার। গোটা কয়েক আসবাবপত্রের আভাস। বাতি জ্বেলে ভাল করে দেখার ইচ্ছে হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে নিলাম। কণিকাদি বাড়ি নেই। এ অবস্থায় তাদের বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াবার অধিকার আমার নেই। এই কৌতূহল শুধু যে অসঙ্গত তা না, অন্যায়ও বটে। কাকাতুয়াটা আবার কী বলে চেঁচিয়ে উঠলো। ব্যাটা নিশ্চয়ই আমাকে চোর ঠাউরেছে। নীচে নামবার জন্যে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে যাব, কানে এল, 'কে ?' অমরেশবাবুর কণ্ঠস্বর।

ঘুরে দাঁড়াতেই উনি বললেন, 'চলে যাচ্ছো ?'

যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অস্ফুটস্বরে বললাম, 'কণিকাদি বাড়ি নেই ?'

'কাল ওরা গিরিডি গেছে।'

কী অভূতপূর্ব ব্যাপার! কোথায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাব, না আমি পায়ে পায়ে অমরেশবাবুর দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার পা কাঁপছে, সর্ব শরীর কাঁপছে। অথচ গুরুতর কোন অন্যায় যে করেছি তা না। সত্যিই কি অন্যায় করি নি? গেটের মুখেই তো শুনে এসেছিলাম, কণিকাদি কলকাতায় নেই। সেই পাগড়ি-অলা লোকটা যদি এই মুহূর্তে ওপরে উঠে আসে, এবং ওর মনিবকে বলে, আমাকে

এই সংবাদটা কিছুক্ষণ আগেই সে দিয়েছে, তা হলে! কিন্তু গেটের দারোয়ান তো অন্দরে প্রবেশ করে না।

'গিরিডি গেছে, অথচ আমাকে বলে গেল না।' কথাটা বলেই অপ্রস্তুত বোধ করলাম। বাধ্য হয়েই তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠতে হলো, 'অবিশ্যি বলে যে যেতে হবে তার কোন মানে নেই।'

'বলে যাবার মত সময় কণিকার হাতে ছিল না। কাল বিকেলেই যাওয়া ঠিক হলো কিনা।'

আমি দাঁড়িয়েছিলাম। অমরেশবাবু আমার কাছে এগিয়ে এলেন। কোমল কণ্ঠে বললেন, 'অনেকদিন পরে এলে, অথচ কণিকার সঙ্গে দেখা হলো না।'

ফস করে বলে ফেললাম, 'আপনি তো আছেন।'

অমরেশবাবু যেন খুশী হলেন। বললেন, 'এসো এসো।'

অমরেশবাবুর পিছন পিছন আমি একটা ঘরে ঢুকলাম। অন্যান্য ঘরের তুলনায় এ ঘরটা ছোট। আসবাবপত্রও বিশেষ কিছু নেই। ঘরে একটা নীল বাতি জ্বলছে। সেই আলোয় সব কিছু দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। ঘরের কোণের দিকে একটা খাট। খাটের পাশে ছোট টি-পয়। টি-পয়ের ওপর একটা গ্লাস, পাশে বোতল। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র একটা গন্ধ নাকে এল। দাদা যে বলেছে বড়লোকদের গা দিয়ে মিষ্টি গন্ধ বেরোয়, এ কি সেই গন্ধ? গন্ধটা চেনা চেনা মতন। কিন্তু চিনতে পারছিলাম না।

অমরেশবাবু বললেন, 'বসো।'

খাটের পাশে একটা চেয়ার ছিল। আমি সেই চেয়ারে বসে পড়লাম। নিজেকে অবসন্ন বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন কত পরিশ্রম করে দো-তলায় উঠে এসেছি। শীতের মধ্যেও কি আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে? যদি এই ক্ষীণ আলোয় অমরেশবাবু আমার মুখ দেখতে পান সে যে বিষম

লজ্জার ব্যাপাব হয়ে দাঁড়াবে। অমরেশবাবু কি তাহলে ভাববেন না, অযথা দোলনের কপালে ঘাম জমতে শুরু করলো কেন ?

অমরেশবাবু খাটের ওপব বসলেন। কোন কথা বললেন না।

দুজন মানুষ কাছাকাছি চুপ কবে বসে থাকা যায় না। অস্বস্তি বোধ হয। হঠাৎ বলে ফেললাম, 'আপনি গেলেন না ?'

উনি যেন চমকে উঠলেন, 'কোথায় ?'

'গিরিডি।' কথা বলে আমি সহজভাবে হেসে উঠলাম।

অমরেশবাবু কিন্তু আমার মত কবে হাসতে পাবলেন না। যদিও এই স্তিমিত আলোয় তাঁর মুখ পরিস্কার ভাবে দেখা আমাব পক্ষে সম্ভব ছিল না, আমার মনে হলো, উনি একটা উদ্গত শ্বাস বোধ কবলেন। না কি আমার বোঝাব ভুল।

'যাওয়া যেতে পারতো। ভালই হতো গেলে। ছেলেমেয়েরাও খুশী হতো—' অমরেশবাবু চুপ কবলেন।

কণিকাদি ? কণিকাদি খুশী হতো না ?

এ প্রশ্ন অমরেশবাবুকে করা যায় না।

'কিন্তু হঠাৎ বেজায় কাজ পড়ে গেল।'

তাই কি সাতসকালে আপনি অফিস থেকে ফিরে একলা বসে আছেন ?

এ প্রশ্নও অমরেশবাবুকে করা যায় না।

'লোকে যতই বলুক না কেন ব্যবসা অর্থে স্বাধীনতা, আসলে আমরা চাকুরেদের চেয়েও বেশী পরাধীন।'

ইচ্ছে করলে কণিকাদিকে আপনি বাধা দিতে পারতেন। সুযোগ সুবিধামত নিজে সঙ্গে কবে নিয়ে যেতে পারতেন। যে সময আপনাব অবসব হতো, সেই সময়।

এ কথাও অমরেশবাবুকে বলা চলে না।

'এই সময় গিরিডির আবহাওয়া ভাল। ছেলেমেয়েরা অসুখে ভুগছিল, ওখানে গিয়ে ভালই থাকবে।'

'আপনি সঙ্গে গেলে ওরা আরও ভাল থাকতো।'

'তা থাকতো। কিন্তু সব ভাল তো হয় না মানুষের জীবনে।' অমরেশবাবু গ্লাসে চুমুক দিলেন। সেই মৃদু গন্ধটা আবার নতুন করে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। খুব চেনা চেনা গন্ধ। কিন্তু। মনে পড়ছে। চিনতে পারছি। দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়েছে কয়েকদিন। যতদিন ভাল লেগেছিল খুব বসিয়ে বসিয়ে খেয়েছিল। তারপর একদিন মুখ বিকৃত করে বলেছিল, 'পয়সা খরচা করে কেউ মদ খায়? কেন খাবো? আমার প্রাণে তো কোন দুঃখ নেই।' সেদিন অবিশ্যি দাদা একটু বেশী মাত্রায় খেয়ে ফেলেছিল। তারপর দাদা বাকি মদটা বাথরুমে ঢেলে ফেলে দিয়ে আমাকে বলেছিল, 'গ্লাসটা ভাল করে ধুয়ে রাখিস। বাবা জানতে পারলে কষ্ট পাবেন। একেই ভদ্রলোক কষ্ট রোগে ভুগছেন, রোগটা আরও বেড়ে যাবে।'

এই মুহূর্তে কোন একটা কাজের অজুহাত দেখিয়ে আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল। আমি অনায়াসে বলতে পারতাম, দাদার বাড়ি ফেরার সময় হলো। কিংবা মা একা একা আছে, শরীরটাও মার ভাল নেই, বা যে কোন একটা অজুহাত—আমার বিশ্বাস অমরেশবাবু বাধা দিতেন না। ভদ্রলোককে যেটুকু দেখেছি, মনে হয় উনি নির্বিবাদী মানুষ। সব সময় নিজের মধ্যেই গুটিয়ে আছেন। এইসব মানুষদের আহ্বাহনী নেই, বিসর্জনও থাকে না। আমি যদি চলে যেতে চাই, উনি ঠিক একভাবেই বলবেন, এসো, যেমন বলেছিলেন কিছুক্ষণ আগে, আমাকে আহ্বান জানিয়ে।

কি বিস্ময়কর আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ছি আমি! আমি উঠলাম না, যে ভাবে বসেছিলাম, সেভাবেই বসে রইলাম। অমরেশবাবু ইতিমধ্যে আরও দুটো চুমুক দিয়েছেন। উনি এত সহজভাবে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলেন, যাতে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, হয় উনি জল খাচ্ছেন, না হয় নির্দোষ কোন সরবৎ জাতীয় পানীয়। আমি হলফ করে বলতে পারি, অরিন্দমকে যদি এ অবস্থায় আবিষ্কার করা যেত,

ও নির্ঘাৎ গ্লাস শুদ্ধ টি-পয় উল্টে ফেলে দিত না হয় হাস্যকর কোন আচরণ করে ফেলতো। অরিন্দমের তুলনায় অমরেশবাবুকে এই মুহূর্তে অনেক বলশালী এবং ক্ষমতাবান পুরুষ বলে মনে হতে লাগলো।

'তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে? দীপু বলছিলো, তুমি নাকি চাকরি করতে চাও?'

'একটা চাকরি পেলে মন্দ হতো না।'

'চাকরি পেলে পড়া চালাবে কি করে। তার চেয়ে টিউশানি ভাল।'

'টিউশানিতে ভাল টাকা রোজগার হয় না।' খুব সহজভাবে আমি কথা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। অথচ অমরেশবাবুর সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার ভাল করে আলাপই হয়নি। পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যাদের দেখা মাত্র অন্তরঙ্গ বলে মনে হয়। মনে হয়, এদের কাছে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলা চলে। অনেক মানুষই অপরের কথা শোনে না। শুনলেও বোঝে না। অমরেশবাবুকে একজন মনোযোগী শ্রোতা এবং দরদী মানুষ বলে মনে হতে লাগলো। অথচ এই মনে হওয়ার পেছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। উনি হয়তো মোটেই মনোযোগী নন। বা এমনও হতে পারে, আসলে উনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ।

বাইরের আবরণ ভেদ করে ভেতরের মানুষটির সন্ধান পাওয়া সব সময় হয়ে ওঠে না। অতর্কিতে প্রশ্ন করে ফেললাম, 'মানুষ মদ খায় কেন? দুঃখ ভুলতে?'

অমন ধীর স্থির মানুষ অমরেশবাবু, আমার প্রশ্ন শুনে উনি যেন হঠাৎ বিচলিত হয়ে পড়লেন। অযথা নড়ে চড়ে বসলেন। উত্তর দিতে গিয়েও দিতে পারলেন না। বার কয়েক কাশলেন, রুমাল দিয়ে ভাল করে মুখ মুছে নিলেন। মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভদ্রলোক কী রকম বিব্রত বোধ করছেন।

'মানুষ যে দুঃখ ভুলতেই মদ খায় এমন কথা কে বলেছে। তাছাড়া আমি যে মদ খাচ্ছি, তা-ই বা জানলে কি করে?' অমরেশবাবু হৃৎ-শক্তি ফিরে পাবার চেষ্টা করছেন যেন।

'মদের গন্ধ আমি চিনি।'

ভেবেছিলাম উনি আমাকে আবার প্রশ্ন করবেন, কী করে চিনি। উনি কিন্তু সে প্রশ্ন করলেন না। লঘু স্বরে বললেন, 'দূর থেকে গন্ধটা মিষ্টি মনে হয়, কাছ থেকে বড় উগ্র।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে উনি আবার বললেন, 'মদ খেতে যে খুব ভাল লাগে তা না। বরং বিস্বাদ লাগে। তবু খেতে হয়। একেই নেশা বলে হয়তো।'

'কণিকাদি বারণ করে না?'

'নাঃ।' বড় এক চুমুকে গ্লাসটা শূন্য করে দিয়ে উনি টি-পয়ের ওপর সেটাকে নামিয়ে রাখলেন। তারপর দেশলাই জ্বেলে একটা সিগারেট ধরালেন। যতক্ষণ কাঠিটা জ্বলছিল, আমি দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে অমরেশবাবুকে দেখছিলাম। আলোটা নিভে যেতেই উনি গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে গেলেন। সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে একজন বিপন্ন মানুষের কণ্ঠস্বর আমার কানে আসতে লাগলো, 'সময় সময় বড় একলা মনে হয়। মনে হয়, এই বিশাল পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। তুমি হয়তো ঠিক বুঝবে না দোলন, তুমি ছেলেমানুষ, সংসারের কতটুকুই বা দেখেছো।'

ফস করে বলে ফেললাম, 'উনিশ বছরের মেয়েরা ছেলেমানুষ থাকে না। আমি সংসারের অনেক কিছুই দেখেছি।'

'কি দেখেছো দোলন? কতটুকু দেখেছো তুমি?' বলতে বলতে অমরেশবাবু আমার দিকে ঝুঁকে বসলেন।

'আমি দেখেছি, টাকা থাকলেও মানুষ সুখী হয় না, না-থাকলেও না।'

'খুব ভাল কথা বলেছো। টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় না, একথা আমার চেয়ে বেশী করে কেউ হয়তো বুঝবে না। এককালে খুব গরীব ছিলাম। তখন ঐশ্বর্যের ওপর খুব লোভ ছিল। মনে হতো,

টাকা পয়সা ছাড়া চাওয়ার মত জিনিস সংসারে আর কিছু নেই এখন কি মনে হয় জানো। মনে হয়, আমার সমস্ত ধন-দৌলতের বিনিময়ে কেউ যদি আমাকে খানিকটা শান্তি দিতে পারতো!'

'আপনি কি সেই শান্তির আশায় মদ খান?'

'ঠিক তা না। মদ যদি শান্তি আনতে পারতো, তা হলে মানুষের অনেক সমস্যাই মিটে যেত। কিছু করার নেই বলেই আমি মদ খাই।'

'আপনার এত কাজ—'

'সে কাজে তো মন ভরে না। সমস্ত দিন পরিশ্রম করি, টাকার পেছনে দৌড়ই, তারপর ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি। তখন মনে হয়, করার মত কোন কাজই আমার নেই।'

'ইচ্ছে করলে আপনি সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারেন, বা কোন সিনেমায়।'

'ভাল লাগে না।'

'আসলে আপনি ভীষণ কুঁড়ে।'

অমরেশবাবু শব্দ করে হেসে উঠলেন। যেন দারুণ মজার কথা শুনেছেন। 'ঠিক বলেছো, আমি দারুণ অলস। কী রকম অলস শুনবে? রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে যদি দেখি কম্বলটা গা থেকে সরে গিয়েছে, সেটাকে টেনে নিতে আমার বিষম আলস্য লাগে। তার চেয়ে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে থাকা অনেক আরামদায়ক।'

'আপনি এ ঘরে একা শোন?'

'হ্যাঁ। একা শুতে আমার ভাল লাগে।'

'কিন্তু আপনার মত মানুষের একা শোয়া উচিত না। কারণ শীতের সময় কম্বল গায়ে তুলে নিতে পারেন না আপনি।'

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলাম। অমরেশবাবুকে এখন আমার সমবয়সী মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অথচ একদিন ভদ্রলোককে কত গম্ভীর এবং বয়স্ক বলে মনে হয়েছিল।

বাইরে অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে। দাদা নিশ্চয় এতক্ষণে বাড়ি

ফিরছে। বাড়ি ফিরে দাদা প্রথমেই আমার খোঁজ করে। চা খেতে খেতে দুজনে গল্প করি কিছুক্ষণ। দাদা যদি হঠাৎ এখানে চলে আসে? এসে যদি দেখে—

অমরেশবাবু বোতলের দিকে হাত বাড়াচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে বললাম, 'আর থাক।'

উনি হাত গুটিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'থাক।'

'আপনি তো বেশ বাধ্যের।'

'হ্যাঁ, খুব।'

দুজনে আবার একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

অনেক দিন পর আজ আমি প্রাণ খুলে হাসছি। বাবা মারা যাবার পর এমন করে হাসিনি।

বাবার মৃত্যুতে যে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক তা না। একটা দুঃখবোধ নিশ্চযই ছিল। দুঃখের চেয়েও বড় একটা বোধ, সেটা হলো শূন্যতাবোধ। এক রকম আছে না, ঘুম থেকে উঠেই মনে হয়, আমার জীবনে চাওয়ার মত কিছু নেই, প্রিয়জন বলতে আমার কেউ নেই, আমি কারও কথা ভাবতে পারছি না, সংসারে এমন কেউ নেই যে নিবিড় করে আমাকে উপলব্ধি করতে চায়, সরলভাবে বলতে গেলে, আমি কাউকে ভালবাসতে পারছি না, এবং এই না-পাবার দরুন ভালবাসা চাওয়ার অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছি—সে রকম। তখন মনে হয়, এই বিশ্বচরাচরে অগণিত মানুষ, পশু, পাখি সবাই আমরা এত কাছাকাছি রয়েছি অথচ পরস্পরের সঙ্গে সবাই যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেলেছি। বিষম নিঃসঙ্গ মনে হয় তখন। বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমি খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম। মা আগের মত সর্বক্ষণ কথা বলে না। কাজের সময় মুখ বুজে কাজ করে। প্রয়োজন না হলে কথাই বলে না। বাবার মৃত্যুতে মাও যে খুব শোকার্ত হয়ে পড়েছে আমার সে রকম মনে হয় না। একজন মানুষ এতদিন ধরে কাছাকাছি ছিলেন, সেই

মানুষটি হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন, এমন না যে বিদেশে গেছেন, দুচার মাস বা বছর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে আসবেন। তিনি আর কোনদিনই আসবেন না। অসংখ্য স্মৃতি ফেলে রেখে গেছেন, সেগুলো নিয়ে গেলেই যেন ছিল ভাল। এই স্মৃতিগুলোই কি মানুষের মনে শূন্যতাবোধ এনে দেয়? মারও কি মনে পড়ে, ছুটির দিনেও বাবা ধীরেসুস্থে খেতে পারতেন না। কোন কাজ নেই তবু অহেতুক একটা ব্যস্তভাব, ছোট মাছ রান্না হলে বাবার গলায় কাঁটা ফুটবেই, তারপর শুকনো ভাতের ডেলা গিলতে গিলতে চোখে জল এসে পড়া, অ-কারণে আমার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা, যেন বিষম অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন—সবই কি মনে পড়ে মার? নাকি মনে হয়, আর একটু যদি যত্ন করা হতো, দুটো সান্ত্বনার কথা বলা হতো, সময় সময় একটু কাছে বসা, নির্বাক মানুষটিকে উত্যক্ত করে কথা বলানোর চেষ্টা করা, বা মজার মজার ঘটনার উল্লেখ করে একজন বিপন্ন মানুষের মুখে মৃদু হাসি ফোটানোর প্রয়াস—তাহলে বাবা হয়তো আরও কটা দিন বেশী বাঁচতে পারতেন! হয়তো কিছুই মনে হয় না মার। শুধু মনে হয়, সংসারে আয় কমে গেল, কী করে সংসার চলবে। আতঙ্কিত মনে মা হয়তো সর্বক্ষণ টাকার কথাই ভাবে। দারিদ্র মানুষকে শোক ভুলিয়ে দেয়। বাবা যদি প্রচুর টাকা রোজগার করতেন এবং আমরা যদি বিরাট ধনী হতাম, আমার বিশ্বাস, প্রতিদিন সকাল থেকে শুরু করে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অবশ্যই বাবার কথা বলাবলি করতাম। এবং আমাদের চোখ জলে ভরে উঠতোই। আসলে মানুষ মূল্যবান জিনিষের জন্যেই তো শোক করে। সংসারে যে জিনিষটা বাতিল হয়ে গেল, তাকে ফেলে দিতে কার মায়া হয়। না হওয়াই তো স্বাভাবিক। দাদা তো বাবাকে বাতিল মানুষ হিসেবেই দেখেছে বরাবর। নিজের মুখেই স্বীকার করেছে সে কথা। আমি এবং মাও হয়তো দাদার মত করেই চিন্তা করে এসেছি। যদিও সেই গোপন চিন্তার কথাটা নিজেরাই জানতে পারিনি।

অনেক দিন পর প্রাণ খুলে হাসতে পেরে আমার খুব ভাল লাগছে। এত ভাল লাগছে যে কী বলবো! ইচ্ছে হচ্ছিলো, অমরেশবাবুর হাত চেপে ধরে মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলি, আমি রোজ এ সময় আসবো, আপনার সঙ্গে গল্প করবো, আপনি বিরক্তবোধ করবেন না।

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'অসুবিধা কেন? আমার তো খুব সুবিধাই হচ্ছে।'

'কীসের সুবিধা?'

'তোমার সঙ্গে কেমন গল্প করতে পারছি। একা একা কার আর ভাল লাগে।'

'আমি যদি রোজ আসি, আপনি মদ ছেড়ে দেবেন?' কথাটা বলে ফেলেই কী রকম অপ্রস্তুত বোধ করলাম। একদিনের অন্তরঙ্গতায় মানুষকে এভাবে বলা চলে না। পরক্ষণেই আবার বললাম, 'কিছু করার থাকে না বলেই তো মদ খান, কিন্তু গল্প করার মত লোক থাকলে তো সে কথা ওঠে না।'

'তা ওঠে না।'

'তবে?' আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে অমরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার এই আগ্রহ অর্থহীন। সম্পূর্ণ অর্থহীন।

'খাব না। তুমি যেদিন আসবে মদ খাব না দোলন।'

অমরেশবাবুর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন খুশীতে ভরে গেল। 'আপনাকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম ভীষণ গম্ভীর মনে হয়েছিল। আর—'

'আর?'

'আর মনে হয়েছিল, আপনি টাকা পয়সা ছাড়া কিছু বোঝেন না।'

'এখন কি মনে হচ্ছে?'

যদিচ এই স্বল্প আলোয় আমার চোখ দেখা অমরেশবাবুর পক্ষে

সম্ভব ছিল না, তথাপি আমার চোখ ভারি হয়ে এল। আমি দৃষ্টি নত করলাম।

'এখন কি মনে হয় দোলন?' উনি আমার দিকে ঝুঁকে বসেছেন। যেন ব্যাকুলভাবে আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন।

'এখন মনে হয়—। কী জানি কি মনে হয়। কিছুই মনে হয় না। অনেক রাত হয়ে গেল, এবার উঠি।'

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। অমরেশবাবু হঠাৎ একটা উদ্ভট কাণ্ড করে বসলেন। আমার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'বলে যাও দোলন, কী মনে হয় তোমার?'

কিছুক্ষণ অমরেশবাবুর মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে বললাম, 'মনে হয় আপনি একজন সত্যিকারের দুঃখী মানুষ। দুঃখী। আর দারুণ ভাল।'

আর দাঁড়ালাম না। দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি। কর্কশ কণ্ঠস্বর কানে যেতেই পিছন ফিরে তাকালাম। সেই বয়স্ক কাকাতুয়াটা আমাকে উদ্দেশ্য করে কী যেন বললো। ব্যাটা প্রথম থেকেই আমাকে বিষ নজরে দেখছে। অবাঞ্ছিত বলে ভাবছে।

খুব ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। এতক্ষণে মনে হলো আজ বেশ শীত পড়েছে। আমার গায়ে কোন গরম জামা নেই। একটুতেই আমার ঠাণ্ডা লেগে যায়। ছেলেবেলা থেকেই এই রোগ আমার। যার জন্যে খালি পায়ে শিশির-ভেজা ঘাসে হাঁটতে মা বারণ করতো। দাদা নিশ্চয় এতক্ষণে বাড়ি ফিরেছে। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল কমে এসেছে। শীতকালে এমনিতেই অবশ্য লোকে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। লেপের নীচে আরামে ঘুমোবে বলে। আমার কিন্তু এখন বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। যদিও শীতকাল কিন্তু আজ একটুও কুয়াশা নেই। নির্মল আকাশ। একফালি চাঁদও উঠেছে। চাঁদ দেখতে চিরদিন

আমার ভাল লাগে। বারবার মুখ উচু করে ওকে দেখছিলাম। ও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। চলতেই থাকবে। হাঁটতে হাঁটতে যদি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাই, আমি জানি, ও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেই। ভাবতে ভাবতে এক বিচিত্র মমতাবোধ আমার মধ্যে জেগে উঠতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, সসাগরা এই যে বিপুলা পৃথিবী তার লক্ষ কোটি মানুষ, পশু পাখী, কীট পতঙ্গ, নদী নালা, গাছপালা সবার সঙ্গেই আমার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শুধু যে পৃথিবী তাই না, এর বাইরে যে জগৎ — সৌরজগৎ, সেখানকার সূর্য, গ্রহ উপগ্রহ, আকাশ, আকাশের গায়ে বিচিত্র মেঘ, সবাই আমার খুব আপন। এই মুহূর্তে যে চাঁদটা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, আর ঐ যে অসংখ্য তারা— জ্বলছে, নিভছে, স্থির হয়ে রয়েছে, ওরা কেউ-ই আমার পর না। ওরা সবাই আমার আপন- খুব আপন। এমন করে কোনদিন ভাবিনি। ভাবতে চাইনি।

কোন কোন বিরল মুহূর্তে নিজের অন্তস্থল দেখার তীব্র বাসনা জেগে ওঠে। আমার মনে হতে লাগলো, এই সেই বিরল মুহূর্ত যখন আমি দোলন বলে একটি মেয়ের কামনা বাসনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা সব কিছু জানতে চাই। দিনের আলোয় যাকে দেখা যায় না, লোকের ভিড়ে যাকে চেনা যায় না, কর্মব্যস্ত জগতের মাঝে যে যায় হারিয়ে, এই নিভৃত জগতের মাঝে তাকে আমি আবিষ্কার করতে চাই। আমি ওকে মিনতি করে বললাম, তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়াও দোলন একবার ভাল করে তোমাকে দেখি। চিনি।

কে একজন আমার হাত চেপে ধরলো।

দারুণ চমকে গিয়ে চাপা স্বরে বলে উঠলাম, 'কে ?'

ও কথা বললো না। ছোট শব্দ করে হাসলো।

'দাদা! বিষম চমকে গিয়েছিলাম।'

'এত রাত্রে তুই কি করছিস রে ?'

'তুমি মদ খেয়েছো ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন খেলে ? বলেছিলে না আর খাবে না।'

'যারা কথা দিয়ে কথা রাখতে চায়, আমি তাদের দলে না।' ও বুক উঁচিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালো যেন কোন দিগ্বিজয়ী পুরুষ।

'বাড়ি চলো।'

দাদা তখনও আমার হাত ধরে রেখেছিল, সেভাবেই বললো. 'চল।'

দরজার গোড়ায় মা দাঁড়িয়ে। মা নির্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর শব্দ করে কেঁদে উঠলো।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম এল না। আমাব পাশে মা শুয়ে আছে। রোজ শোয। বাবা মারা যাবার আগে শুয়ে শুয়ে দুজনে অনেক্ষণ ধরে গল্প করতাম। আজকাল বিশেষ কথাবার্তা হয় না। শোবার সঙ্গে সঙ্গে মা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে না ঘুমের ভান করে আমি বুঝতে পারি না।

ঘুরে ফিরে অমরেশবাবুর কথা মনে পড়ছিল। অমরেশবাবু কি এমন ঘুমিয়ে পড়েছেন না কি জেগে আছেন ? জেগে জেগে মদ খাচ্ছেন ? মানুষ কি শুধুমাত্র দুঃখ ভুলতেই মদ খায় কিংবা সময় কাটানোর জন্যে ? অন্য কারণেও তো মানুষ মদ খেতে পারে। যেমন কিনা আনন্দ উপভোগের জন্য। সেই লোকটার কথা সহসা মনে পড়ে গেল ; যে মদ খেয়ে রোজ রাত্রে বৌকে মারতো। তার তো কোন দুঃখ ছিল না। দুঃখ থাকলে অমন সোহাগ করে বৌকে নিয়ে কেউ বেড়াতে বেরোয় !

অরিন্দম তুমি কি এখন ঘুমিয়ে আছ ? ঘুমের মধ্যে সুখের স্বপ্ন দেখছো ? তোমার কি একবারও মনে হয় না, একজন মানুষ, যিনি কিনা পরিপূর্ণ এক সংসারকে উপভোগ করতে পারতেন, স্ত্রী পুত্র

পরিবার নিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন সুখকে উপভোগ করার অধিকার ছিল যাঁর, তাঁকে কেন রাত্রির অন্ধকারে গুমরে মরতে হয় ? মনে হয় না তোমার ? শুধু নিজের কথাই ভাবো সারাক্ষণ, অন্য কারও কথা মনে হয় না ?

তোমার কি হৃদয় নেই অরিন্দম ?

না না না। তোমার কথা আমি ভাবতে চাই না অরিন্দম। এক মুহূর্তের জন্যেও না। তবু কেন তুমি বারবার আমার মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াও ? দিনের আলোয় কত সহজে তোমাকে দূরে ঠেলে দিতে পারি, কিন্তু রাতের অন্ধকারে কেন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও ? কীসের লোভে ? আমার এই পঞ্চভূতের শরীরই কি তোমার আকর্ষণ ? শুধুই শরীর, আর কিছু না ? আমার মন ? আমার মনকে তোমার প্রয়োজন নেই ? যদি থাকতো, তাহলে এমন নিঃশব্দে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়তে না। গোপনে আমাকে গভীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে চাইতে না। অন্ধকার না ? অন্ধকার আর কাকে বলে ! যেখানে আলোর এক বিন্দু রশ্মি প্রবেশ করতে পারে না, তাকে নিশ্চিদ্র অন্ধকার বলে। হতাশার অন্ধকার।

নেশাগ্রস্ত মানুষের মত যত হিজিবিজি চিন্তা করে চলেছি, যে চিন্তার শেষ কোনদিন হতে পারে না। রাত এখন গভীর। পৃথিবীর কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এখন জেগে আছে কিনা সন্দেহ। হয়তো একমাত্র অমরেশবাবু জেগে রয়েছেন, যেহেতু তাঁর ঘুমোবার উপায় নেই। আর জেগে আছি আমি। এক অশরীরিণী প্রেতাত্মার মত আমি বেদনাতুর রাত্রির গর্ভযন্ত্রণা উন্মুখ হয়ে শুনছি ! আমরা দুজন— আমি আর অমরেশবাবু এক জঘন্য চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। এই জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু মাথা খুঁড়ে মরছি।

কিন্তু না। এভাবে নিজেকে হত্যা করার অধিকার আমার নেই। আর দশজনের মত স্বচ্ছ স্বাভাবিকভাবে আমি বাঁচতে চাই। বাঁচাতে

চাই আর একজনকে যিনি বিনা প্রতিবাদে জীবনের পথ থেকে ক্রমশই বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন। আমি তাঁকে বাঁচাবোই। তুমি কিংবা তোমার মণিদি শত চেষ্টা করলেও তাঁকে ধ্বংস করতে পাববে না অরিন্দম।

দারুণ উত্তেজনায় আমি বিছানায় উঠে বসলাম।

'তুই কি কোন অন্যায় করেছিস ?'

ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। মা হঠাৎ এ কথা বলে উঠলো কেন ? ঘুমের মধ্যে কি মানুষ কথা বলে ? না কি মা এতক্ষণ ঘুমোয় নি, শুধু ঘুমের ভান করে শুয়েছিলো ?

শুয়ে পড়তে পড়তে লঘুভাবে বলার চেষ্টা করলাম, 'কোথায় অন্যায়, কোন অন্যায় নেই।'

মা আবার বললো, 'বিছানায় শুলেই তুই ঘুমিয়ে পড়তিস।'

সহসা বিবক্তিতে মন ভরে উঠলো। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলার অধিকার মার থাকতে পারে না। বিশেষ করে এই মুহূর্তে যখন আমি কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে নেই। 'রোজ যে মানুষ এক সময়ই ঘুমোবে তার মানে নেই।' বললাম।

মা আমাব মাথায় হাত বলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলো, 'ঘুমো। না ঘুমলে শরীর খারাপ কববে। আগে তবু মাথার ওপর একজন ছিল, এখন তো কেউ নেই।'

মাকে সাহস দেবার জন্যে বললাম, 'দাদা আছে।'

'দীপুর ওপর ভরসা করতে পারি না।'

'কেন দাদার ওপর ভরসা রাখতে পার না মা। দাদা তো আমাদের কথা খুব ভাবে। তোমার জন্যে সেদিন একটা টনিক নিয়ে এল।'

'টনিক আনলেই সব কর্তব্য শেষ হয় না। তোর কথা ভাবে না। কিন্তু ভাবা উচিত। মেয়েদের বিয়ে দিতে হয়।'

'বিয়ের বয়স আমার পেরিয়ে যায়নি। আজকালকার দিনে এ বয়সে কারও বিয়ে হয় না।'

মা বিড বিড করে বলতে লাগলো, 'হয়। বয়সের সময় বিয়ে না হলে—'

আমি হেসে ফেললাম, 'তুমি আবার এত রাত্তিরে সরোজিনী-উপাখ্যান শুরু করে দিও না।'

মা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'ক'টা টাকা মাইনে পায় দীপু। সংসার কীভাবে চলে জানি আমি, আর জানেন মাথার ওপর যিনি আছেন। দীপু সে কথা বোঝে না, বুঝতে চায় না। বুঝলে—' মা চুপ করে গেল।

কথা বললাম না। দাদা আজ মদ খেয়ে এসেছে। মা হয়তো সেই ইঙ্গিতই করলো। দাদা যে মদ খেল, নৈতিক দিক দিয়ে তা যত না গর্হিত, তার চেয়ে অনেক বড় অন্যায় সংসারের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কতগুলো পয়সা খরচা করে ফেলা। বাবা মারা যাবার পর মাকে এমন স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুনিনি। মা অধিকাংশ সময় চুপ করে থাকে, যন্ত্রচালিতের মত সংসারের কাজ করে যায়, যা দেখে সময় সময় আমার মনে হয়, বাবার মৃত্যু বুঝি বা মার মনে গভীর শোকের ছায়া বিস্তার করেছে। এই মুহূর্তে আমার মনে হতে লাগলো, যে খোলসের মধ্যে মা সাময়িকভাবে আত্মগোপন করেছিল, সেই আবরণ ভেদ করে আবার আত্মপ্রকাশ করলো।

মা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছে ভেবে আনন্দিত বোধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটা দুঃখ আমার মনে বাসা বাঁধতে লাগলো। আর একজন মানুষ কিছুতেই সঙ্কীর্ণ একটা গণ্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছেন না, অসহায়ভাবে শুধুই ঘুরে মরছেন। তাঁর এই অসহায়তাই আমার দুঃখ-বোধের কারণ।

'বাঁচতে গেলে টাকা চাই। কিন্তু কোথা দিয়ে টাকা আসবে বুঝি না।' মা বিড বিড করে উঠলো। শুধু টাকা, টাকা!

টাকা ছাড়া সংসারে আর কিছু বোঝ না তোমরা। তুমি না, অরিন্দম না।

কিন্তু মাকে একথা বলা যায় না। বুঝবে না। শুধু শুধু কষ্ট পাবে।

'কণিকার দেওরকে দেখেছিস ?'

'এতদিন পর আবার সে-কথা কেন ?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'না।'

মা আর প্রশ্ন করলো না। চুপ করে শুয়ে রইলো। কিন্তু মা যে ঘুমোয়নি বুঝতে পারছিলাম।

'জান মা, আজ অনেকক্ষণ অমরেশবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করলাম। বেশ লোক।'

মা কথা বললো না। মা ঘুমোয়নি অথচ কথা বলছে না, এও এক কম আশ্চর্যের বিষয় না। মাকে কথা বলাবার জন্যে একটা জিদ ক্রমশই আমার মধ্যে জন্ম নিতে শুরু করেছে। 'অথচ এই লোককে একলা ফেলে দিয়ে কণিকাদি গিরিডিতে চলে গেল। তুমি কখনও বাবাকে ছেড়ে বাইরে যাওনি।'

'দিনকাল বদলে যাচ্ছে। তাছাড়া কণিকার চড়নদার আছে, আমার তো কেউ ছিল না।'

'চড়নদার ফড়নদার বাজে কথা। আসলে ও স্বার্থপর, তাই নিজের স্বার্থই দেখে। অপরের দুঃখ কষ্ট বোঝে না।'

'উনি কি দুঃখ কষ্টের কথা তোকে বলছিলেন ?'

'না না। আমাকে বলতে যাবেন কেন। স্বামী-স্ত্রীর ভেতরের ব্যাপার, আমি তো বাইরের লোক।'

'অনেকে বাইরের লোককে ভেতরের খবর বলতে ভালবাসে। সেদিন কণিকা কত কী বলে গেল। বললো, অমরেশবাবু নাকি মদ খান, ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, বাড়িতে বসে মদ খাওয়া কি ভাল। কে নাকি একটি ছেলে কাজ করে ভদ্রলোকের অফিসে, মাইনের তুলনায় তাকে দিয়ে বেশী খাটিয়ে নেন—'

'লোকটা বেশী খাটে কেন? খাটলে বেশী মাইনে দাবী করে না কেন? আসলে ওর কোন ব্যক্তিত্ব নেই। ব্যক্তিত্বহীন পুরুষদের মরাই ভাল।'

'কণিকা বলছিলো, শুনে গেলাম। ওদের কথায় নাক গলানো তো উচিত না।'

মা যদিও মুখে একথা বললো, আমি জানি মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কণিকাদির কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়েছে। দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের কৌতূহল বেশী থাকে। অপরের দুঃখ দুর্দশাব কথা শুনলে সমবেদনার চেয়ে সুখটাই বেশী করে বাজে মনে। বিশেষ কবে সেই অপরটি যদি ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ হয়। অন্তত আমার তো সেবকমই ধারণা।

পরদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই কীসের এক আকর্ষণ আমাকে বিব্রত করতে শুরু করলো। বারংবার মনে হতে লাগলো, অমরেশবাবু আমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। এক ধরনের সুখ আছে যা মনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে টানতে থাকে। আমি নিজেকে শক্ত কবে নিতে চেষ্টা করছিলাম। কণিকাদির অনুপস্থিতিতে ওদের বাড়িতে যাওয়া আমার হয়তো উচিত না। পাঁচজনে পাঁচ কথা ভাবতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগলো, সবার কথা ভাবতে গেলে নিজের কথা ভাবা যায় না। মানুষ তো শুধুমাত্র অপরের জন্যে ভাববে বলেই এই সংসারে জন্মায় না। বাবা চিরদিন নিজের কথাই ভেবে গেলেন। নিজের দুঃখটাকেই আ-মরণ বড় করে ভাবলেন। কবে কোথায় কী করেছিলেন, জীবনে কতটা সুখ পেয়েছিলেন, তারই হিসেব করতে করতে একদিন মরে গেলেন। মরে গিয়ে বাঁচলেন তিনি। কিন্তু যারা মরতে পারছে না, তারা কি আ-জীবন দুঃখের বোঝা বয়েই বেড়াবে? এভাবে জীবনধারণের কি অর্থ থাকতে পারে? দাদা নিজের কথাই ভাবছে শুধু। যতদিন ভাল লাগবে, ততদিন সংসারের

কথা চিন্তা না করে ঠিক মদের পয়সা জুগিয়ে যাবে। তারপর একদিন যদি মদ খেতে ভাল না লাগে, ছেড়ে দেবে। নিজের কথা ভেবেই ছেড়ে দেবে। মা যে দিবারাত্র টাকার কথা চিন্তা করছে, আমার এখন বিশ্বাস, সেটাও এক ধরনের স্বার্থপরতা। টাকা দিয়ে আমার বা দাদার জন্যে যে সুখ কিনবে এমন কোন সুস্পষ্ট ইচ্ছা হয়তো মার মনে নেই। টাকা পাওয়াটাই বড় কথা, তার ব্যবহার না। এও তো এক ধরনের নেশা। আসল কথা, মানুষ হচ্ছে নেশার দাস।

আকর্ষণটা ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে। ঘরের মধ্যে বসে থাকা অসহ্য ঠেকছে। পাশের বাড়িতে কে কোথায় উনুনে ধোঁয়া দিয়েছে, রাশি রাশি ধোঁয়া এসে ঘরে ঢুকছে। হয়তো রোজই ঢোকে। আজ মনে হচ্ছে, ধোঁয়ায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বিশুদ্ধ বাতাস-ভরা এক জগতের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠলাম।

বেরোতে যাব, মা এসে সামনে দাঁড়ালো। বললাম, 'একটু ঘুরে আসি।'

মা প্রশ্ন করলো, 'কোথায় যাবি ? ও বাড়িতে ?'

'যাই, একটু ঘুরে আসি। অমরেশবাবু বলছিলেন, উনি নাকি একটা টিউশানির ব্যবস্থা করে দেবেন। সন্ধ্যের দিকে তো বসেই থাকি, যদি দুটো পয়সা রোজগার হয়।'

'না।'

'না কেন ?'

'দীপু যা রোজগার করছে, তাতেই সংসার চলে যাবে। না চলে, তখন দেখা যাবে।'

বিরক্ত ভাবে বললাম, 'আজকাল মেয়েরা অফিসে চাকরি করে।'

'যারা করে তারা করে, তুই করবি না।'

ইচ্ছে করলে মার আদেশ অমান্য করা যেত। আমি সে পথে গেলাম না। বললাম, 'তোমার ইচ্ছে না থাকলে টিউশানি করবো

না। এমনি খানিকটা গল্প করে আসি। ভদ্রলোক বেশ গল্প করতে পারেন।'

মা কি ভেবে বললো, 'বেশী দেরি করিস না। দীপুও আজকাল রাত করে বাড়ি ফেরে, একা একা সময় কাটে না আমার।'

'বেশী দেরি করবো না।' বলে তাড়াতাড়ি রাস্তায় পা দিলাম। আমি মার কাছ থেকে পালিয়ে আসতে চাইছিলাম। কিছুক্ষণ আগে মাকে কত অন্য রকম মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, শুধু টাকা টাকা করেই মরছে মা। আর সেই মা কিনা স্পষ্টভাবে বললো, আমাকে টাকা রোজগারের চিন্তা করতে হবে না। মানুষ যে কি বিচিত্র প্রাণী। কখন যে কী করে, কী বলে, বোঝাই যায় না।

অমরেশবাবু যেন আমার অপেক্ষায় বসে ছিলেন। আমি ঘরে ঢুকতেই উনি শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। 'এসো এসো।' অমরেশবাবুর ব্যবহারও কম বিচিত্র না। আগে মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক উত্তাপ বিহীন মানুষ। এখন মনে হতে লাগলো, অমরেশবাবুর মধ্যে যে প্রাণ রয়েছে যত্নের অভাবে সেই প্রাণ ঝিমিয়ে পড়েছিল, সামান্য একটু উষ্ণ স্পর্শে সে কেমন জেগে উঠলো।

ঘরের দৃশ্য মোটামুটি ভাবে কালকের মতই। নীল বাতি জ্বলছে। ঘরের কোণে খাট। সুন্দর কভার দিয়ে ঢাকা। সামনে চেয়ার। টি-পয়টা খাটের সামনেই রয়েছে। কিন্তু তার ওপর গ্লাস কিংবা বোতল নেই।

আমি চেয়ারে বসতে উনি খাটের ওপর বসলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দুজনে। দুজনেই হয়তো কথা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এক সময় উনি বললেন, 'কাল খুব চিন্তা হয়েছিল তোমার জন্যে।'

'কেন?'

'বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল, তোমাকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। কথায় কথায় সময় যে কীভাবে কেটে গেল।'

'এটুকু পথ, আমার একটুও ভয় করেনি।'

'তুমি তো দেখছি ভীষণ সাহসী মেয়ে।' বলে উনি শব্দ করে হেসে উঠলেন।

আমিও হেসে উঠলাম। হাসতে কত ভাল লাগে, অথচ সেই হাসিটাই ভুলে গিয়েছিলাম। খুশী মনে বললাম, 'আপনার সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগে বলেই এলাম। আজ সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল, কখন সন্ধ্যে হবে, কখন আপনার কাছে আসবো।'

অমরেশবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'তুমি খুব সরল।'

'এতে সরলতার কি দেখলেন। যা মনে হচ্ছিল তা-ই বললাম।'

'যা মনে হয় সবাই তা বলে না।'

আমি খুব জোরে হেসে উঠলাম। হাসি থামিয়ে বললাম, 'হাসতে ইচ্ছে করছিল তা-ই হাসলাম।'

অমরেশবাবুও হেসে ফেললেন, 'তুমি শুধু সরলই না, তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ না হলে কি মানুষ হাসে না। আমি অনেক বুড়ো মানুষকে দেখেছি যাঁরা আমার চেয়েও বেশী হাসেন। আমি এক ভদ্রলোককে চিনি, যিনি কথা বলার আগেই হাসতে থাকেন, অথচ সব সময় যে খুব একটা হাসির কথা বলেন তা না। হাসিটা হয়তো তাঁর একটা রোগ।'

অমরেশবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ রোগ যেন তোমার বরাবর থাকে দোলন।'

অমরেশবাবুর মুখে নিজের নাম শুনে সহসা আমার মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। আমি মনে করি, আমার মনে এক ধরনের দুর্বলতা জন্ম নিতে শুরু করেছে। দুর্বলতা ছাড়া কী আর বলবো। অমরেশবাবু যুবক নন, বলতে গেলে প্রৌঢ়ই তিনি, কণিকাদির স্বামী, সবদিক দিয়েই গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁর মুখে নিজের নাম শুনে যদি শরীরে

বা মনে কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, ধরে নিতে হবে সেটা নিতান্তই আমার মনোবিকার।

'কণিকাদির চিঠি পেয়েছেন?'

'চিঠি আসেনি এখনও। পৌঁছেই টেলিগ্রাম করেছিল বেণু।'

'বেণু কে?'

'যে ছেলেটি কণিকাকে নিয়ে গেছে, আমার অফিসেই কাজ করে।'

'সে তো অরিন্দম।'

'অরিন্দমের ডাক নাম বেণু। তুমি তাকে চিনলে কি করে?'

'কণিকাদি আলাপ করিয়ে দিয়েছিল একদিন।'

'কণিকা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল?' আমার কথার সারমর্ম বুঝতে যেন দেরি হচ্ছিল অমরেশবাবুর। উনি আবার বললেন, 'মানে, তুমি যেদিন এসেছিলে বেণু এ বাড়িতেই ছিল?'

'হ্যাঁ, আপনার ঘরে বসে খাতাপত্র দেখছিল।'

'কী আশ্চর্য!' যদিও অমরেশবাবু কথাটা খুব মৃদু স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন, আমি শুনতে পেলাম। পেয়ে বিস্মিত হলাম। আমার সঙ্গে অরিন্দমের আলাপ করিয়ে দেওয়া নিয়ে অমরেশবাবু এত চিন্তা করছেন কেন?

অমরেশবাবু হঠাৎ হেসে ফেললেন, 'ভাবছো সামান্য একটা বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন, তাই না? আসলে ঠিক মাথা ঘামাচ্ছি না। তোমার কথা শুনে কী রকম খটকা লাগলো। কণিকা সাধারণত কারও সঙ্গে অরিন্দমের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে চায় না।'

নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

'ও হয়তো মনে করে এতে অরিন্দমের মন বিক্ষিপ্ত হতে পারে।'

'উনি কি কোন গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকেন? মানে, অরিন্দমবাবু?'

'না। গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে আমাদের ব্যবসার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তবে ?'

অমরেশবাবু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'কোথা দিয়ে শুরু করবো, কী ভাবে শুরু করবো বুঝতে পারছি না। অরিন্দম আমার দূর-সম্পর্কের ভাই হয়। ওরা খুব গরীব। খুব ছেলে বয়সে অরিন্দমের বাবা মারা যান। এক রকম পরের আশ্রয়েই মানুষ হয় অরিন্দম। লেখা পড়া খুব একটা শিখতে পারেনি। কিন্তু মূর্খ বলতে যা বোঝায় ও তা না। বরং অনেক গ্র্যাজুয়েটের থেকে ওর জ্ঞান গরিমা বেশী। ছেলেটির আরও দুটো মস্ত গুণ আছে। ও খুব অনেষ্ট এবং পরিশ্রমী। কণিকা ওকে খুব স্নেহ করে—'

মনে মনে মুখ ভেংচালাম, স্নেহ না ছাই! তলে তলে—

'অরিন্দমও খুব সমীহ করে চলে কণিকাকে—'

মনে মনে—তুমি চোখে ঠুলি এঁটে চলো, দেখতে পাও না। নাকি সব বোঝ, ন্যাকা সেজে থাকো।

'ব্যবসার প্রথম দিকে খুব খাটতে হতো আমাকে। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। ছেলেমেয়েরা জন্মায়নি তখনও। কণিকাকে একা একা থাকতে হতো। সেই সময় অরিন্দম খুব উপকার করেছে। সর্বক্ষণ কণিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো, ফাইফরমাস খাটতো।'

'তাই বুঝি আপনি অরিন্দমবাবুকে এত ভালবাসেন ?'

অমরেশবাবু একটুক্ষণ চুপ থেকে উত্তর দিলেন, 'ভাল যে খুব একটা বাসি তা না। ওকে আমার প্রয়োজন। বিশ্বস্ত লোক পাওয়া কঠিন। ভাল আমি হয়তো কাউকেই বাসি না। বাসতে পারি না। এটাই হয়তো আমার জীবনের মস্ত অভিশাপ।'

'ভালবাসা পাননি বলেই হয়তো ভালবাসতে পারেন না।' ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা। অমরেশবাবু আমার সমবয়সী

না। অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে যা বোঝায় তা-ও না। তাঁকে এ ধরনের কথা বলাটা অন্যায় হয়ে গেছে। ভদ্রলোক কি না কি ভাবলেন।

উনি খুব শান্তভাবে বললেন, 'সত্যি সত্যি আমি ভালবাসা পাইনি দোলন।' অমরেশবাবু যেন চাপা আর্তনাদ করে উঠলেন।

কোথায় একজন মানুষের বেদনায় দুঃখ পাব, না আমি মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে বললাম, 'এতদিন ভালবাসা পাননি বলেই যে সারা জীবন পাবেন না, তার মানে নেই। হয়তো ভালবাসা আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, সুযোগ-সুবিধামত সামনে এসে দাঁড়াবে।'

অমরেশবাবু গভীর আগ্রহে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

কী বিচিত্র এই দুনিয়ার মানুষ! কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অমরেশবাবুকে কত শক্তিশালী এবং কৃতী মানুষ বলে মনে হয়েছিল। এখন মনে হতে লাগল, উনি যে শুধুমাত্র একজন অসহায় ব্যক্তি তা-ই নন, উনি একজন সত্যিকারের বিভ্রান্ত মানুষ। ভালবাসা সম্বন্ধে যাঁর স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। যে পুরুষমানুষ তার স্ত্রীকে অপর পুরুষের হাতে ছেড়ে দেয়, হয় সে পুরুষত্বহীন, না হয় হৃদয়হীন।

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে চেষ্টা করবো দোলন। বিশ্বাস রাখবো, একদিন না একদিন কেউ না কেউ আমাকে ভালবাসবেই।'

যথাসম্ভব কণ্ঠস্বর কোমল করে বললাম, 'আপনার এই বিশ্বাস ফলবেই ফলবে। আমার কি মনে হয় জানেন, কেউ যদি সমস্ত মন দিয়ে কিছু চায় সে তা পায়।'

'তুমি শুধু যে সরল তা-ই না, তুমি একজন বিচক্ষণ মহিলাও।'

'আপনি কিন্তু বলেছিলেন, আমি ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষও বিচক্ষণ হতে পারে দোলন। তুমি সেই বিচক্ষণ ছেলেমানুষ।'

ছেলেমানুষের মত খিল খিল করে হেসে উঠলাম। নিজের হাসির শব্দ নিজের কানে অদ্ভুত মিষ্টি শোনাল।

অমরেশবাবু এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘরের বাতিটা অসম্ভব রকমের ক্ষীণ। না হলে তাঁর দৃষ্টির ভাষা আমি খুব সহজেই পড়তে পারতাম। এই মুহূর্তে আমি সেই ভাষা পড়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। কিন্তু উঠে গিয়ে যে বড় বাতিটা জ্বালবো তারও উপায় নেই। অমরেশবাবু ক্রমশ যেরকম বিহ্বল হয়ে পড়ছেন, উনি নির্ঘাৎ উজ্জ্বল আলো দেখলে নেভাতে বলবেন। তখন বিষম বিব্রত বোধ করবো। তার চেয়ে এই ভাল।

অমরেশবাবু আবার বললেন, 'তুমি আর দীপু দুজনেই খুব ভাল। তোমাদের মাও সাংসারিক বলতে যা বোঝায়, তা-ই। সংসার করবো অথচ সংসারী হবো না, এর কোন মানে হয় না।'

'সবাই তো সারাক্ষণ সংসারে ডুবে থাকতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়। দেখতে হয়, যে জলে সাঁতার কাটছি, সে জলটা কী রকম, নোংরা না পরিষ্কার।'

'কিন্তু যে জলে নামলো না, তার সম্বন্ধে এ কথা ওঠে না।'

'আপনি কার কথা বলছেন?'

'কণিকার। ও কোনদিনই সংসারের দিকে নজর দিল না। শুধু নিজের বিষয় চিন্তা করতে করতেই দিন কাটিয়ে দিল। তুমি শুনলে বিস্মিত হবে দোলন, আমাদের পাঁচটি ছেলেমেয়ে শুধুমাত্র চাকর-ঝিয়েদের স্নেহ-মমতায়ই বড় হয়ে উঠলো। মার ভালবাসা যে কী ওরা কেউ বুঝলো না।'

অমরেশবাবুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, 'কিন্তু বাবার ভালবাসা তো ওরা পেয়েছে।'

'তাই বা বলি কি করে। আমি তো সারাক্ষণ কাজ নিয়েই রয়েছি। ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেওয়ার সময় আগে হয়তো সত্যি সত্যি আমার ছিল না। সময়ের অভাবটা এখন অভ্যেসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আমার তুলনায় ওদের আমি ভাল বলবো,

কারণ ওরাই হয়তো এই সংসারে কিছুটা ভালবাসে আমাকে। আমি অফিস থেকে ফিরলে ছুটোপুটি করে কাছে আসে।'

'আপনার কোলে চড়ে গল্প শুনতে চায় না ?'

'তুমি ছেলেবেলায় তোমার বাবার কোলে চড়ে গল্প শুনতে।'

'কি করে জানলেন ?'

'তোমাকে দেখেই বোঝা যায় তুমি খুব গল্প শুনতে ভালবাস।'

'আপনি দেখছি আমার অনেক কথাই জেনে ফেলেছেন।'

অমরেশবাবু কথা বললেন না। হাসলেন। অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম, উনি উসখুস করছেন। কিছু একটা করতে চাইছেন অথচ পারছেন না।

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'আপনাব কিছু একটা খেতে ইচ্ছে করছে।'

উনি চমকে উঠলেন, 'কি খেতে ইচ্ছে করছে বল তো ?'

'মদ।'

অমরেশবাবু বেশ খোলাখুলিভাবে হাসলেন এবার, 'ঠিক ধরেছো। বহুদিনের অভ্যেস। গলাটা কেমন শুকনো শুকনো মনে হয়।'

'শুধু গলা ?'

'বুকটাও।' বলতে বলতে হেসে উঠলেন অমরেশবাবু।

ঘরের দেওয়ালে একটা আলমারি আছে। উঠে গিয়ে সেখান থেকে উনি বোতল এবং গ্লাস বার করলেন।

একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। যদিও খুব মৃদু কিন্তু আমি বেশ অনুভব করতে পারছিলাম গন্ধটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথাও অনুভব করছিলাম, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অমরেশবাবু একঘেঁয়ে জগৎ ছেড়ে ভাল-লাগা অন্য জগতের মধ্যে প্রবেশ করবেন। যদিও মদ আমি খাইনি কোনদিন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হতে লাগলো, আমার তুলনায় অমরেশবাবু অনেক ভাগ্যবান, যেহেতু সেই খুশির জগৎকে আমি উপলব্ধি করতে পারবো না।

ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন উনি। যেন দারুণ সুস্বাদু কোন পানীয় গলাধঃকরণ করছেন।

'আমাকে একটু দেবেন।' কথাটা বলে ফেলেই বিষম অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠলাম, 'চেখে দেখতাম।'

একটু ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ালেন অমরেশবাবু। আলমারি খুলে একটা গ্লাস বার করলেন।

গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'প্রথম দিনে এটুকুই খাও।'

আমি এক চুমুকে সমস্তটা খেয়ে ফেললাম।

'তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, মানুষ মদ খায় কেন, দুঃখ ভুলতে?'

আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসছে। অমরেশবাবু যে কথাটা বললেন, কানে গেল কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশ করলো না। ফিক করে হেসে ফেললাম।

উনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'তুমি খেলে কেন দোলন?'

'বারে আমার বুঝি দুঃখ নেই?' চোখ বুজে বুজে আসছিল। কষ্ট করে চোখ মেলে অমরেশবাবুকে দেখতে চেষ্টা করছিলাম। 'দুঃখ সবারই আছে। পাথরেরও তো তাপ-উত্তাপ থাকে। দেখেন না, গ্রীষ্মের সময় কেমন গরম হয়ে ওঠে, আর শীতের সময় বিলকুল ঠাণ্ডা।' খিল খিল করে হেসে উঠলাম, যেন দারুণ মজার কথা বলে ফেলেছি।

হাসিটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। চেয়ারে বসে থাকা রীতিমত দুষ্কর হয়ে উঠছে। অমরেশবাবু আমার অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। আমার হাত ধরে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'তুমি খাটের ওপর এসে আরাম করে বসো। দরকার হলে শুতেও পার। আমাকে দিয়ে তোমার কোন ভয় নেই দোলন।'

মনে মনে ভেংচি কেটে বললাম, মরণ! জলের সাপকে সর্দির ভয় দেখাচ্ছো!

অমরেশবাবু খুব রসিয়ে রসিয়ে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। লোকটা কী অসম্ভব রকমের মন্থর প্রকৃতির। ভাল লাগে না।

হাত বাড়িয়ে বললাম, 'আর একটু দিন তো।'

উনি বললেন, 'আর থাক।'

'না, দিন।' অনেকটা আদেশের মত শোনালো কথাটা।

অমরেশবাবু আমার আজ্ঞা পালন করলেন।

এক চুমুকেই সবটা খেয়ে ফেললাম। নিজেকে সম্রাজ্ঞীর মত মনে হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে সসাগরা এই পৃথিবীর অধিশ্বরী আমি—দোলন। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত নিজেকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই বাড়ির উপযুক্ত বাসিন্দা আমি কোনদিনও হতে পারবো না। এখন মনে হতে লাগলো, এই বাড়িটা, এতগুলো ঘর, গেটের সামনে বসে-থাকা বিপুলাকায় হিন্দুস্থানী দরোয়ান, সুদৃশ দাঁড়ে বসে-থাকা কাকাতুয়াটা, আমার পাশে বসে আছেন যে মানুষটি—সবাই আমার তুলনায় কত নগণ্য।

অমরেশবাবু আমার পাশে সরে এসে নীচু কণ্ঠে বললেন, 'কেমন লাগছে দোলন?'

'ভাল, খুব ভাল।' কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ ছলছল করে উঠলো। বাবা মারা যাওয়ার পর একদিনও এত ভাল লাগেনি। বাবার মৃত্যুতে যে আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম, তা না। তবু কেমন এক অবসাদ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। পড়াশুনোয় উৎসাহ পাই না। আগে কলেজে যেতে ভাল লাগতো, মাঝে মাঝে হেঁটে আসতাম, আকাশের মেঘ দেখতে দেখতে বরিশালের বাড়িটা চোখের সামনে ভেসে উঠতো যখন তখন, কিংবা নদীর পাড়ে সারি সারি ঝাউ গাছ, তাদের মাথার ওপর দিয়ে সর সর করে বয়ে যাওয়া বাতাস আমার কানে কানে বহু পরিচিত একটা সুর বয়ে নিয়ে আসতো। ইদানীং সব কিছু হারিয়ে গিয়েছিল। ফ্রক-পরা ছোট্ট মেয়ে দোলনও। আবার সবাই ভীড় করে ফিরে এল। ফিরে এল

সেই পাখিটা, যে কিনা একদিন শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর নেচে নেচে জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত আমাকে শুনিয়েছিল।

'সেই লোকটা একটুও ভাল না। বরং খুব বাজে।'

'কার কথা বলছো দোলন?' অমরেশবাবু আমার মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসেছেন। তাঁর গরম নিঃশ্বাস আমার গালে এসে লাগছে।

'সেই লোকটা, কী যেন নাম?' কিছুতেই ওর নাম মনে করতে পারছিলাম না। অথচ বিষম চেনা নাম। এত চেনা যে কী বলবো!

অমরেশবাবু একটা হাত আমার কাঁধে তুলে দিয়েছেন। কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সেই লোক?'

হঠাৎ দারুণ জোরে হেসে উঠলাম। অমরেশবাবুর হাতটা কাঁধ থেকে পড়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় উনি প্রশ্ন করলেন, 'কি হলো?'

মনে মনে বললাম, এত সাহস তোমার, সামান্য একটু হাসিও সহ্য হয় না। এ না হলে বৌ পালায়! মুখে বললাম, 'আপনার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কান সুর-সুর করে উঠলো।'

অমরেশবাবু মুখ সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'তোমাকে যত দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। তুমি যে কী, কোন পথে তোমার চলাফেরা বুঝি না।'

তুমি বুঝবে কি হাঁদারাম, জিজ্ঞেস কর তোমার বৌয়ের নাগরকে, সে যদি কুলকিনারা পায় কিছু।

'কথা বলছো না কেন দোলন?'

'আমি একটু শোব।' বলতে বলতে আমি শুয়ে পড়লাম।

অমরেশবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন, হাত দিয়ে তাঁকে বাধা দিলাম। ইচ্ছে করেই তাঁর গায়ে গা লাগিয়ে শুলাম। এভাবে শুয়ে থাকতে আমার ভাল লাগছে কিনা অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম। অমরেশ-বাবুর সঙ্গে গায়ে গা দিয়ে শুয়ে থাকতে।

একটুক্ষণ শুয়ে থাকার পর ধড়মড় করে উঠে বসলাম। অমরেশবাবু সসব্যস্ত উঠে দাঁড়ালেন। আতঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কি হলো ?'

'আর একটু দিন তো।'

উনি আশ্বস্ত হলেন, 'আমি ভাবলাম কিনা কি। হয়তো শরীর খারাপ লাগছে। প্রথম দিন কিনা।'

'প্রথম দিনেই লক্ষ্যভেদ করে ফেললাম কি বলেন।' এতক্ষণ পর্যন্ত যা হোক কিছুটা সমীহ করে কথা বলছিলাম ভদ্রলোককে। এখন তাঁকে প্রচণ্ড গালাগাল দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি দারুণ দুর্দশাগ্রস্থ কোন মেয়ে এবং আমার এই দুর্দশার জন্যে বিশ্ব সংসারে কেউ যদি দায়ী হয়ে থাকে, সে এই অপদার্থ মানুষটি। জানি না, সহসা আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে বইতে শুরু করলো কেন। মনের ভাব সংযত করে বললাম, 'আপনি আর খাচ্ছেন না যে।'

'এই তো খাচ্ছি' বলে উনি গ্লাস খালি করে ফেললেন।

বললাম, 'সাবাস!'

উনি আবার গ্লাসে মদ ঢালতে লাগলেন। আমি আড়চোখে তাঁকে দেখছিলাম। অমরেশবাবুর, মুখটা এখন কী লম্বাটে ধরনের দেখাচ্ছে। ভদ্রলোকের রং বেশ ফর্সা। নিশ্চয়ই এতক্ষণে সেই রংয়ে লালের ছোঁয়া লেগেছে। আধো অন্ধকারের আবরণ ছিন্ন করে প্রকট আলোর মাঝে অমরেশবাবুকে দেখার তীব্র বাসনা আমার মধ্যে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠলো। বললাম, 'বড় বাতিটা জ্বালুন তো। ভীষণ অন্ধকার লাগছে।'

'অন্ধকারই তো ভাল।'

উঠে আলো জ্বালতে যাচ্ছিলাম, অমরেশবাবু দু হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আলো জ্বেলো না দোলন, প্লীজ।'

টাল সামলাতে না পেরে আমি অমরেশবাবুর গায়ের ওপর পড়ে গেলাম। আবার যে সোজা হয়ে বসবো কিংবা বসার চেষ্টা

করবো, পারলাম না। বিশ্রী এক শৈথিল্য আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

অমরেশবাবু খাটের ওপর বসে আছেন। আমি তাঁর বুকে মাথা রেখে বসে আছি। বসে আছি ঠিক না, পড়ে আছি। আমার একটা কান অমরেশবাবুর বুকেব ওপর চাপা রয়েছে। ক্রমাগত একটা শব্দ কানে আসছে। ধুক ধুক ধুক। কি বলছে অমরেশবাবুর হৃদপিণ্ড? এই মুহূর্তে আমি কি অন্য একটা হৃদপিণ্ডের শব্দ শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম?

হৃদয়ের কথা কি কানে শোনা যায়?

অমরেশবাবুর দুই হাত ক্রমশই আমার কোমরে চেপে বসছে। তাঁর মুখ নীচু হয়ে আসছে। আমার ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট লাগিয়ে উনি ডাকলেন, 'দোলন।'

'উঁ।'

'বাগ করেছো দোলন?'

'না।'

উনি গভীবভাবে আমাকে চুমু খেলেন। আমি দু হাত দিয়ে ওঁব গলা জড়িযে ধরলাম।

সব কথাই আপনাকে বলবো। বলবো বলেই এলাম। মান সম্মান লজ্জা ভয় সঙ্কোচ সব ত্যাগ করেই বলবো আমার কথা। আপনি দয়া করে শুনুন। জানি না আপনার ভাল লাগছে কিনা শুনতে। কিন্তু আমার খুব ভাল লাগছে বলতে। বুকের পরতে পরতে যে ব্যথা জমে রয়েছে, সেই ব্যথা অনেক হাল্কা হয়ে যাচ্ছে।

আমি জানি, আপনি একজন সত্যিকারের সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ। আমার কথা আপনি বুঝবেন—বুঝতে চেষ্টা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

তাই তো এলাম। সব কথা বলবো বলেই এলাম।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত অনেকক্ষণ পড়ে রইলাম। অমরেশবাবু আমার পাশে বসে আছেন। তাঁর একটা হাত আমার বুকের ওপর আলতোভাবে ছড়ানো। যেন নেহাৎ অসাবধানতাবশতই হাতটা সেখানে এসে পড়েছে। ভদ্রলোক সীমাহীন ভীতু প্রকৃতির। আমার মেদ বর্জিত সুঠাম দেহ, চওড়া কাঁধ, দীর্ঘ গ্রীবা, উন্নত বুক, আমি জানি, যে কোন পুরুষমানুষেরই কামনার বস্তু। অবিশ্যি আমার পাশে বসে-থাকা লোকটি যদি যথার্থ পুরুষমানুষ হয়ে থাকেন। আগে থেকেই শাড়ির আঁচল খাটের পাশে লুটোচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরেই মনে হচ্ছিল, শাড়িটা একটা অতিরিক্ত বোঝার মত আমার অঙ্গে লেগে রয়েছে। এই মুহূর্তে আমার কাছে এর কোন মূল্য নেই।

অতর্কিতে আমি উঠে বসলাম।

'কি হলো?' অস্ফুট স্বরে বললেন অমরেশবাবু।

'বড্ড গরম লাগছে। ফ্যানটা অন করে দিন তো।' আদেশের সুরে বললাম।

'এই শীতে ফ্যান?'

'আজ মোটেই শীত না। এই দেখুন, আমি কিরকম ঘেমে গেছি।'

অমরেশবাবু আমার শরীরে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সত্যিই তো! দাঁড়াও তোমার ব্লাউজটা খুলে দিই।' বলতে বলতে উনি আমার ব্লাউজটা খুলে ফেললেন।

নিজের হাতে ব্রা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললাম। এক আদিম উল্লাস আমার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। পাকে পাকে অসহায় শিকারকে জড়িয়ে পিষ্ট করার উল্লাস।

অমরেশবাবু আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। আমিও অপলক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছি।

একসময় বললাম, 'কেউ যদি এসে পড়ে?'

'ওপরে আসার দরজা আগেই বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে।'

'আমি মোটেই ঘুমোচ্ছিলাম না। আপনি যখন উঠে গিয়েছিলেন, আমি বুঝতে পেরেছিলাম।'

আমি আবার শুয়ে পড়লাম। ছেলেবেলায় একবার স্টিমারে দেশে গিয়েছিলাম। পথে ঝড় উঠেছিল। স্টিমার খুব তুলছিল। বিষম ভয় পেয়েছিলাম। বাবা সেদিন আমার ছোট্ট শরীরটাকে তু হাত দিয়ে বুকের সঙ্গে লেপটে রেখেছিলেন। মুখে বলছিলেন, ভয় নেই। আজও সমস্ত তুনিয়া তুলছে। অমরেশবাবু আমাকে জড়িয়ে শুয়ে আছেন। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই অমরেশবাবু, তুমি যেন আবার বলে বসো না, ভয় নেই।

সব ভয় ভাবনা থেকে আমি অনেক দূরে সরে গেছি এখন।

অমরেশবাবুকে যত নিরীহ প্রকৃতির বলে মনে হয়েছিল, সত্যি সত্যি উনি হয়তো ততটা নন। উনি ক্রমশই তুরন্ত হয়ে উঠছিলেন। নিজের বুক দিয়ে উনি আমার বুক ঢেকে দিলেন। ক্রমাগত আমাকে চুমু খেতে লাগলেন। কপালে, ঠোঁটে, গালে। আমি গভীর ভাবে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করছিলাম। দাদা যে বলেছিল, বড় লোকদেব গা দিয়ে এক বিচিত্র সৌরভ বেরোয়, আমি তার সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চাইছিলাম। কিন্তু অমরেশবাবুর গায়ে উৎকট মদের গন্ধ ছাড়া অন্য কোন গন্ধই ছিল না। মদ জিনিসটা কিন্তু বেশ। রহস্যময়ী নারীব মত। যতক্ষণ বোতলে থাকে বেশ মন মাতানো গন্ধ ছড়ায়। পেটে পড়লেই বিটকেল গন্ধ!

অমরেশবাবু ক্রমশই বড্ড বেশী তুরন্ত হয়ে উঠছেন। আর একদিনও এক পুরুষ মানুষের সঙ্গে আমি এক বিছানায় শুয়েছিলাম। সেদিন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। অসহ্য সুখের জ্বালায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে সুখ কিংবা তুঃখ কিছুই ছিল না। ছিল অপরিসীম শূন্যতাবোধ।

অমরেশবাবু ফিস ফিস করে বললেন, 'দোলন তুমি কত ভাল।'

আমি হেসে উঠলাম।

উনি বললেন, 'হাসলে কেন দোলন ?'

'হাসবো না! সামান্য এই কথাটা আবিষ্কার করতে আপনার এতক্ষণ লাগলো ?'

উনি কথা বললেন না। আমার ওপর ক্রমশই নিজেকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। আমাব দম বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাৎ পা পিছলে যেন একটা নোংরা নর্দমায় পড়ে গেছি। আমার সর্বাঙ্গে থক-থকে কাদা!

ত্বরিত গতিতে উঠে বসলাম। অমরেশবাবু ছিটকে পড়ে গেলেন। চাপা অর্তনাদ করে উঠলেন 'কি হলো ?'

'বাড়ি যাব।' সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেল।

অমরেশবাবু খাটের ওপব বসে আছেন। বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম, 'একটা বড় আয়না রাখতে পারেন না।'

'আয়না দিয়ে কি হবে ?'

'আয়না দিয়ে কি হয়! মানুষ নিজেকে দেখে। আমি এখন নিজেকে দেখতে চাই।'

'পাশের ঘরে আয়না আছে।'

'থাক।' ক্ষিপ্রহাতে ছড়ানো জামা কাপড় পরে নিলাম। হাত দিয়ে যথাসম্ভব চুল ঠিক করে ফেললাম।

ঘরের বাইরে পা দিতে যাব, অমরেশবাবুর কথা কানে এল, 'আবার এসো দোলন। যেদিন তোমার ইচ্ছে হয় এসো।'

'কণিকাদিরা ফিরে এলেও আসবো ?'

উনি ইতস্তত করছিলেন। হাসতে হাসতে বললাম, 'দরকার বুঝলে আপনার সঙ্গে অফিসে দেখা করবো। বা অন্য কোন জায়গায়। অফিসের ফোন নম্বরটা আর একদিন এসে নিয়ে যাব। খুব ভাল লাগলো আজ। ধন্যবাদ।'

আর দাঁড়ালাম না।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছি, মনে পড়লো সেই অভদ্র কাকাতুয়াটা আজ আমাকে দেখে বিন্দুমাত্র শব্দও করলো না তো। ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। ও চোখ বুজে ঝিমোচ্ছিল। বললাম, 'কি রে, তাকিয়ে দেখবি না?' ও তাকালো না, যেমন চোখ বুজে বসেছিল সেভাবেই বসে রইলো। বুঝলাম, শত চেষ্টা করলেও আজ ওর চোখ খোলাতে পারবো না।

যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম ভাঙ্গানো যায় না।

গেটের মুখে সেই লোকটা এখনও পাহারা দিচ্ছে, যাতে না গৃহস্বামীব কোন জিনিষ চুরি যায়। ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, 'তুমি যে বলেছিলে নিম ফল মিষ্টি হয়, কথাটা ভুল। মৌমাছিরা ভুল করে ভীড় করে।' ও কি বুঝলো জানি না, তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। অহেতুক একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বিভ্রান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। বললাম, 'বাইরে হিম পড়ছে, তুমি বরং ভেতরে গিয়ে বসো।'

লোকটা গম্ভীর গলায় বললো, 'ভেতরে বসার হুকুম নেই।'

'সমস্ত রাত তুমি বাইরে বসে থাকবে?'

ও উত্তর দিল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কণিকাদির কথা মনে পড়ে গেল। একদিন কণিকাদি একজন মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল। অন্যায়ভাবে তাকে খাটিয়ে নেওয়া হয় বলে অনুযোগ করেছিল। কিন্তু এই যে একটা লোক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গরম জামা গায়ে না দিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে রয়েছে, কই তার জন্যে তো কোন প্রতিবাদ জানাতে যায়নি সে। ইচ্ছে করলে জানাতে পারতো। সে ইচ্ছেটাই করলো না তার।

কণিকাদি যে শুধুমাত্র একজন স্বার্থপর মেয়েমানুষ তাই না, হৃদয়হীন বলতে যা বোঝায় তাই। সঙ্গের সাকরেদটিও জুটেছে চমৎকার। মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ কোথাকার! কিছুক্ষণ আগে অরিন্দমের নাম মনে করতে পারছিলাম না। এখন ওর নামটা

বারংবার মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগলাম। অরিন্দম, অরিন্দম। তুমি শুধুমাত্র কাপুরুষই নও, তুমি একজন সত্যিকারের হীন-চরিত্রের মানুষ, যার তুলনা তুমি নিজেই। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সর্বক্ষণ ওকে গালাগাল দিতে লাগলাম। খুব ভাল লাগছিল। নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বেশ লাগে। নিজের সঙ্গে কত কথা বলা যায়। দিনের আলোয় যে কথা বলা যায় না, রাতের অন্ধকারে কত সহজে সে কথা বলা যায়।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমার লজ্জা নেই দোলন?'

ও উত্তর দিল, 'কি করেছি যে লজ্জা?'

'এই যে অমরেশবাবুর কাছে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করলে?'

'আমি তো নিজেকে প্রকাশ করিনি।'

'নিজ বলতে তুমি কি বোঝ?'

'আমার মন।'

'কিন্তু তোমার শরীর?'

'সেই মুহূর্তে আমি শরীর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

'তা কি সম্ভব!'

'সম্ভব না কেন? মুনি ঋষিরা তো এমন কাজ অহরহ করে থাকেন।'

'তুমি তো মুনি ঋষি না।'

'তাঁরাও মানুষ।'

দোলন খিল-খিল করে হেসে উঠলো। নির্জন রাস্তায় সে-হাসি বড় তীব্র হয়ে কানে বাজলো। ছোট একটা ধমক দিয়ে বললাম, 'চুপ। অত জোরে হেসো না। লোকে সন্দেহ করবে।' দোলন আমার কথা শুনলো। হাসি বন্ধ করে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো। বাড়ি ফিরতে আজ তার তাড়া নেই। বাড়ি বলে যে একটা আশ্রয় রয়েছে সেকথাও ভুলে গেল সে। ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকালো।

আকাশ নেই, তারা নেই। কাল সবকিছু ছিল। মাত্র ঘণ্টা কয়েকের ব্যবধানে আজ সব হারিয়ে গেল।

একটা লোক পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিছুটা গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। আবার আমার পাশাপাশি চলতে লাগলো। ও আমার কাছে আসার চেষ্টা করছে। সাজপোষাকে লোকটা ভদ্রলোকের মতন। ও পান চিবোচ্ছিল। হয়তো কোথা থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছে। নিমন্ত্রণের কথা মনে হতেই মনে হলো আমার দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে। অমরেশবাবুর বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা হয়নি। যদি হতো তাহলে নিশ্চয় আমাকে কিছু খেতে দিতেন। তাঁর বোঝা উচিত ছিল, যাকে তিনি ছেলেমানুষ বলে ভাবেন, তারও ক্ষিধে বলে কিছু একটা থাকতে পারে।

'বেড়াতে যাবেন, ট্যাকসি ডাকবো?'

হঠাৎ দারুণ চমকে উঠলাম। লোকটা যে আমার এত কাছাকাছি সরে এসেছে খেয়াল করিনি। লোকটা নিতান্তই আহাম্মক। যদি আমি রাজী হয়ে যাই, শত মাথা খুঁড়লেও এত রাত্রে ও ট্যাকসি জোগাড় করতে পারবে না এখানে।

বললাম, 'আজ না, আর একদিন।'

ও 'আচ্ছা' বলে হন হন করে এগিয়ে গেল।

লোকটা নির্ঘাৎ আমার থেকেও বেশী মদ গিলেছে। না হলে অমন সুবোধ বালকের মত সুর সুর করে চলে যেত না।

কিছুক্ষণ লোকটার কথা মনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো।

ধরে নেওয়া যাক, আমাদের সামনে দিয়ে একটা খালি ট্যাকসি যাচ্ছিল এবং লোকটা ট্যাকসি থামিয়ে আমাকে ডাকলো, আসুন। ধরে নেওয়া যাক, সেই মুহূর্তে বেড়াতে যাওয়ার স্পৃহা আমার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছিল। এবং এও ধরে নেওয়া যাক, ওর আহ্বানে আমি সাড়া দিয়েছিলাম।

তারপর সেই ট্যাকসি ছুটতে লাগলো। অনেক রেড লাইট

পেরিয়ে, অগণিত মানুষ পেছনে ফেলে সামনের দিকে ছুটে চলেছি আমরা দুজনে। আমি এবং পান চিবোনোরত বাবুটি। ও একসময় আমার হাত ধরলো। ধরাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি কি নীরব ভৎর্সনায় মুখরিত হয়ে উঠতাম, বলতে চাইতাম, ছি, আপনি না ভদ্রলোক, আপনার ব্যবহার আর একটু বেশী ভদ্রচিত হওয়া উচিত ছিল ; নাকি ট্যাকসি থামিয়ে নেমে পড়তাম। বা এমনও তো হতে পারে, আমি এসব কিছুই করতাম না। শুধু নিরপেক্ষ দর্শকের মত দূর থেকে দেখতাম, আমার এই যৌবন-পুষ্ট দেহটাকে নিয়ে লোকটা কী করে, যেমন দেখেছিলাম কিছুক্ষণ আগে এক অপরিসর বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

আর একটু এগোলেই আমাদের বাড়ি। এতক্ষণ পর্যন্ত একবারও বাড়ির কথা চিন্তা করিনি। এখন মনে হতে লাগলো, বেশ রাত হয়ে গেছে। যদিও মা জানে, অমরেশবাবুর ওখানেই আছি, তবু আর একটু তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত ছিল। কে জানে দাদা এখনও ফিরেছে কিনা। একা একা মার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে। মুখ ফুটে বলেছেও সে কথা। শুনেও শুনিনি। না শোনাই ভাল। শুনতে গেলেই যত ঝুট ঝামেলা। মার ইচ্ছেমত আজ যদি সমস্ত সন্ধ্যেটা বাড়িতে বসে থাকতাম, বসে বসে রাজ্যের ধোঁয়া বুক ভরে নিতাম, কী স্বর্গসুখ হতো! এই যে একটা জগৎ এত কাছাকাছি ছিল, হাত বাড়ালেই যাকে স্পর্শ করা যায়, সেই জগৎটা তো চিরদিনই চোখের আড়ালে থেকে যেত।

বাইরের দরজা খোলা। এত রাত্রে দরজা খোলা থাকার কথা না। মা সাবধানী মানুষ, সব সময়ই দরজা বন্ধ করে রাখে। বুকটা ধড়াস করে উঠলো। তবে কী মার শরীর খারাপ টারাপ কিছু? সঙ্গে সঙ্গে বেজায় হাসি পেয়ে গেল। যে মেয়ে একদা প্রিয় বাবার অন্তিম ইচ্ছা, তুই আমাকে একটু কোলে নে, সেই ইচ্ছাটা পূরণ করলো না—করতে চাইলো না, সে কিনা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে

মার কথা চিন্তা করে, মার শরীর সুস্থ আছে কিনা ভেবে—বেজায় গডমিল ব্যাপার। হাসি পাওয়ার মতই।

হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছিলাম। কোন মতে সামলে নিলাম। চাপা স্বরে আর্তনাদ করে উঠলাম, 'কে ?'

'এত রাত্তিবে কোথা .থকে ফিবছিস ? ভেবেছিস যা ইচ্ছে করে বেড়াবি ?'

অন্ধকারেব মধ্যে দাদা আমার একটা হাত চেপে ধরলো। হাত টনটন করে উঠলো। হাত ছাড়াবাব চেষ্টা কবাতে দাদা আবার হিস হিস করে উঠলো, 'কত টাকা রোজগাব করলি, দে।'

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'মা!'

বাতি জ্বলে উঠলো। মা দাঁড়িয়ে। দারুণ উত্তেজনায় আমার সর্ব শরীর কাঁপছিল। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম।

মা আমাকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে এল। দাদার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দাদার াদকে তাকিয়ে আছি আমি। একী চেহারা হয়েছে দাদার! মাথার চুল উস্কোখুস্কো। চোখ দুটো অসম্ভব লাল, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ওর এই ভয়ঙ্কর রূপ কোন্দিন দেখিনি।

'তুই ওর গায়ে হাত দিলি দীপু! যে ভাই বোনের বিয়ে ।দতে পারে না, কোন সাহসে সে তাকে শাসন করে!' উত্তেজনায় মার কথা আটকে আটকে আসছিল।

দাদা উত্তর দিল না। দিতে পারলো না। শুধু নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগলো।

মা আবার বলতে লাগলো, 'রোজ তুই মদ খেয়ে আসিস। পয়সা আসে কোথা থেকে? সংসার চলে কি করে ভেবে দেখেছিস কখনও? সে ভাবনা তোর নেই। শুধু নিজের কথাই চিন্তা করিস—'

দাদা বিড় বিড় করে বললো, 'আমি নিজের কথা চিন্তা করি?'

'হ্যাঁ করিস। একশো বার করিস।' মা অস্বাভাবিক জোরে

চিৎকার করে কথা বলছে। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ছোট কথাও বড় হয়ে কানে বাজে। মা কি পারিপার্শ্বিকতা ভুলে গিয়েছে? মাকে এমন আত্মহারা হতে কখনও দেখিনি। স্খলিতপায়ে আমি বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। দাদা আজ প্রচুর মদ খেয়ে এসেছে। ওর গা দিয়ে ভুর ভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে। সস্তা দামের মদ, বেশী গন্ধ ছড়ায়। বেচারা! ওর ভাগ্যে ভাল মদ জোটেনি। যদি জুটতো, এত গন্ধ ছড়াতো না।

দাদা আর কথা বলছে না। ওর মাথা ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছে। ওকে একজন বিপর্যস্ত মানুষ বলে মনে হচ্ছে এখন।

আমার বুক ভারী হয়ে উঠছে। এতক্ষণ আমার বুকে দুঃখ ছিল না। সহসা পুঞ্জ পুঞ্জ দুঃখ এসে বুকটাকে ভারী করে তুলতে লাগলো। ধীরে ধীরে দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর মাথা আরও ঝুঁকে পড়েছে। ওর একটা হাত দু হাতের মধ্যে নিতে নিতে বললাম, 'খাবে চলো।'

দাদা হঠাৎ উদ্ভট কাণ্ড করে বসলো। দু হাতে মুখ ঢেকে শব্দ করে কেঁদে উঠলো।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা চাপা কান্না শুনতে পাচ্ছি। কে কাঁদে, কেন কাঁদে? মার দিকে হাত বাড়ালাম। মা সরে যেতে চাইলো। জোর করে মাকে কাছে টেনে নিলাম। মা আমার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো। মাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। মা অসহায় শিশুর মত আমাকে আঁকড়ে পড়ে রইলো।

একদা এক শিশু বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, এই বিশ্ব সংসার জুড়ে তুমি আছ। তুমি আছ বলেই আকাশে সূর্য ওঠে, চাঁদ হাসে, তারা ফোটে। তুমি আছ বলেই গাছের শুকনো ডালে নতুন পাতা গজায়, ফুল ফোটে, পাখি গান গায়। বাবার হাত ধরে কীর্তনখোলা নদীর তীরে বেড়াবার সময় ঝাউবনের মর্মরধ্বনি শুনতে শুনতে সে একদা

বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, তুমি আছ, তাই নদী কুল কুল রবে বয়ে চলে, রাজ-হাঁসের মত দলে দলে পাল-তোলা নৌকো ভেসে যায় সেই জলে, ওপারের ঐ যে সবুজ মাঠ, দূরে দিগ্বলয়— সবকিছু তুমি আছ বলেই।

সেই আমি, দোলন, আজ তোমার ওপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে বসেছি, ঈশ্বর!

কয়েকদিনের মধ্যে দাদা কলকাতার বাইবে বদলি হয়ে গেল। যদিও দাদা মুখে বললো, 'ওরা জোর করে বদলি করলো। প্রোটেষ্ট করেছিলাম, সাফ জবাব দিল, চাকরি ছেড়ে দিতে পার,' আমি জানি ও কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেল। যদিও দাদার মতে বাবার নাকি লাইফ সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট পথ ছিল না, এলোপাথারি ঘুরে মরেছেন ভদ্রলোক, ইদানীং আমার মনে হতে আরম্ভ করেছে, নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট যা হোক তবু কোন একটা পথ হয়তো বাবার জীবনে ছিল, কিন্তু ধু-ধু মরুভূমি ছাড়া দাদার জীবনে আর কিছু নেই। আলেয়ার পিছনে যেমন বিভ্রান্ত মানুষ দৌড়ে মরে ও ঠিক সে ভাবেই দৌড়ে মরছে। কিছুদিন মেয়েদের পিছনে দৌড়লো, অমরেশবাবু অমরেশবাবু করে পাগল হলো কয়েকদিন, তারপর পথের সন্ধান করতে কলকাতা ছেড়ে পালালো। জানি না শেষ পর্যন্ত দাদা পথের সন্ধান পাবে কিনা। পথ যদি খুঁজে না পায় নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে ও।

দাদার বদলির কথা শুনে মা ভাল মন্দ কিছু বললো না। আগে হলে দাদা চিৎকার চেঁচামেচি করে মার মতামত জানতে চাইতো কিন্তু এখন দাদা তেমন জোর করতে পারলো না। আমাকে উদ্দেশ করে যদিও কথা বলছিল দাদা, আমি জানি এর একটি বর্ণও আমার উদ্দেশ্যে না। মাকেই শোনাচ্ছে দাদা। দাদা বলছিল, 'বাইরে মানে তো আর ভারতবর্ষের বাইরে না। যখন খুশি চলে এলেই হলো।

বদলির পর একটা সুবিধা হতে পারে। শিগগির নাকি প্রমোশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' কথা বলে দাদা গভীর আগ্রহে মার দিকে তাকিয়ে রইলো। মা কিন্তু উত্তর দিল না। অবিশ্যি দাদা যে সরাসরি মাকে কোন প্রশ্ন করেছে তা না, তবু মার কিছু বলা উচিত ছিল। বললে শোভন হতো।

দাদাকে দেখে আমার মায়া লাগলো। বললাম, 'যদি মনে কর বাইরে গেলে তোমার উন্নতি হবে, যাও।'

ভেবেছিলাম আমার কথায় দাদা খুশী হবে, ফল হলো উল্টো। ও রেগে উঠলো, 'আমি চলে গেলেই তো তোরা খুশী হোস। বেশ, লণ্ডনে আমাদের ব্রাঞ্চ আছে, চেষ্টা করবো সেখানে বদলি হতে।'

'তাই করো দাদা। তবু এ সংসারের একজন অন্তত সুস্থ সরলভাবে বাঁচতে পারবে।'

কথা বলতে গিয়েও দাদা চুপ করে গেল। কী বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে দাদার! যে দাদা কয়েকদিন আগেও সামান্য কথায় বিষম চেঁচাতো, সেই মানুষটি কত সহজে চুপ করে গেল। দাদা যে ভেতরে ভেতরে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। ওকে সাহস দেবার জন্যে বললাম, 'চাকরি করতে গেলে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করা চলে না। আমার কলেজ আছে, না হলে কলকাতার বাসা তুলে সবাই চলে যেতাম তোমার সঙ্গে।'

হঠাৎ মা কথা বলে উঠলো, 'না, যেতাম না।'

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

'কলকাতার বাইরে গেলে তোর সম্বন্ধ পাওয়া যাবে না। কে খোঁজখবর করবে।'

জোরে হেসে উঠলাম। যেন মা দারুণ মজার কথা বলে ফেলেছে।

মা আমাকে ধমক দিয়ে বললো, 'হাসিস না। সব কথাতে হাসা ভাল না। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস যখন, বিয়ে একটা করতেই হবে। আ-জীবন দাদার গলগ্রহ হয়ে থাকা যায় না।'

'যায় যায় হাজার বার যায়।' অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলো দাদা।

মা আর কথা বললো না, উঠে চলে গেল।

মা যেন ক্রমশই আলো থেকে অন্ধকারের দিকে ছুটে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত এই সংসারে সুস্পষ্ট মানুষ বলতে যাকে বোঝা যেত, সে মা। স্পষ্টত মা এখন আমাকে দাদার চেয়ে বেশী ভালবাসে। এ বোধ কিছুদিন ধরে আমার মধ্যে এসেছে। ছেলেবেলায় মনে হতো মা বুঝি দাদাকেই বেশী ভালবাসে। অবিশ্যি তা নিয়ে আমার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। ভালবাসা নামক বস্তুটিকে দাদার সঙ্গে সমান সমান ভাগ করতে পেরে আমি তৃপ্ত ছিলাম। মা দাদাকে বেশী ভালবাসে, বাসুক। আমি তো বাবার ভালবাসা পেয়েছি। সেখানে দাদার প্রাপ্য অংশ ছিল খুবই সামান্য। কোর্ট থেকে ফিরে বাবা আমাকে কোলে নিয়ে গল্প শোনাতেন। মাঝে মধ্যে দাদার দিকে তাকিয়ে দেখতেন। এ থেকেই ধরে নিয়েছিলাম, বাবার ভালবাসায় দাদার প্রাপ্য অংশ ছিল খুবই সামান্য, যার জন্যে মার ভালবাসা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি আমাকে।

কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয়টি কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। দাদার দিক থেকে মা ক্রমশ আমার দিকে সরে আসতে লাগলো। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। মা-ই একদিন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল। সেদিন ছিল রবিবার। বিকেলবেলা দাদা বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় মাকে বলে গেল, ফিরতে রাত হবে। নাইট শোতে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবে। দাদা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ মা গুম খেয়ে বসে রইলো। মাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'দাদার সিনেমা যাওয়ার ব্যাপারে তুমি কি অসন্তুষ্ট হয়েছো?'

মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারলো না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলতে লাগলো, 'দীপুকে নিয়ে আমার ভয় হয়। ও যে তোকে আমাকে খুব ভালবাসে বুঝি। কিন্তু সে-ভালবাসার পেছনে কোন

কর্তব্য-বোধ নেই। ও যখন ভালবাসে, প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ছাড়ে। তারপর একেবারে ভুলে যায়। এই যে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেল, রাতের শো দেখে বাড়ি ফিরবে বললো, ওর কিন্তু একবারও তোর কথা মনে হলো না। তোবও যে সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে, দিনরাত একটা গুমোট ঘরে বসে যে মানুষ বাঁচতে পারে না, দীপু সে কথা বোঝে না। বুঝতে চায় না। সেখানেই আমাব ভয়।'

সেই দিন থেকে আমার মনে হতে লাগলো, মা নিশ্চয় দাদার চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসে। না হলে আমাব কথা এমনভাবে চিন্তা কবতো না।

দাদা আমাকে একদিন বললো, 'গ্যাখ দোলন, তোকে একটা কথা বলবো। বল র সুযোগ হয়তো আব পাব না। কোথায় না কোথায় থাকবো।' দাদা একটুক্ষণ চুপ থেকে আবাব বলতে লাগলো, 'তুই যদি কাউকে ভালবাসিস তাকে বিয়ে কর। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এভাবে চলিস না, তাতে তোর মনে অশান্তি আসবে, জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেবে। অমরেশবাবু হয়তো লোক খাবাপ না। দয়া মায়াও আছে ভদ্রলোকের। না চাইতেই টাকা দেয়। আমার কথা আলাদা। আমি পুরুষমানুষ। নিন্দা কুৎসায় কিছু যায় আসে না। কিন্তু তুই মেয়ে—'

দাদার কথার মাঝখানেই বলে উঠলাম, 'আজকাল মেয়ে-পুরুষ সমান।'

'সে কথার কথা, কাজের বেলায় না।'

দাদাকে উত্তেজিত করার জন্যে বললাম, 'তোমরা—পুরুষেরা মেয়েদের সব সময় কতগুলো শাসনে বেঁধে রাখতে চাও নিজেদের সুবিধার জন্যে। যেমন, তুমি মদ খেলে দোষ নেই, কিন্তু আমি যদি ছিটেফোঁটা মুখে ঠেকাই—'

'মেয়েরা একবার নেমে গেলে আর উঠতে পারে না। কত ভাল ঘরের মেয়েকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই নোংরা বৃত্তি নিতে হয়।'

'পুরুষের বেলায়ও সেই কথা সমানভাবে খাটে।'

'তর্ক থাক দোলন। আমার যা মনে হলো বললাম, কথা শোনা না-শোনার দায়িত্ব তোর। বড় হয়েছিস এখন, ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা হয়েছে, আমি আর কি বলবো।'

'তুমি কারও কথা শোন? আমি আর মা যদি তোমাকে বাইরে যেতে বারণ করি তুমি শুনবে?'

'বাইরে যাওয়াটা আমার নিজের ইচ্ছেয় হচ্ছে না। অফিস জোর করে পাঠাচ্ছে।'

'যদি বলি অফিস থেকে তোমাকে বাইরে পাঠাতে চায়নি, তুমিই একরকম জোর করে ট্রান্সফার নিয়েছো।'

'তোর ইনফরমেশন একদম ভুল।'

'না দাদা, আমার ইনফরমেশন সেণ্ট পারসেণ্ট কারেক্ট। তুমি পালিয়ে যেতে চাইছো।'

'আমি পালাতে যাব কেন শুধু শুধু। কোন অন্যায় তো করিনি আমি।'

'ন্যায় অন্যায় বোধ সবার একরকম হয় না। হয় তোমার মনে অপরাধবোধ এসেছে, না হয় সংসারের দায়িত্ব পালন করতে তুমি ভয় পাচ্ছো। ভয় নেই, তোমাকে আমি বাধা দিতে চেষ্টা করবো না। বরং খুশী মনে ভগবানের কাছে প্রর্থনা জানাবো তুমি যেন সুখী হতে পার।'

এ ধরনের কথা দাদাকে কোনদিন বলিনি। দাদাও হয়তো শোনার আশা করেনি। কিছুক্ষণ আমার দিকে বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে থেকে দাদা হেসে উঠলো, 'ধর্মযাজকের মত উপদেশ দিচ্ছিস তুই। কে বলবে তুই থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। কথা শুনে মনে হয়,

কোন বয়স্কা জ্ঞানী মহিলা তুই।' দাদা যে হাল্কা কথার মধ্য দিয়ে পালাবার তাল করছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু অত সহজে ওকে আজ পালাতে দেবার ইচ্ছে আমার নেই।

বললাম, 'মানুষের জ্ঞান যে শুধুমাত্র বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ে তা না। অভিজ্ঞতায় মানুষের জ্ঞান বাড়ে।'

'তোর জীবনে এমন কোন অভিজ্ঞতা নেই যে—'

কথার মাঝেই ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'কে বলে আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। বহু রকমের মানুষ দেখেছি জীবনে। এই যে তোমার অমরেশবাবু। জানি না ভদ্রলোককে তুমি কি চোখে দেখ। এতদিন হয়তো ভাল চোখেই দেখতে, ইদানীং নিশ্চয় খারাপ চোখে দেখতে শুরু করেছো।'

দাদা মৃদু আপত্তি জানালো, 'খারাপ চোখে দেখবো কেন। লোকটা তো ভালই।'

'কেন দেখবে জানি না, কিন্তু দেখছো। সামান্য কারণেই মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি পাল্টে যায় কি না।'

দাদা ঠোঁট কাঁপিয়ে বললো, 'কারণটা সামান্য নয়।'

'যেহেতু আমি অমরেশবাবুর কাছে বেশী রাত পর্যন্ত ছিলাম?'

দাদা উত্তর দিল না, চুপ করে বসে রইলো।

'আচ্ছা দাদা, একটা কথার ঠিকঠাক উত্তর দেবে?'

দাদা নীরবে তাকিয়ে রইলো।

'তোমার কি মনে হয় না, তোমার আর একটু বেশী সাহসী হওয়া উচিত ছিল। সেদিন জয়তির সঙ্গে দেখা হলো, ও খুব মুষড়ে পড়েছে। ওর বাবা মা নাকি বিয়ের সম্বন্ধ দেখছে। কিন্তু ও কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। তোমার কি একবারও মনে হয় না, জয়তির জীবন নষ্ট করে দেবার কোন অধিকার তোমার নেই?'

দাদা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, 'কেউ কারও জীবন নষ্ট করতে পারে না। এই যে তুই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটার সঙ্গে ঘুরলি-ফিরলি,

তোর জীবন তো নষ্ট হয়নি। বরং তুই আহ্লাদ করে অমরেশবাবুর সঙ্গে আড্ডা মারিস।'

মনে মনে বললাম, কেন অমরেশবাবুর সঙ্গে আড্ডা মারি, এক বিছানায় শুই সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু দাদাকে এ কথা বলা যায় না।

মা এসে ঘরে ঢুকলো। কোন রকম ভূমিকা না করেই বললো, 'কত টাকা পাঠাবি মাসে মাসে ?'

দাদা সহসা উত্তর দিতে পারলো না। ও অসহায় ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। বললাম, 'দাদার যা সুবিধা হয় তা-ই পাঠাবে।'

মা দৃঢ় স্বরে বললো, 'না তা হয় না। ও কত করে পাঠাবে জানা দরকার। সেই মতো ব্যবস্থা করবো। দরকার হলে তোকে হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়ে আমি মামার বাড়ি চলে যাব। মামা বেঁচে আছেন এখনও।'

আমি জানি এটা মার এক ধরনের অর্থহীন গর্ববোধ। দাদামশাই যে আমাদের বিশেষ খোঁজখবর নেন, তা না। কিন্তু মা দেখাতে চায় উনি আমাদের বিষয়ে—বিশেষ করে মার সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। এককালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ভদ্রলোক। প্রায় বিশ বছর ধরে পেনসেন খাচ্ছেন, আরও কতকাল খাবেন জানেন তাঁর ইষ্টদেবতা। অবিশ্যি এ নিয়ে আমার কোন অনুযোগ বা কৌতূহল নেই। কার টাকা কে খায় তাতে আমার কী এল গেল! ব্যাপারটা তা না। আসলে এই দাদামশাইটিকে আমি বিশেষ সু-নজরে কোনদিনই দেখতে পারিনি। আমার ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর উনি অযাচিতভাবে গোটা কয়েক উপদেশ লিখে পাঠিয়েছিলেন মাকে। সেই চিঠিতে আমার সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল। তাঁর মতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা শুধুমাত্র নিষ্প্রয়োজনই না, ক্ষতিকরও বটে। লেখাপড়া শেখানো মানে চোখ ফোটানো। চোখ ফুটলেই জ্বালা। শিশু যতদিন মাতৃ-জঠরে থাকে

ততদিন সুখে থাকে, পৃথিবীর আলো দেখলেই কেঁদে ওঠে। কথাটা উনিই লিখেছিলেন। যৌবনে উনি নাকি সাহিত্য চর্চাও করেছিলেন। নিজের পয়সায় খান দুয়েক বইও ছেপেছিলেন। মার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দাদামশাই সম্বন্ধে এত কথা আমার মনে পড়ে গেল। মা যে পারতপক্ষে মামার বাড়ি যাবে না, আমি জানি।

দাদা আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলো, 'দোলন একা একা হষ্টেলে থাকবে?'

আমি হেসে ফেললাম, 'হষ্টেলে সবাই একা একা থাকে। দশজনের মধ্যে একা।'

মা নীরস কণ্ঠে বললো, 'যার বাবা অল্প বয়সে মারা যায়, তার অনেক কষ্ট সইতে হয়।'

মা বড্ড নিষ্ঠুরের মত আচরণ করতে শুরু করেছে, যা কিনা ব্যক্তিগতভাবে আমি পছন্দ করছি না। দাদার হয়তো দোষ আছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই দোষ আছে ওর। কিন্তু দোষ কার নেই? বাবার ছিল না? তোমার নেই? এই যে বাবা বেঁচে থাকতে তুমি একজন উদাসিনী মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করে গেলে, পারতপক্ষে কাছে গিয়ে বসতে না, দুটো হালকা কথা বলে তাঁর বিষণ্ণ মনে সুখের পরশ এনে দেবার চেষ্টা করোনি, বরং অন্যায়ভাবে তাঁকে আঘাত করতে চেয়েছো, দোষ নয় এসব!

শুধু পরের দোষ দেখেই জীবন কাটাবে তুমি মা?

একথা বলে মাকে শুধু শুধু দুঃখ দিয়ে লাভ কি!

দাদা চলে যাবার পর কয়েকদিন খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগতো। প্রায় দিনই সন্ধ্যের সময় অমরেশবাবুর কাছে যেতাম। আর মদ খাইনি। তাঁর সঙ্গে এক বিছানায় শুইও নি। সামনের চেয়ারে বসে গল্প করেছি। উনি অবিশ্যি মদ খেতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সে আহ্বানে সাড়া দিইনি।

অমরেশবাবু একদিন আমাকে কিছু টাকা দিলেন। সেদিন টাকার প্রয়োজন ছিল। কলেজের মাইনে বাকী পড়েছিল। মুদির দোকানেও ধার হয়ে গিয়েছিল। একটা ছোকরা চাকর রাখা হয়েছে কয়েকদিন আগে। দোকান বাজার সেই করে। কয়েকদিন ধরে বাজারের পয়সারও টানাটানি চলছিল।

টাকা দিতে অমরেশবাবু খুব ইতস্তত করছিলেন। উনি সত্যিকারের ভদ্রলোক। না হলে সেদিনের ঘটনার পর তাঁর এই সঙ্কোচের মানে হয় না। উনি বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলবো দোলন, মনে কিছু করবে না বলো।'

'আপনি বলুন, আমি কিছু মনে করবো না।'

উনি তখন একটা খাম আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। বললাম, 'কার চিঠি?'

'চিঠি না। এতে কিছু টাকা আছে, তুমি নাও।'

'টাকা?'

'দীপু যাবার সময় বলে গেছে, প্রথম কয়েক মাস ও কিছু পাঠাতে পাববে না। পরে ধার শোধ করে দেবে।'

'দাদা ধার শোধ করে দেবে?' মন্ত্রমুগ্ধের মত বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলাম।

'হ্যাঁ। দীপু খুব ভাল ছেলে।'

'আপনার একটা পয়সাও শোধ দিতে পেরেছে দাদা?'

অমরেশবাবু বিব্রতভাবে বললেন, 'ওতো আমার কাছ থেকে টাকা নেয়নি।'

অমরেশবাবুর পাশে গিয়ে বসলাম। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'ধার হিসেবে দেবেন না। এমনি দিন। কোনদিন শোধ করতে পারবো না জেনেই দিন।'

অমরেশবাবুর হাত থেকে খামটা নিয়ে বুকের মধ্যে গুঁজে রাখলাম। তারপর দুই হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে উন্মাদের

মত চুমু খেতে লাগলাম। বারংবার একই কথা বলতে লাগলাম, 'শুধু হাতে কিছু নিতে নেই। যা পারলাম দিয়ে গেলাম।'

আর দাঁড়ালাম না। দ্রুতবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

বাইরের ঘরে মা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। রোজই করে। খামটা মার হাতে দিয়ে বললাম, 'অমরেশবাবু কিছু টাকা দিলেন। বললেন, দাদা নাকি ধার হিসেবে দিতে বলেছে।'

মা হাত পেতে খামটা নিল। টাকা বের করে গুনে বললো, 'পাঁচশো টাকা। এক কথায় এতগুলো টাকা দিয়ে দিলেন ভদ্রলোক! আজকালকার দিনে এমন মানুষ তো বড় একটা দেখা যায় না।'

আমি ঘরের ভেতরে যাচ্ছিলাম, মা ডাকলো, 'আয় বোস। রাত এখন বেশী হয়নি।'

'আমার মাথা ধরেছে।'

'আয় মাথা টিপে দিই।'

'না।'

'আয না।'

'না না না। আমার মাথা টিপতে হবে না। আমার কথা তোমাদের ভাবতে হবে না।' বলতে বলতে উদ্গত কান্না আমার বুক ঠেলে উঠে আসতে লাগলো। একরকম পালিয়েই চলে এলাম শোবার ঘরে।

বালিশে মুখ চেপে শুয়ে ছিলাম। মা এসে একটা হাত আমার পিঠে রেখে ডাকলো, 'দোলন, কি হয়েছে আমাকে বল।'

কথা বললাম না। বলতে পারলাম না।

মা আবার বললো, 'শরীর খারাপ লাগছে? অমরেশবাবু কিছু বলেছেন?'

না না না। শরীর আমার খুব ভাল আছে। অমরেশবাবু কোন অপমানজনক কথা বলেন নি। বরং খুব ভদ্র ব্যবহার করেছেন। একটা কথা সত্যি করে বলো মা, তুমি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস

করেছো, দাদাকে ধার হিসেবে পাঁচশো টাকা দিয়েছেন উনি ? সত্যি করে বলো।

মাকে একথা বলে লাভ নেই। সেই বৃদ্ধ কাকাতুয়াটা একদিন জেগে জেগে ঘুমিয়েছিল। চেষ্টা করেও তার ঘুম ভাঙ্গাতে পারিনি।

মার ঘুমও ভাঙ্গানো যাবে না।

ঘুম ভাঙ্গলো খুব ভোরে। এত ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গে না। বিশেষ করে শীতকালে। আজ অ-কারণেই গাঢ় ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। ভেঙ্গে যেতেই প্রচণ্ডভাবে জেগে উঠলাম। জেগেই চিৎকার করতে লাগলাম, 'মা, মা শিগগির এসো।' মা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। মা এত ভোরে উঠে যে কী করে জানি না। নিশ্চয় উনুনে আঁচ দিয়েছে। ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর ভরে গিয়েছে। বিরক্ত স্বরে বললাম, 'এত ভোরে উনুন জ্বালো কেন, শুধু শুধু কয়লা পোড়ে।'

মা পাল্টা জবাব দিল, 'উনুন জ্বালানো হয়নি। আশপাশের বাড়ির ধোঁয়া এসে ঢুকেছে ঘরে।'

মার উত্তরে বিরক্তি আরও বেড়ে গেল। 'সকালে জানালা বন্ধ করে দাও না কেন ?'

'এ কথা বলার জন্যেই কি আমাকে ডাকলি ?'

'না, এ ছাড়াও কথা আছে। এক কাপ চা পাঠিয়ে দেবে ?'

'বিছানায় বসে চা খাবি ?'

'বসে না, শুয়ে শুয়ে খাব।' ঝুপ করে আবার শুয়ে পড়লাম। পায়ের নীচের লেপ টেনে গায়ে দিলাম।

মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বললাম, 'এখন থেকে রোজ সকালে এক কাপ করে চা পাঠিয়ে দিও। বেড-টি খাবো।'

'বড়লোকদের সঙ্গে মিশেমিশে যত বদ-অভ্যেস হচ্ছে তোর। বাসি মুখে কেউ চা খায় ?'

'সাহেবরা খায়।'

'সাহেবরা খেলেও অন্যায় করে। মুখ না ধুয়ে কিছু খেতে নেই।'

মার এই তর্ক করার অভ্যেসটা আমার একটুও ভাল লাগে না। সব বিষয়ে তর্ক না তুলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চুপ করে যাওয়া অনেক মঙ্গলজনক। মা এটা বোঝে না। বোঝে না বলেই কষ্ট পায়। দেয়।

'তোমার ইচ্ছে না হয় চা পাঠিও না। শুধু শুধু বাজে অজুহাত দেখাতে চেও না।'

মা আর কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকলো মধুসূদন। ওর হাতে এক কাপ ধূমায়িত চা। তৃষিতা চাতকির মত চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে আরামসূচক শব্দ করলাম, 'আঃ।'

অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে চা খেলাম। এই চা খাওয়ার মধ্য দিয়ে আমি নিজের মধ্যে এক অনাস্বাদিত আমেজ ছড়িয়ে দিতে চাইছিলাম। এতদিন পর্যন্ত এ বাড়িতে আমার পৃথক কোন সত্তা ছিল না। আজ ভোর থেকে আমি নিজেকে আবিষ্কার করতে শিখলাম। নিজেকে এক বিশিষ্ট মানুষ বলে ভাবতে শিখলাম। অমরেশবাবুই আমার মধ্যে এই বোধ এনে দিলেন। মনে মনে অমরেশবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। দাদার কথাও বারংবার মনে হতে লাগলো। ওকেও কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। ও যদি দূরে সরে না যেত, এমনভাবে নিজেকে দেখতে পেতাম না। এ সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হিসেবে কখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম না। কণিকাদির কথাও মনে হলো। কতদিন ওকে দেখি না। হিসেব করে দেখলে হয়তো মাস খানেকের বেশী হবে না, কিন্তু এই মুহূর্তে কড়া ক্রান্তির হিসেব করতে আমার মন না-রাজ। মনে হলো বহু যুগ ধরে কণিকাদিকে দেখি না। কণিকাদির চিবুকের নীচে ছোট একটা কাটা দাগ আছে। কোন ছোট বয়সে পড়ে গিয়েছিল, দাগটা এখনও মিলিয়ে যায়নি। কোনদিনও যাবে না। সেই দাগটাকে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। এই ভাবে আমি মানুষকে দেখার

চেষ্টা করি। সেইসব মানুষকে যারা কিনা এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে নেই। কণিকাদির সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথাও মনে পড়ে গেল। সে অরিন্দম। বারংবার ওর নাম উচ্চারণ করতে লাগলাম। প্রথমে মনে মনে উচ্চারণ করছিলাম। ইচ্ছা করে একবার শব্দ করে ডাকলাম। ডাকলাম, অরিন্দম। অরিন্দম উত্তর দিল না। আবার ডাকলাম, অরিন্দম, উত্তর দাও অরিন্দম। অরিন্দম পোষা বেড়ালের মত আমার ঘা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো, আদরের ভঙ্গিতে শব্দ করলো গ-র্-র। অরিন্দমকে নিয়ে ঠিক এভাবে খেলবো বলে ওর নাম ধরে ডাকিনি। অরিন্দমই ইচ্ছে করে বিচিত্র এক খেলায় আমার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়লো। ও ক্রমাগত আমার বুকে নিজের মুখ ঘষতে লাগলো। ওর সমস্ত শরীর জুড়ে সেই বিচিত্র শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। অরিন্দম আমাকে আদর করছে না আমার আদর খাচ্ছে বোঝা গেল না। কিন্তু উষ্ণ লেপের নীচে শুয়ে চোখ বুজে আমি এক নতুন অরিন্দমকে আবিষ্কার করলাম, যে একটা পোষ-মানা বেড়ালের চেয়েও বেশী রকমের পোষা।

আরও কতক্ষণ এভাবে শুয়ে থাকতাম জানি না। মা এসে ঘরে ঢুকলো। টান মেরে লেপ সরিয়ে দিয়ে বললো, 'কটা বাজে খেয়াল আছে? নটা।'

'নটা দশটা যা ইচ্ছে বেজে যাক। ঘড়ি আজ আমার দাস। আমি ওর ইঙ্গিতে আর ওঠ-বোস করছি না বাবা।'

মা আমার কপালে হাত ঠেকিয়ে চিন্তার ভান করে বললো, 'জ্বরটর হয়নি তো। যে বার তোর টাইফয়েড হয়েছিল সে বার বিকারের ঘোরে যা তা বকছিলি।'

মার কথায় হেসে ফেললাম। 'জ্বর না হলেও মানুষের বিকার হতে পারে।'

মা সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'তা পারে।' তারপর ক্ষিপ্র হাতে বিছানা তুলতে লাগলো। বাধ্য হয়েই আমাকে উঠে পড়তে হলো।

মা আমাকে উদ্দেশ করে বললো, 'রান্না ঘরে ডিম সেদ্ধ করে রেখেছি, খেয়ে নিস।' আমি চিরদিন ডিম ভালবাসি, কিন্তু চায়ের সঙ্গে ডিম খাওয়া হয়ে ওঠেনি এতদিন। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, উনি একটি করে ডিম খেতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদা খেত। দাদা চলে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর আজ থেকে একটি করে ডিম আমার জন্যে বরাদ্দ হলো।

ডিমটাকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করলাম। খোলস ছাড়ানো মসৃণ অবয়ব। প্লেটের পাশে খানিকটা নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো। মা সবকিছুই জানে। ডিম খেতে হলে যে নুন গোলমরিচ দরকার হয়, মা সে কথাও ভোলেনি। ভোলেনি বলে আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

মা এসে রান্না ঘরে ঢুকলো। কী একটা চাপানো ছিল উনুনে, সযত্নে সেটাকে নামালো। একটা কড়াই চাপাতে চাপাতে বললো, 'চা খাবি?'

মা ধরে নিয়েছে বিছানায় শুয়ে যখন এক কাপ খেয়ে ফেলেছি, আর খেতে চাইবো না। কিন্তু আমার অন্তরে তখন চায়ের পিপাসা জেগেছে। বললাম, 'এ সময় যেদিন বাড়িতে থাকি, তখন তো চা খাই।'

মা তাড়াতাড়ি কড়াই নামিয়ে রেখে কেটলি চাপাতে চাপাতে বললো, 'আজ সকালে খেলি কিনা। বেশী চা খাওয়া তো ভাল না।'

'বেশী চা খেলে কি হয়? মরে যায় মানুষ?' নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই রীতিমত কর্কশ শোনালো।

মা শান্ত কণ্ঠে বললো, 'মরার কথাটাই বড় না। মানুষ সবসময় মরে না, অসুখে ভোগে।'

'চা খেয়ে কেউ কোনদিন অসুখে ভোগেনি।'

মা আর আমার কথার প্রতিবাদ করলো না। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই অনুভব করতে পারছিলাম, পরিবর্তন যতটা না

আমার মধ্যে বিস্তার করতে শুরু করেছে, তার থেকে অনেক দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে মার মধ্যে। মা আমাকে সমীহ করতে শুরু করেছে।

হঠাৎ বলে উঠলাম, 'একটা চাকরি পেয়ে যাব খুব শিগগির। তখন টাকা জমিয়ে অমরেশবাবুর ধারটা শোধ দিয়ে দেব। তোমাকে একটু হিসেব করে সংসার চালাতে হবে মা।'

মার মুখের সমস্ত আলো দপ করে নিভে গেল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো মা, 'হিসেব কেন? আ-জীবন তো হিসেব করেই এলাম। ভেবেছিলাম দু চারদিন হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে বসে দিন কাটাবো। একটু আরাম, একটু সুখ। কিন্তু—।' মা একটুক্ষণ চুপ থেকে বিড় বিড় করে বললো, 'সবই আমার কপালের গুণ।' মা শব্দ করে কেটলি নামিয়ে রেখে উনুনে কড়াই চাপিয়ে দিল।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। চুপচাপ চা ডিম খেয়ে উঠে পড়লাম। আজ একবার কণিকাদিদের বাড়ি যাওয়া দরকার। কণিকাদিরা গোটা এগারোর সময় আসবে। সেই সময় আমার উপস্থিতি প্রয়োজন। আমাকে উপস্থিত থাকতে কেউ যে বলেছে তা না। আমি নিজের মধ্যে তীব্র কৌতূহল অনুভব করছিলাম। কণিকাদিরা সদলবলে গাড়ি থেকে নামছে; ছেলেমেয়েরা হুটপাট করে নেমে পড়লো আগে ভাগে, রাজেন্দ্রাণীর মত হেলে দুলে নামছে কণিকাদি, পেছন পেছন নামছে আর একটি মানুষ, দেখতে যদিও সু-পুরুষ কিন্তু ক্রীতদাস বইতো নয়—সমস্ত দৃশ্যটাই আমার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া প্রয়োজন।

ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে নীরবে উচ্চারণ করলাম, বেইমান।

কণিকাদিদের আসতে এখনও দেরি আছে। অমরেশবাবু সাধারণত বেলা করে অফিসে যান, কিন্তু আজ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। উনি যখন সাজগোজ করছিলেন আমি ওঁর ঘরে

বসেছিলাম। যদিও জানি, পরপুরুষের ঘরে কোন মেয়ের এই সময় উপস্থিত থাকা উচিত না। কিন্তু কে পর? পর ভাবলেই পর। অমরেশবাবু যে বেশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন, অনুভব করতে পারছিলাম। পারছিলাম বলেই মজা লাগছিল। এও এক রকমের খেলা। একজন শক্তপোক্ত মানুষ শিশুর মত অসহায় বোধ করছেন। যে আমাকে তিনি বিশেষ এক সময় অন্তরের সঙ্গে কামনা করেন, সেই মানুষটি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন, ভাবতেও আমার খুব মজা লাগছিল। উনি ক্ষিপ্র হাতে প্যাণ্ট পরলেন, সার্টটা তার মধ্যে গুঁজে দিলেন। এলোমেলো ভাবে টাই বাঁধছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। টান মেরে টাইটা খুলে দিয়ে বললাম, 'নটটা নইনিতাল আলুর চেয়েও বড় হয়ে গেল যে। দিন আমি বেঁধে দিচ্ছি।'

উনি যে আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালেন, সেটুকুও আমার দৃষ্টি এড়ালো না। আমার চোখ শিকার-সন্ধানী বেড়ালের মত তীক্ষ্ম হয়ে উঠছিল। অমরেশবাবুর বুকের সঙ্গে ঘন হয়ে আমি টাই বাঁধতে লাগলাম। ইচ্ছে করেই একটু দেরি করছিলাম। মাঝে মধ্যে দাদা টাই পরে। বাবা বরাবর টাই পরতেন। কলেজ ছুটি থাকলে আমিই বেঁধে দিতাম। বহুদিনের অভ্যেসবশত আমি খুব দ্রুত গতিতে এই কাজ সম্পন্ন করতে পারতাম। আজ ধীর মন্থর গতিতে আমার কাজ অগ্রসর হচ্ছিল। ইচ্ছে করেই কি আমি অমরেশবাবুর সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতে চাইছিলাম?

জানি না। জানতে চাই না।

অমরেশবাবু উসখুস করছিলেন। ছোট একটা ধমক লাগালাম, 'নড়াচড়া করলে টাই বাঁধা যায় না।'

উনি সুবোধ বালকের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁর চিবুক ধরে আদর করে বললাম, 'এই তো লক্ষ্মী ছেলে।'

কাজ হলো। উনি খানিকটা সাহস ফিরে পেলেন। দু হাত

দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে গভীরভাবে ঠোঁটের ওপর চুমু খেলেন। সেই মুহূর্তে বিচিত্র একটা সৌরভ আমার নাকে এসে লাগলো। দাদা যে বলেছিল, বড়লোকদের গায়ের গন্ধ আলাদা হয়, কথাটা অতর্কিতে আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'কি সেণ্ট মেখেছেন?'

'কোন সেণ্ট তো মাখিনি।' উনি এমন নিষ্পাপ মুখে বললেন যে সবাসরি অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

'কিন্তু আপনার গা দিয়ে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে।'

'ভুল করছো, গন্ধটা তোমার গা থেকেই আসছে।' বলতে বলতে সেই ভীতু লোকটি হঠাৎ এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন। উনি নীচু হয়ে আমার বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন।

আমার সমস্ত শরীর সির সির করে উঠলো। ইচ্ছে হলো ঠেলে অমরেশবাবুকে দূরে সরিয়ে দি-ই। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমি ওঁকে গভীরভাবে নিজের দিকে আকর্ষণ করলাম।

উনি আমাকে খাটের ওপর এনে বসালেন। নিজে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসলেন। আমার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন বহুক্ষণ। দেওয়ালের ঘড়িটা ছোট ছোট শব্দে ক্রমাগত আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছে। ওর বড় হাতটা খুব দ্রুত তালে নীচের দিকে নেমে আসছে। সাড়ে দশটা বেজে গেল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা এগারোটার দিকে ছুটে চলবে। কিন্তু অমরেশবাবু যে রকম নিস্পন্দভাবে পড়ে আছেন, আমার সন্দেহ হচ্ছিল উনি হয়তো বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কণিকাদি এসে পড়বে। আমি অমরেশবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে কণিকাদিকে অভ্যর্থনা জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন মনে হতে লাগলো, আমি সেই সাহস হারিয়ে ফেলেছি।

জোর করে অমরেশবাবুর মুখ তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। উনি আরও জোরে মুখ চেপে ধরলেন। ধীরে ধীরে ওঁর পিঠে হাত বুলিয়ে

দিতে দিতে বললাম, 'এবার উঠুন, এগারোটা বাজতে চললো। ওরা এসে পড়বে এক্ষুণি।'

অমরেশবাবু মুখ তুললেন। কী বিচিত্র ব্যাপার! ওঁর চোখে জল।

ওঁর মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে চুপিচুপি বললাম, 'আমি কি কোন অন্যায় করেছি?'

অমরেশবাবু মাথা নেড়ে ধরা গলায় বললেন, 'তুমি কোন অন্যায় করোনি দোলন। তুমি অন্যায় করতে পার না। তুমি যে কত ভাল—' বলতে বলতে উনি দুই হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলেন।

আমি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম। কয়েক মুহূর্ত অমরেশবাবুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'আমি বাড়ি যাচ্ছি। আপনি কিন্তু এখন বেরোবেন না। এসময় আপনার উপস্থিত থাকা দরকার। থাকলে ভাল হয়।' দ্রুত গতিতে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, সেই কাকাতুয়াটা কর্কশ স্বরে কী বলে চেঁচিয়ে উঠলো। বুড়োটা কোনদিনই আমাকে ভাল চোখে দেখতে পারলো না। সুযোগ পেলেই ও নিজের ভাষায় কী সব বলে গালাগাল দেয়। যে মুহূর্তে ওর সঙ্গে প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল নির্ঘাৎ সেই মুহূর্তটা ছিল দারুণ অশুভ।

গেটের মুখে জটলা পাকিয়ে চাকর-ঝিরা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, আমাকে দেখেই চুপ করে গেল। সহসা আমার গা ছমছম করে উঠলো। ওরা হয়তো আমার সম্বন্ধেই বলাবলি করছে। এই যে এতদিন ধরে সন্ধ্যের সময় প্রায়ই আসতাম, দীর্ঘ সময় গৃহস্বামীর সঙ্গে কাটিয়ে যেতাম, ওরা হয়তো সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে গূঢ় রহস্যের সন্ধান করে বেড়িয়েছে। বেড়ানোই তো স্বাভাবিক।

সেই বিরাট পাগড়ি-অলা দারোয়ান আজ নতুন পোষাক পরে

দাঁড়িয়ে আছে। আমি যে ওর পাশ দিয়ে চলে গেলাম, লোকটা খেয়ালও করলো না। অন্যদিন ও সেলাম ঠুকে বুক টান করে দাঁড়ায়। আজ উন্মুখ হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পথ চলতে চলতে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলে মনে হতে লাগলো। কেউ আমার প্রত্যাশায় কোনদিন পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। আমি যদি বাড়ি না ফিরি, কোনদিনও না ফিরি, মা হয়তো প্রথম প্রথম একটু উতলা হবে, দাদাকে চিঠি লিখে জানাবে। দাদা এসে মাকে নিয়ে যাবে। তারপর ওরা আমার কথা ভুলে যাবে। সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকবে। মাঝখান থেকে দোলন বলে একটি মেয়ে, যে কিনা লম্বা বিনুনী দুলিয়ে কলেজে যেত, অ-কারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো, গ্রীষ্মের দুপুরে নিরালা ছাদে উঠে চিলেকোঠার ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসে তাকিয়ে থাকতো সামনের দিকে, চোখের সামনে ভাসতে থাকতো একটা বিরাট মাঠ, রোদের তাপে শুকিয়ে গেছে ঘাস, জেগে উঠেছে বিরাট ফাটল, কিংবা নদীর ধারে ধারে প্রশস্ত রাস্তা, সারিবদ্ধ ঝাউগাছ, ঝাউগাছের পাতায় পাতায় বাতাসের ঢেউ, সেই ঢেউয়ের শব্দ শুনতে শুনতে যে চলেছে বাবার হাত ধরে—সেই দোলন সবার অলক্ষিতে একদিন কোথায় হারিয়ে গেল। ঠেলে-ওঠা কান্নায় আমাব বুক ভরে উঠলো।

স্খলিত পায়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে যাচ্ছিলাম, মা তাড়াতাড়ি সামনে এসে দাঁড়ালো। 'ওরা ফিরেছে?'

উত্তর না দিয়ে মাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। মা খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে রুক্ষ কণ্ঠে বললো, 'কথা কানে যাচ্ছে না?'

কি উত্তর দেব! উত্তর দিতে গিয়ে একটা ভয়ই হচ্ছিল, দুরন্ত সেই কান্নাটা, যাকে বহু কষ্টে বুকের মধ্যে বন্দী করে রেখেছি, সেটা বুঝি আর সেখানে আটকে থাকবে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মা ভ্রূ কুঞ্চিত করলো। কাছে সরে এসে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে

ফিসফিস করে বললো, 'কি হয়েছে রে। আমাকে বল। কণিকা অপমান করেছে?'

মার প্রশ্নের উত্তরে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

মা আমার মাথা বুকে চেপে ধরে গাঢ় স্বরে বললো, 'এমন একটা সন্দেহ বরাবরই আমার মনে হয়েছিল। মেয়েরা এখানে বড় সঙ্কীর্ণ হয়।'

মার কথায় বিস্ময়ে মাথা তুললাম। প্রশ্ন করলাম, 'কোনখানে?'

মা একটু ইতস্তত করে বললো, 'স্বামীর ব্যাপারে মেয়েরা খুব কৃপণ। একটু এধার ওধার হলেই পৃথিবী রসাতল।'

আমার কান্নার বেগ কমে এসেছে এখন। হাত দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'কণিকাদিরা এখনও ফেরেনি। কৃপণ দাতার প্রশ্ন এখানে ওঠে না। আমি পর অধিকারে হাত দিতে যাইনি।'

স্পষ্টত দেখলাম, মার জিহ্বা লকলক করেই চকিতে স্থির হয়ে গেল। নির্বিকার মুখ করে মা বললো, 'গণ্ডগোল না হলেই ভাল। কণিকা তো সাধাসিধে মেয়ে নয়। ওর দেওরের সঙ্গে যেদিন সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল সেদিনই কেমন সন্দেহ হয়েছিল। এত বড় ঘর, ছেলেটিও ভাল, সে ছেলের পাত্রী জোটে না কেন।'

'তুমি কিন্তু বিয়ের কথায় নেচে উঠেছিলে।'

'গরীবের ঘরে মায়েরা চিরদিনই মেয়ের বিয়ের কথায় নাচে।'

বিরক্তভাবে বললাম, 'সব সময় গরীব গরীব করো কেন বুঝি না। গরীব ভাবলেই গরীব। কণিকাদিরা তো খুব বড়লোক। বাইরে থেকে অন্তত সেরকমই মনে হয়। আর সেই বাড়ির কর্তা কতটুকু একটা ঘরে থাকে জানো। এতটুকু। কোন আসবাবপত্র নেই সেখানে। আমাদের চেয়েও কম।'

'সে বড়লোকের খেয়াল। পোলাও মাংস খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেলে ওরা শুক্তো খেতে চায়।'

কথার মোড় ঘুরতে থাকায় আমি খুশী হলাম। হেসে বললাম, 'অনেকদিন কিন্তু শুক্তো খাই না। তোমার হাতের শুক্তো সত্যি সত্যি খাওয়ার মত।'

প্রত্যেক মানুষই এক জায়গায় না এক জায়গায় ছেলেমানুষ।

মা ছেলেমানুষের মত খুশী মনে বললো, 'আজ তো বাজার হয়ে গেছে, কাল সব জিনিষপত্তব আনিয়ে নেব।'

অনেকদিন পর আজ মাকে ভাল করে দেখলাম। মা অনেক রোগা হয়ে গেছে। গালেব হাড় দুটো প্রকট হয়ে উঠেছে। মা হয়তো দুবেলা পেট ভরে খায়ও না। আগে আমবা দুজনে একসঙ্গে খেতাম। ইদানীং কলেজ থেকে ফিরেই খেতে বসি। মা খেলো কি না খেলো তা নিয়ে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। সহসা নিজেকে স্বার্থপর মানুষ বলে মনে হতে লাগলো। শুধুমাত্র নিজেব সুখ সুখ করেই মরছি, অথচ সুখ নামক বস্তুটি আমার জীবন থেকে হযতো চিরদিনের মত বিদায় নিয়েছে। আসল কথা, কিছু না দিলে মানুষ প্রতিদানে কিছু পায় না।

কিন্তু কণিকাদি ? কী দিয়েছে সে ? অমরেশবাবু তো নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন, কণিকাদির কাছ থেকে তিলমাত্র ভালবাসা পাননি তিনি। কণিকাদির যদি কর্তব্যবোধ থাকতো তাহলে কিছুতেই অমরেশবাবুকে অমন ছোট একটা ঘবে শুতে দিত না। সাধারণ একটা তক্তপোষে শুয়ে রাত কাটে ভদ্রলোকের। আর নিজে নরম গদি-আঁটা খাটে শুয়ে অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করে!

আচ্ছা বলুন তো, ভালবাসা-শূন্য স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর দৈহিক মিলনে যে সন্তানের জন্ম হয়, তাদের কী বলা যায়! কী বলা উচিত! আমার তো মনে হয় মানবিক দিক থেকে তারাই জারজ সন্তান।

· এই যে কণিকাদি কাউকে কিছু দিল না, তিলমাত্র স্নেহ ভালবাসা মায়া মমতা কিছু না, কিন্তু প্রতিদানে কত কী পেল। অমরেশবাবু মুখে যাই বলুন না কেন, তিনি যে মনে মনে কণিকাদিকে ভালবাসেন

আমি বুঝতে পারি। উনি যতক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করতেন বেশীর ভাগ গল্পই করতেন কণিকাদি সম্বন্ধে। ভাল না বাসলে মানুষ তার সম্বন্ধে গল্প করতে চায় না। ছেলেমেয়েরাও নিশ্চয় কণিকাদিকে ভালবাসে। সেটাই তো স্বাভাবিক। আর এই যে ঝি চাকররা সাত তাড়াতাড়ি লাইন দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো, ওদের চোখে মুখে যে ব্যাগ্রতা ফুটে উঠেছিল, সেই নিস্পৃহ দারোয়ানটিও যে সহসা অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিল, এসব কি শুধুমাত্র ভয় বা সমীহবোধ থেকেই! আমার তা মনে হয় না। আমাদের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল অত্যন্ত রাগী মানুষ। সব ছাত্রীরাই তাঁকে ভয় করে। কিন্তু আমি বলতে পারি, উনি যদি দীর্ঘ অবসরের পর কলেজে ফিরে আসেন একজোড়া চোখও অমন ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে না।

আর একটি মানুষ যে সব সময় ছায়ার মত কণিকাদির পাশে পাশে চলছে, উঠতে বললে উঠছে, বসতে বললে বসছে, সে কি শুধুমাত্র স্বামীর অফিসে চাকরি করে বলেই। আমি হলফ করে বলতে পারি, এখান থেকে ওর যদি চাকরি চলে যায়, সেদিনও ঠিক এমন ভাবেই কণিকাদির পার্শ্বচর হয়ে ঘুরে বেড়াবে লোকটা।

কণিকাদি বলতো, 'ভালবাসা পাওয়া সহজ। কে তোকে ভালবাসলো না বাসলো তাতে কী এসে যায়। তুই কাকে কতটা ভালবাসতে পারলি সেটাই তো আসল কথা। ভালবাসতে পারাটা খুব সুখের। মা যে সন্তানকে ভালবাসে, সুখটা কার হয়। মার না?'

আমি তর্ক তুলতাম, 'আমার মা যদি আমাকে খুব ভালবাসে এবং আমি যদি বুঝতে পারি সে কথা, সুখটা নিশ্চয় আমারই হবে।'

কণিকাদি ভ্রূ কাঁপিয়ে হেসে বলতো, 'সে না হয় বড় মানুষের বেলায়। যাদের জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে তাদের বেলায়। কিন্তু শিশুর তো ভালবাসা সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। যদি থাকতো তা হলে মার আদর

খেতে খেতে হঠাৎ কেঁদে উঠতো না। আমার ছোট ছেলেটাকে যখন গাল টিপে টিপে আদর করি ও তখন কাঁদতে থাকে।'

'সে তুমি ব্যথা দাও বলে।'

'না রে। আদর সবাই সহ্য করতে পারে না।' কণিকাদি খুব লঘু স্বরেই বলেছিল কথাটা, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল ও সেদিন খুব মূল্যবান একটা কথা বলে ফেলেছিল। সত্যি সত্যি সবাই আদর সহ্য করতে পারে না।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছি। মা ঘুমোচ্ছে, আমি জেগে আছি। জেগে জেগে নানা কথা ভাবছি। দাদা আদর সহ্য করতে পারতো না। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, বাবা যদি কোনদিন ওকে কাছে ডাকতেন, ও কেমন ছটফট করতো। বাবা একবার ওকে কোলে বসিয়েছিলেন। সেদিনের সেই দৃশ্য আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। দাদা ছটফট করছে, বাবার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বাবারও কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল সেদিন। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে দাদাকে বুকের সঙ্গে চেপে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দাদা মা মা বলে চিৎকার কবতে লাগলো। মা দৌড়ে এসে বাবার হাত থেকে দাদাকে ছিনিয়ে নিল। উত্তেজনায় দাদার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। বাবাও খুব হাঁপাচ্ছিলেন। মা বাবাকে একটা ধমক দিয়ে বলেছিল, 'ওকে মারধোর করছিলে কেন?' বাবা বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মারাই উচিত ছিল। আদর করতে গিয়েছিলাম, সহ্য হলো না।' সমস্ত ব্যাপারটাই সেদিন আমার চোখের সামনে ঘটে গিয়েছিল। আমি নির্বাক বিস্ময়ে দাদার আচরণ দেখে গিয়েছিলাম এবং মনে মনে ভাবছিলাম, বাবা যে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন, আমার গালে শব্দ করে চুমু খান, আমার তো কোন রকম অস্বস্তি হয় না। বরং খুব ভাল লাগে।

বাইরের দরজায় শব্দ হচ্ছে। কেউ কড়া নাড়ছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। মার দিকে তাকালাম। মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দরজা খুলতে গিয়ে আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অজানা এক ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো। আমার এই বিস্ময়কর আচরণের যথার্থ কোন কারণ থাকতে পারে না, তথাপি আমি অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাঁপা-কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলাম, 'কে ?'

'দরজা খোল। কী ঘুম রে বাবা! বাড়িতে ডাকাত পড়লেও জাগবি না!'

দরজা খুলতেই কণিকাদির হাসিমুখ দেখতে পেলাম। কণিকাদিকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললাম, 'হঠাৎ খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

কণিকাদি পরিহাস করে বললো, 'রাত জাগতে হয় বুঝি। বিয়ে না হতেই রাত জাগা!'

আমার বুক ধড়াস করে উঠলো। 'রাত জাগতে হবে কেন? আমি তো বেশী রাত অবধি পড়ি না।'

'বেশ করো। এবার একটু জায়গা দাও তো ভাই, ভেতরে ঢুকি।'

আমি তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালাম। কণিকাদি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে আমাকে দেখালো। কী রকম অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বললাম, 'কি দেখছো? এক মাসের মধ্যে এমন কিছু বদলে যাইনি নিশ্চয়।'

'মানুষ এক দিনেও বদলে যেতে পারে। তুই কিন্তু আরও সুন্দর হয়েছিস দেখতে। কেন রে।' বলতে বলতে কণিকাদি দুহাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, 'খাই দাই ঘুরে বেড়াই। একটু মোটা হয়েছি হয়তো।'

'মোটা এবং সুন্দর।' কণিকাদি হাসতে হাসতে আমার চিবুকে আঙ্গুল ছুঁইয়ে সেই আঙ্গুল চুম্বন করলো।

কণিকাদি বেশ মোটা হয়েছে। ও এমনিতেই খুব ফর্সা। মোটা হওয়ার দরুন ওকে আরও ফর্সা দেখাচ্ছিল। ও আমার খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল। ওর শরীর থেকে এক মৃদু সৌরভ আমার নাকে আসছিল। অনেকটা সেই গন্ধ, আজ সকালে যে গন্ধ পেয়েছিলাম অমরেশবাবুর গা দিয়ে। সব বড়লোকের গা দিয়েই কি এক গন্ধ বেরোয়! মনটা সহসা বিরাক্ততে ভরে গেল। দাদা যে কী বিশ্রী এক চেতনা এনে দিয়েছে মনে। এই যে মানুষ দেখে সম্পদের বিচার করতে বসা—বিশ্রী নয় এটা? কী বলে একে? এ তো ইনফিরিওরিটি কমপ্লেকস। আমার তো এই কমপ্লেকস থাকা উচিত না। খুব নিকট থেকে আমি এদের দেখেছি। কণিকাদি সম্বন্ধে সম্ভ্রম-বোধ আমার নেই। থাকার কথাও না। অমরেশবাবুকে তো কয়েকদিন ধরে উল্টেপাল্টে দেখলাম। একজন অসহায় মানুষ ছাড়া কি তিনি।

'ক'দিনেই তুই খুব পাল্টে গেছিস দোলন। আগে কত কথা বলতিস।'

'এখনও বলি। কাঁচা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল কিনা—'

'তুই তবে ঘুমটা পাকিয়ে নে, আমি না হয় বিকেলের দিকে আসবো।'

কণিকাদির হাত চেপে ধরে বললাম, 'না না, তুমি এসো। কতদিন পর এলে, কত গল্প জমা হয়ে আছে।'

ভাগ্য ভাল কণিকাদি এই মুহূর্তে জমা-গল্প শুনতে চায়নি। চাইলে কি বলতাম। বলতাম, আমি তোমার স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছি, পরস্পর অহরহ চুমু খেয়েছি, তোমার স্বামী আমাকে পাঁচশো টাকা দিয়েছেন, এই সব?

কণিকাদিকে ঘরে এনে বসালাম।

কণিকাদি যে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে ঘরের প্রাত্যটি জিনিস দেখছিল আমি বুঝতে পারছিলাম। ও হয়তো আমাদের আর্থিক অবস্থা মেপে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ কণিকাদি বলে উঠলো, 'আমি তোকে খুব ভালবাসি দোলন।'

মনে মনে মুখ ভেংচে বললাম, শয়তানি ছেড়ে আসল কথা বলো। মুখে বললাম, 'হঠাৎ এ কথা কেন?'

কণিকাদি বললো, 'কোন কারণ নেই। কথাটা মনে হলো, বলে ফেললাম। যতদিন বাইরে ছিলাম রোজ তোর কথা মনে হতো। বিশ্বাস কর।'

কণিকাদির চোখে মুখে কি ছিল জানি না, কথাটা বিশ্বাস করে ফেললাম। মনটা খুশিতে ভরে গেল। কণিকাদির একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিতে নিতে বললাম, 'তুমি ছিলে না, সময় কাটতো না।'

কণিকাদি কথা বললো না। মুচকি হাসলো। বুকটা আবার কেঁপে উঠলো। কণিকাদি কথা বললো না কেন। ইচ্ছে করলে অনেক কিছু বলতে পারতো। না হয় আঙুল দিয়ে আমার চিবুক স্পর্শ করে ঠোঁটে ছোঁয়াতে পারতো। কিন্তু এসব কিছুই করলো না কণিকাদি, শুধু মৃদু হাসলো। ওর এই হাসির মধ্যে কি লুকনো ছিল? বিদ্রূপ, অবিশ্বাস, না কিছু না, শুধু একটুকু খুশি?

'দীপুর চিঠি আসে নিয়মিত?'

'দাদা কোনদিনই নিয়ম করে কাজ করে না। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে।' একটু থেমে আবার বললাম, 'টাকাও পাঠায়।'

কণিকাদির ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো যেন। নাকি দেখার ভুল।

আমার মনে সাহস ফিরে আসছে ক্রমশ। বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? আরও তো কিছুদিন থাকার কথা ছিল।'

আমার মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে কণিকাদি বললো, 'মানুষ

যা ভাবে সব সময় তা হয় না। ভেবেছিলাম দেরি করে ফিরবো, কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসতে হলো।'

'কিন্তু তুমি তো খুব জেদী মানুষ, ইচ্ছেমত কাজ কর।'

'জেদী মানুষও নিজের ক্ষতি সহ্য করে না।'

শব্দ করে হেসে উঠলাম, যেন একটা মজার কথা শুনে ফেলেছি। হাসি থামিয়ে বললাম, 'তোমার আবার কি ক্ষতি ?'

'জানিস না ? বুঝিস না ?'

আমি চোখ বড় করে বললাম, 'তোমার লাভ ক্ষতির কথা আমি বুঝবো কি করে ?'

কণিকাদি খপ করে আমার একটা হাত ধরে চাপা স্বরে গর্জে উঠলো, 'তুই কিছু ছেলেমানুষ না দোলন।'

লুকোচুরি খেলাটা বেশ জমে উঠেছে। মাঝ পথে খেলা থামিয়ে দিতে মন চাইলো না। বললাম, 'না ছেলেমানুষ না। বরং বেশ বুড়ো মানুষ বলতে পার। আগের দিনে এই বয়সে—'

'ন্যাকামো রাখ। কথার উত্তর দে।'

'তুমি তো কোন প্রশ্ন করোনি।'

'আমার কি ক্ষতি তুই বুঝিস না ?'

'না।'

'সত্যি বুঝিস না ?'

'আমি মিথ্যে বলা পছন্দ করি না।'

কণিকাদি কিছুক্ষণ সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠলো। দু হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, 'কেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম।'

নারী ছলনাময়ী। দুই নারী। একজন চোখের সামনে, অন্যটি নিজের অন্তরে।

শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'আমি তো ভয় পাইনি।'

কণিকাদি অন্যদিকে পা বাড়ালো। 'ভয় ডরের কথা থাক।

তারপর আছিস কেমন? মাসীমা কোথায়? কলেজ কেমন চলছে? ইয়ারলি পরীক্ষা হয়ে গেছে?'

কণিকাদির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে বললাম, 'সব ক'টা প্রশ্নের এক সঙ্গে উত্তর দেওয়া যায় না। আপাতত প্রথম প্রশ্নটারই উত্তর দিই। ভাল আছি। খুব ভাল আছি। এমন ভাল কোনদিন থাকিনি।'

কণিকাদির প্রফুল্ল চোখে আবার যেন সংশয়ের ছায়া পড়লো। 'ভাল কেন?'

'মনে কোন দুঃখ নেই বলে।'

'মানুষের কিছু না কিছু দুঃখ তো থাকেই।'

'তোমার কি দুঃখ?'

কণিকাদি থতমত খেয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'আমার আবার কি দুঃখ?'

'এই যে বললে মানুষের কিছু না কিছু দুঃখ থাকেই।'

কণিকাদি সদর্পে বললো, 'আমার কোন দুঃখ নেই। থাকার কথাও না। কেন থাকবে বল? কীসের অভাব আমার। টাকা পয়সা—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'ধনী লোকদেরও দুঃখ থাকে।'

'তা থাকে। কিন্তু আমার দুঃখ থাকবে কেন? ভাল স্বামী, সুস্থ সবল ছেলেমেয়ে—'

'তবু তুমি সুখের আশায় ছুটে বেড়াও।'

'মানে?' কণিকাদির দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠলো।

আমি নির্ভয়ে বলতে লাগলাম, 'মানে তুমি সুখের পেছনে ছুটে মরছো। টাকা পয়সার অভাব নেই, ভাল স্বামী, সুস্থ সবল ছেলেমেয়ে, তুমি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, তবু তোমার মনে সুখ নেই।'

'মিথ্যে কথা! আমার মনে খুব সুখ আছে। একটা মনে যতটা সুখ ধরে—ধরা সম্ভব, ততটা।'

কী আশ্চর্য! কণিকাদির এই আস্ফালনে আমি বিন্দুমাত্র ভয়

পেলাম না। বরং আরও সাহসী হয়ে উঠলাম। বললাম, 'না, তোমার মনে কোন সুখ নেই। তা হলে অমরেশবাবুকে একলা ফেলে রেখে অন্য একটা লোকের সঙ্গে এতদিন বাইরে কাটিয়ে আসতে পারতে না।'

কণিকাদি অস্বাভাবিক গলায় চিৎকার করে উঠলো, 'দোলন, তুই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস।'

কী আশ্চর্য! এখনও আমি তিলমাত্র উত্তেজিত হলাম না। আমি আরও বেশী শান্ত হয়ে গেলাম। এত শান্ত যে কী বলবো! চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলাম, 'মাত্রা জ্ঞানটা হয়তো আমাদের কারও নেই। যদি থাকতো তুমি অমন জোরে চেঁচিয়ে উঠতে না। মার যদি ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তোমাকে এসে প্রশ্ন করে, কেন এত জোরে চিৎকার করে উঠলে, কি উত্তর দেবে?'

কণিকাদি কথা বললো না, ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগলো। ও যে ভেতরে ভেতরে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল আমি অনুমান করতে পারছিলাম।

কণিকাদি একসময় মৃদু স্বরে বলতে লাগলো, 'কেন যে অন্য লোকের সঙ্গে বাইরে যেতে হয় তুই কি বুঝবি। বিয়ে হওয়ার পর থেকে শুনে আসছি, কাজ আর কাজ। একটা জীবনে কত কাজ থাকতে পারে! এত লোকের মাঝে থেকেও আমি যে কী ভয়ানক নিঃসঙ্গ তোকে সে কথা কেমন করে বোঝাবো দোলন!' বলতে বলতে কণিকাদি ভেঙ্গে পড়লো। ওকে একজন সত্যিকারের দুঃখী মানুষ বলে মনে হতে লাগলো।

আমার উচিত ছিল ওকে জড়িয়ে ধরে দুটো সান্ত্বনার কথা শোনানো। কিন্তু আমি সে রকম কোন কথাই বললাম না। আমার সমস্ত মন জুড়ে তখন একটা নিষ্ঠুর মানুষ দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল। কঠিনভাবে বললাম, 'পুরুষ মানুষের জীবনে কাজটাই বড়। তারা কাজ করে বলেই আমরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারি।'

কণিকাদি হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলো, 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছুই যায় আসে না। যা সত্য তা চিরদিনই সত্য।'

কিছুক্ষণ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে রইলো কণিকাদি। তারপর বললো, 'ও কি তোকে এসব কথা বলেছে?'

'অমরেশবাবু যদিও খোলাখুলিভাবে সব কথা বলেননি, ওর কথার মধ্যে একটা বেদনার সুর থাকতো। তোমার ভালবাসা পাননি বলে বেদনা।'

'একদিন ওকে যথেষ্ট ভালবাসতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু—'

'চেষ্টা করে ভালবাসা যায় না। তা হলে মানুষ অহরহ ভালবাসতে পারতো।'

কণিকাদি আবার সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন আমার মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চায়। 'তুই এমনভাবে কথা বলছিস দোলন, যেন ওর সঙ্গে তোর কত দিনের পরিচয়।'

'সময়ের মাপকাঠি দিয়ে অন্তরঙ্গতা মাপা যায় না।' একটুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললাম, 'তুমি যখন ছিলে না, প্রায় দিনই তোমাদের বাড়িতে যেতাম—'

'অনেক রাত অবদি দুজনে গল্প করতিস।'

মনে মনে দারুণ উল্লসিত হয়ে উঠলাম। 'হ্যাঁ। খুব ভাল গল্প বলতে পারেন অমরেশবাবু। বেশ মজিয়ে রাখতে পারেন।'

'অথচ আমাকে বলার মত গল্প ওর ফুরিয়ে গেছে।' কণিকাদি যেন কঁকিয়ে উঠলো।

'গল্পকে ফুরিয়ে যেতে দিতে নেই। জিইয়ে রাখতে হয়। আমি যে তোমাদের বাড়িতে যেতাম, তুমি জানলে কি করে।'

'তুই কি কথাটা গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলি?'

'চেষ্টা করলে রাখতে পারতাম। কিন্তু গোপন করার মত কী আছে এতে?'

কণিকাদি বিভ্রান্তভাবে হাসার চেষ্টা করলো, 'না, কিছু নেই। তুই যে যেতিস বাড়ির সবাই জানতো।'

'এবং তাদের কাছ থেকেই সংবাদ সংগ্রহ করেছো তুমি। চাকর ঝিদের দিয়ে গোয়েন্দাগিরি করাতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।'

'কিন্তু জীবন মরণের প্রশ্নটাই যেখানে বড় সেখানে মানুষের লজ্জা থাকে না।' বলতে বলতে কণিকাদি দ্রুতবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি বাধা দেবার আগেই রাস্তায় গিয়ে নামলো।

কণিকাদি চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। কণিকাদি যতক্ষণ ছিল আমি যেন নেশার ঘোরে ছিলাম। প্রচণ্ড উল্লাসে আমার অন্তর ভরে উঠেছিল। ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিষাদে আমি অবসন্ন বোধ করতে লাগলাম। মনে হতে লাগলো, এতক্ষণ যা বললাম, কণিকাদিকে যে কঠিন আঘাত করলাম, তার মধ্য দিয়ে আমার দুর্বলতাই প্রকাশ পেল। আমি যে মনে মনে ওকে হিংসা করি সেই গোপন কথাটা আজ প্রকাশ হয়ে গেল। ওর চোখে আমি অত্যন্ত হীন হয়ে গেলাম। এমন হীন আমি এর আগে কোনদিন হইনি।

অরিন্দমের কাছে এ মুখ আমি দেখাবো কেমন করে! এ যে কী নিদারুণ লজ্জা তা আমি কেমন করে বোঝাবো! বোঝাতে গেলেও বুঝবে না।

সহসা বুকটা অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠলো। মনে হতে লাগলো একটা ভারী পাথর আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে। সেই পাথর সরাবার শক্তি আমার নেই।

পরম বিস্ময়ে এক সময় আবিষ্কার করলাম, আমি কাঁদছি। যদিও আমার মুখে কোন শব্দ নেই, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠলো। নীরব ভাষায় আমি বারংবার উচ্চারণ করতে লাগলাম, তোমার যদি মন থাকে, সেই মন দিয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা করার চেষ্টা করো অরিন্দম।

অরিন্দম, তুমি দয়ালু হবার চেষ্টা কর। আমাকে একটুখানি করুণা করা তোমার পক্ষে কি একান্তই অসম্ভব!

একদিন খুব ভোর-ভোর সময় দাদা এসে উপস্থিত। ওর চুল উস্কোখুস্কো। বেশবাস অবিন্যস্ত। যে মা ইদানীং খুব নির্বিকার ভাবে জীবনধারণ করে, সেই মার কণ্ঠেও উৎকণ্ঠার আভাষ পাওয়া গেল। 'কী হয়েছে রে দীপু?'

দাদা হাসার চেষ্টা করে বললো, 'কই, কিছু না তো। রাত জেগে এসেছি, যা ভীড় গাড়িতে, রোজ ভাড়া বাড়ছে, অথচ কমফরট বলতে ঘোড়ার ডিম।' নিষ্প্রভ চোখ নাচিয়ে আমার দিকে তাকালো দাদা।

চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বললাম, 'আগে তোমার পকেটে সব সময় একটা চিরুনি থাকতো।'

- 'আজকালও থাকে।'

ওর কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'কিন্তু চুল আঁচড়াতে মনে থাকে না।'

'তুই হাত মুখ ধুয়ে নে, আমি উনুনে আঁচ দি-ই। চায়ের সঙ্গে গরম গরম লুচি ভেজে দিচ্ছি।' মা তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দাদা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'লুচি? লুচি পেলি কোথায় তোরা?'

দাদার কথায় খুব জোরে হেসে উঠলাম। অনেকক্ষণ ধরে হাসলাম। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল। আঁচল দিয়ে ধীরে সুস্থে চোখ মুছলাম। দাদা এখনও সেইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ও যেন পৃথিবীর আশ্চর্যতম দৃশ্যটি দেখছে। দাদা মৃদু কণ্ঠে আবার বললো, 'কি হয়েছে রে দোলন? হাসার মত কি বললাম?'

'দিনকে দিন তুমি কী হয়ে যাচ্ছো দাদা ? তোমার বলা উচিত ছিল, ময়দা কোথায় পেলি।'

স্পষ্টত দাদার চোখে মুখে স্বস্তি ফুটে উঠলো। ও যেন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। 'সেই জন্যে এত হাসলি ? আমি ভাবলাম কী না কি।'

'আগে হলে তুমি কিন্তু এই হাসির জন্যে ধমক লাগাতে। তুমি খুব বদলে গেছ দাদা।'

'বয়স বাড়ছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায়।'

'কয়েক মাসের মধ্যে তোমার বয়স এমন কিছু বেড়ে যায়নি।'

দাদা গম্ভীর মুখে বললো, 'আমার বয়স একশো বছর বেড়ে গেছে।' ওর গলার স্বরে কোন রকম পরিহাস ছিল না। শুষ্ক কণ্ঠস্বর।

দাদা হয়তো আমার দিক থেকে কোন প্রশ্ন আশা করেছিল। আমাকে কথা বলতে না দেখে ও আবার বললো, 'মানুষ যখন খুব বিপদে পড়ে তখন তার বয়স খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়।'

যদিও কৌতূহল নামক বস্তুটি অধুনা আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই, তথাপি শোভনতার খাতিরে বাধ্য হয়েই বলতে হলো, 'তোমার আবার কি বিপদ ? বেশ তো আছ।'

'বেশ আছি বলতে ?' দাদা ভ্রূ বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালো।

'খাচ্ছো দাচ্ছো ঘুরে বেড়াচ্ছো।'

'তোরাও তো বেশ আছিস।'

'বেশ না থাকলেই হয়তো খুশী হতে। সত্যি সত্যি আমরা খুব ভাল আছি।'

দাদা সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আবার বললাম, 'টাকা পয়সার টানাটানি বিশেষ নেই। অমরেশবাবুর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিয়েছিলাম, আরও কিছু নেব।'

'ধার নিয়েছিস তুই ?' দাদা ধিক্কার দিয়ে উঠলো।

ওকে ধমক দিয়ে বললাম, 'ধার ধার করো না। সে টাকা শোধ দিতে হবে না।'

'কি বলে টাকা নিলি তুই ঐ লোকটার কাছ থেকে?'

দাদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললাম, 'তুমি কি বলে নিতে?'

'উনি আমাকে ভালবাসতেন।'

'একজন মানুষ যে শুধু একটি মাত্র মানুষকেই ভালবাসবে, ভালবাসার ইতিহাসে এমন কথা লেখা আছে বলে—'

'দোলন!'

দাদার ধমকানিতে হেসে ফেললাম, 'তোমরা সবাই এক রকম দাদা। তুমি, কণিকাদি। সেদিন কণিকাদিও আমাকে ধমক দিয়েছিল। অথচ কেউ তোমরা জানো না, সে অধিকার তোমাদের নেই।'

আগে হলে এই কথায় দাদা অসম্ভব রেগে যেত। এখন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়লো। ও একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। ওকে বিষম অবসন্ন বলে মনে হলো। ওর গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালাম। শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'তোমার কি বিপদের কথা বলছিলে? আমাকে বলো। যদি পারি সাহায্য করবো।'

দাদা মাথা নীচু করে বসে রইলো অনেকক্ষণ। ওর চুল নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, 'বিপদ যেমন আসে তেমন কেটেও যায়। সাহস করে রুখে দাঁড়াতে হয়।'

'কিন্তু এ বিপদ কাটার নয় দোলন।' দাদা আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো।

'আমাকে বলো। আমি তোমাকে নিশ্চয় সাহায্য করবো।'

'ওরা আমার অফিসে কমপ্লেন করবে বলে লিখেছে। এ রকম কমপ্লেন হলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।'

'ওরা কারা? কি কমপ্লেন করবে? যা বলতে চাও খুলে বলো।' করুণার চেয়ে আমার কণ্ঠে বিরক্তির প্রকাশটাই বেশী।

'জয়তির দাদারা। ওরা লিখেছে, আমি যদি ওদের বোনকে বিয়ে না করি তারা অফিসে কমপ্লেন করবে।'

'কিন্তু তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওরা তোমাকে সে কাজে বাধ্য করতে পারে না। সে অধিকার তাদের নেই। থাকতে পারে না।'

'আছে দোলন, সে অধিকার ওদের আছে।' দাদার মাথা আরও ঝুঁকে পড়েছে। ওর চিবুক বুক স্পর্শ করে ফেলেছে।

'তুমি কি জয়তির সঙ্গে, মানে, তোমার দিক থেকে বা তোমাদেব দুজনের দিক থেকে এমন কিছু কি ঘটেছে যাতে বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন ওঠে?'

দাদা কথা বললো না। ধীরে ধীরে মাথা দোলাতে লাগলো।

ওর চুল নিয়ে আরও অনেকক্ষণ ধরে খেলা করলাম।

'জয়তি অন্তসত্ত্বা।' দাদা ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সেদিন রাত্রে শুতে যাবার সময় আমি বারংবার বাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলাম। ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। দাদার হয়ে, নিজের হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি বাবা। এই মুহূর্তে আমি, দোলন, তোমার মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করছি। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় তোমার মৃত্যু ঘটেছে। না হলে তোমাকে কত কী দেখতে হতো, শুনতে হতো। সেই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে তুমি নিষ্কৃতি পেয়ে গেলে। তুমি কত ভাগ্যবান!

আমার পাশে শুয়ে মা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে। মার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভারী ও মন্থর। মাকে একজন বিচিত্র মানুষ বলে মনে হয় আজকাল। মনে হয়, কোন এক অপূর্ব কৌশলে মা নিজেকে শরীরেব খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছে। যত দিন কাটছে মা তাপ-উত্তাপহীন মানুষ হয়ে যাচ্ছে। আগে মা রাগতো, এখন রাগে না। আগে মা খুব কথা বলতো, এখন অধিকাংশ সময় চুপ করে থাকে। দশটা প্রশ্নের উত্তরে একটা জবাব দেয়। তাও না দিলে নয় বলেই দেয়।

যতক্ষণ কাজ করে মুখ বুজে কাজ করে মা, তারপর শুয়ে শুয়ে ঘুমোয়। মাকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে মানুষের দুটি চোখে এমন বিশ্বজোড়া ঘুম লেগে থাকতে পারে। ঘুমোতে পারে বলেই মা হয়তো শান্তিতে আছে। কিংবা এমনও হতে পারে, জেগে থাকলে শান্তি পাবে না জেনেই মা ঘুমোয়।

মাকে নিয়ে এ রকম চিন্তা আগে আমার হতো না। মা একজন অতি সাধারণ মানুষ। সংসারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংসারের চিন্তায় সর্বক্ষণ মগ্ন। আমার কাছে এই ছিল মার সব চেয়ে বড় পবিচয়। জন্ম থেকে এভাবেই দেখে আসছি মাকে। সহসা এই গভীর নিশীথে আমার চিন্তাধাবা বিপরীত খাতে বইতে শুরু করলো। এখন মনে হতে লাগলো, এই সংসার থেকে মা নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। আমার বা দাদার ভালমন্দে মার কিছু যায় আসে না। মার জগৎ মাকে নিয়েই। মাকে নিয়ে যে এমন এক উদ্ভট চিন্তায় মেতে উঠবো শুতে যাবার আগে ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। পেলে আমি কিছুতেই এখন শুতাম না। এর চেয়ে বরং চোখের সামনে একটা বই খুলে বসে থাকা শত সহস্রগুণে ভাল ছিল।

মাকে ছেড়ে আমি অন্য কথা চিন্তা করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমাদের কলেজের পাশে বিরাট একটা পার্ক আছে। সেই পার্কের গা ঘেঁষে ছোটখাট একটা পল্লী রয়েছে। কলেজের সবাই জানে, এটা বেশ্যা পল্লী। অফ পিরিয়ডে কিংবা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আমরা পার্কের ধারে এসে দাঁড়াতাম। নিজেদের মধ্যে গল্প করার ছলে বারবার সেই পল্লীর দিকে তাকাতাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মতন গোটা কয়েক বাড়ি। মান্ধাতার আমলে কবে হয়তো রং হয়েছিল, এখন সে রং আর চেনার উপায় নেই। জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা জমে উঠেছে, চুন বালি খসে পড়েছে। বিশ্রী হতচ্ছাড়া চেহারা। সেই বাড়িগুলোর ছাদে উঠে মেয়েরা চুল শুকতো। গ্রীষ্ম, বর্ষা

বারো মাস ওরা চুল শুকতো। এমন কি তুমুল বর্ষার মধ্যেও ওরা ছাদে উঠতো, চুল ছড়িয়ে ছড়িয়ে শুকোবার ভান করতো এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসাহাসি করতো। আমরা গভীর কৌতূহল নিয়ে ওদের দেখতাম। দেখতে দেখতে আমার মন কি রকম অস্থির হয়ে উঠতো। পালিয়ে আসতে চাইতাম, কিন্তু কী এক তীব্র আকর্ষণ আমাকে রোজ সেখানে টেনে নিয়ে যেত। বেশ কিছুটা সময় আটকে রাখতো।

ওদের মধ্যে একটি মেয়ে বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শ্যামলা শ্যামলা মেয়েটি অন্যান্য মেয়েদের মত অত হাসাহাসি করতো না। সবার মধ্যে থেকেও ও যেন কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতো। প্রায় সময়ই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো। ছেলেবেলা থেকেই আকাশ দেখতে আমার ভাল লাগে। জানিনা, মেয়েটিরও আকাশ দেখতে ভাল লাগত কিনা। না শুধু শুধুই তাকিয়ে থাকতো। ওর এই আকাশ দেখার মধ্য দিয়ে আমি যে কবে কখন ওর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম, নিজেও জানতে পারিনি।

গ্রীষ্মের ছুটির পর একদিন ওকে আর দেখতে পেলাম না।

আমার উন্মুখ মন বারংবার ওকে আবিষ্কারের চেষ্টা করতো। মনে হতো, একজন মানুষ খুব কাছে ছিল, অতর্কিতে সে কোথায় হারিয়ে গেল। গভীর বেদনায় আমার অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি আর বেশ্যা-পল্লীর দিকে তাকাতাম না।

আজ এতদিন পর হঠাৎ সেই মেয়েটির কথা আমার মনে পড়লো কেন জানি না। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে বিচিত্র এক অস্থিরতা জেগে উঠলো। রাত এখন গভীর। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এখন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। অন্তত আমার চারিপাশে যারা রয়েছে তারা নিশ্চয় এখন কেউ জেগে নেই। মা দাদা জয়তি কণিকাদি অমরেশবাবু সবাই এখন নিদ্রামগ্ন। সাধারণ নিয়মবশত তাই থাকা উচিত। অরিন্দমও নিশ্চয় এখন গভীর নিদ্রায় তলিয়ে

আছে। ওর উষ্ণ শয্যা ওকে পরম এক সুখের উপলব্ধি এনে দিয়েছে। কিন্তু আমি ওদের মত নিজেকে সুখের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারছি না। বরং একজনের দুঃখবোধ আমাকে করে তুলেছে নিঃসঙ্গ, অস্থির। আমার পাশে শুয়ে আছে মা। পাশের ঘরে রয়েছে দাদা। আশপাশের বাড়িগুলোতে রয়েছে অসংখ্য প্রাণী। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কলকোলাহল আমাকে করে তুলবে বাস্তবাদী এক মানুষ, যে শুধুমাত্র নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে হয়ে উঠবে অতিমাত্রায় ব্যাগ্র। কিন্তু সামান্য একটি চরিত্রহীনা মেয়ে কী জঘন্য ভাবে এই মুহূর্তে আমাকে সবার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গভীর হতাশার অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিল! এই মুহূর্তে আমি ওকে অভিশাপ দিতে চাইলাম। ও যেখানেই থাক, আমার মত ওর রাতও যেন নিদ্রাহীন হয়।

দিন কয়েক পরে দাদা চলে গেল। যাবার সময় মার হাতে কিছু টাকা দিল। মা গুনেও দেখলো না, বা একটা কথাও বললো না। নীরবে আঁচলে বেঁধে রাখলো।

আমি বললাম, 'আবার কবে আসবে?'

দাদা অস্ফুটস্বরে বলল, 'দেখি।'

'যখন তোমার সুবিধা হয় এসো।'

দাদা চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। সেই মুহূর্তে আমি যেন ওর চোখে ভিখিরির দৃষ্টি দেখেছিলাম। দাদা যেন আমার কাছে করুণা ভিক্ষা করছে। নাকি, আমার চোখের ভুল। দাদার দৃষ্টিতে হয়তো সে রকম কিছুই ছিল না। শুধু নিমেষের জন্য আমার দিকে তাকিয়েছিল। তার বেশী কিছু না।

কিছুটা পথ আমি দাদার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। আগে হলে দাদা নির্ঘাৎ ট্যাকসি ডাকতো। একটা স্যুটকেশ হাতে নিয়ে বাসের আশায় হেঁটে যেত না।

যেতে যেতে দাদা একসময় দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'তোর মনে পড়ে দোলন, বাবা বলতেন, বড় হয়ে আমি এঞ্জিনিয়ার হব। বিলেত যাব।' দাদা আব দাঁড়ালো না, হন হন করে এগিয়ে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বলাব মত কথা আমারও ছিল। আমিও বলতে পাবতাম, তোমার মনে পড়ে দাদা, বাবা বলতেন, দোলনের বিয়ে দেব মস্ত এক ডাক্তারের সাথে, যে ওকে ভাল ভাল অষুধ খাওযাবে, ইয়া মোটা করে তুলবে। বলতে বলতে বাবা খুব হাসতেন।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হতে লাগলো, বাবা খুব রসিক ছিলেন। দাদাকে ইঞ্জিনিয়াব করা আর আমাকে বড় ডাক্তারেব সঙ্গে বিয়ে দেওয়াব ব্যাপার নিযে বাবা যা বলতেন, তাব মধ্যে কোন ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল না। যা ছিল তা নেহাৎই কৌতুক। বাবা খুব কৌতুক-প্রিয় ছিলেন বলেই আমাব ধাবণা।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বইলাম। দাদাব দীর্ঘ দেহ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে দাদা বাঁক ফিববে। তার আগে আমি ভাল করে আব একবার ওকে অনুভব করতে চাই। দাদা ঈষৎ ঝুঁকে হাঁটছে। স্যুটকেসটা নিশ্চয় ভারী। সেই ভারে দাদা ঝুঁকে পড়েছে। নাকি সেই ভারে না, নিজেই নিজেব কাছে ভাবী বোঝা হয়ে উঠেছে দাদা, আর সেই ভার বহন করতে ওর কষ্ট হচ্ছে। ওর ধীব পদক্ষেপ কি সে কথাই ঘোষণা করছে?

আর দাঁড়িযে থাকাব অর্থ হয় না। দাদা চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে।

তাডাতাড়ি বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু বাড়ি গিয়ে কী করবো। আমার এখন অখণ্ড অবসর। কলেজ বন্ধ। কবে খুলবে জানি না। জেনেও লাভ নেই। কিছুদিনের মধ্যে পরীক্ষা। পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে আবার কলেজে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু পড়ে কি হবে! শুধু শুধু পড়তে আর ভাল লাগে

না। পড়াশুনো করে কি যে লাভ! দাদা তো পড়াশুনো করেছিল, কি লাভ হলো। তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত এ-দরজা ও-দরজা ঘুরে মরছে। ওর চেয়ে আমি অনেক সুখে আছি। না চাইতেই লোকে টাকা দেয়। সামান্য একটু আপোষের বিনিময়ে মুঠোভর্তি টাকা! আপোষই বা কি। আমার তো কোন লোকসান হলো না। বরং বলা যেতে পারে, সবটাই লাভ। মানুষ হিসেবে অমরেশবাবু মন্দ না। দেখতে শুনতেও ভাল। বেশ শিক্ষিত ধবনের আচার ব্যবহার। সেই লোকের সঙ্গে কোন গোপন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার মধ্যে গ্লানি নেই থাকা উচিত না। উপরন্তু উপরি পাওনা হিসেবে, কথা নেই বার্তা নেই ছুম করে পাঁচশো টাকা হাতে চলে এল। শুধু পাঁচশো টাকা না। ইচ্ছে করলে এমন বহু পাঁচশো টাকা আমি রোজগার করতে পারি। বিনা মেহনতের রোজগার।

দাদা কত কষ্ট করে কিন্তু কি-ই বা ওর উপার্জন। অমন সুন্দর চেহারা কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যে দাদা একজন হৃত-শ্রী মানুষে পর্যবসিত হয়ে যাবে। সেই তুলনায় আমি ভাল আছি। অনেক ভাল আছি।

হঠাৎ একটা লোক শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো। ওর ভারী জুতোর আওয়াজ মুহূর্তের মধ্যে আমাকে অন্য এক জগতের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল। আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা হাসলো। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বললো, 'আজকাল আর আমাকে বাইরে থাকতে হয় না দিদিমণি, বাবু একটা ঘর বানিয়ে দিয়েছেন।'

কী আশ্চর্য! পায়ে পায়ে কখন কণিকাদিদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কণিকাদিদের দারোয়ান এখনও আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আশঙ্কা হচ্ছিলো লোকটা না আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বসে। তাহলে আমি বিষম অপ্রস্তুত বোধ করবো। ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না।

সত্যি কথা বলতে কি, এই মুহূর্তে বিশ্ব-সংসারের কোন প্রাণীর সঙ্গেই আমি যোগসূত্র স্থাপন করতে চাই না। আমি সবার কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাই।

'ভেতরে যান দিদিমণি, বাবু আছেন। মা বেরিয়ে গেছেন।' লোকটা সসম্ভ্রমে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মাথার বিরাট পাগড়িটা আজ আশ্চর্য রকমের পরিষ্কার। ওর গায়ে একটা মোটা গরম কোট। পায়ের জুতোটাও নতুন বলে মনে হলো।

মৃদু হেসে বললাম, 'তুমি তো সুখেই আছ সরযূ।'

ও আহ্লাদে গলে পড়ল 'বহুৎ সুখে আছি দিদিমণি। আমার আর কোন কষ্ট নেই।'

কত সামান্য কারণে সরযূ নিজেকে সুখী মনে করতে পারছে। কিন্তু কারণটা কি সত্যি সত্যিই খুব সামান্য! ও যে এখন আর অবহেলিত না, ববং ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এ বাড়ির মানুষরা দৃষ্টি দিয়েছে, এ তো অসামান্য ব্যাপাব। নিজেকে ও একজন মূল্যবান মানুষ বলে ভাবতে পারছে, এও তো কম সুখের কথা না।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ডানদিকের বড় ঘরটা আমার অপরিচিত না। অমরেশবাবুর অফিস ঘর এটা। ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পা দিলাম। অমরেশবাবুর চেয়ার শূন্য। ঘরের কোণের দিকে দৃষ্টি গেল। একজন মানুষ টেবিলের ওপর নুয়ে রয়েছে। হয়তো গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ কবছে। আমার উচিত ছিল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি নিজের ওপর সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেললাম। পায়ে পায়ে আরও এগিয়ে গেলাম। ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে আমি ওকে স্পর্শ করতে পারি। ওর ঘন চুলের মধ্যে নিজের আঙুল ডুবিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু আমাকে সে সুযোগ না দিয়ে লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ও যেন কথা বলতেও ভুলে গেছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি খুব স্বাভাবিক ভাবে হেসে হেসে বললাম, 'দেখা করতে এলাম।'

'কার সঙ্গে ?' বিড় বিড় করে বললো ও।

'আপনার—তোমার সঙ্গে।'

অরিন্দম কথা বলতে পারলো না। ও যে নিজেকে সংযত করে নেওয়ার চেষ্টা করছে বুঝতে পারছিলাম। ওর এই অসহায় রূপ আমার প্রাণে উল্লাস বইয়ে দিল। লঘু কণ্ঠে বললাম, 'কতদিন দেখি না, ভাবলাম দেখে আসি।'

অরিন্দমের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। ও থেমে থেমে বলতে লাগলো, 'হ্যাঁ অনেকদিন, প্রায় দু-তিন মাস—'

'দু মাস বারো দিন। অর্থাৎ তিহাত্তর দিন। তিহাত্তর দিন পরে দেখা হলো আজ।' আমি একটা চেয়ারে বসলাম। অরিন্দম এখনও দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে ওকে বসার ইঙ্গিত জানিয়ে বললাম, 'আমি তোমার গুরুজন না যে দাঁড়িয়ে থাকবে। গুরুজনের সামনেও যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই অবশ্য। তুমি বসতে পার অরিন্দম।'

কত সহজে অরিন্দমের নাম উচ্চারণ করলাম। অথচ একদিন এই নাম উচ্চারণ করতে কত দ্বিধা এসে ভীড় করতো।

অরিন্দম বসলো না, যেমন দাঁড়িয়েছিল দাঁড়িয়েই রইলো। আমি অপলক দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগলাম। মাথা ঈষৎ নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। ওকে একজন বন্দী রাজপুরুষের মত দেখাচ্ছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ওর খুব কাছে সরে এলাম। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে ওর প্রশস্ত বুকে নিজের মাথা ছোঁয়াতে পারি, কান পেতে ওর হৃদপিণ্ডের ধ্বনি শুনতে পারি, দু হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে গাঢ় স্বরে বলতে পারি, অরিন্দম, অরিন্দম, বহুদিন আগে, এক শীতের সকালে দোলন বলে একটি মেয়ে ভেজা-ভেজা ঘাসের মধ্যে পা ডুবিয়ে একটা ছোট্ট পাখির গান শুনেছিল,

এই মুহূর্তে আবার তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সেই সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে, বিশ্বাস কর।

বললাম না। কোন কথাই বললাম না। শুধু অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও যে ঘন ঘন খোলা দরজার দিকে তাকাচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম।

'অমরেশবাবু কোথায়?' নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলাম। সাধারণত আমি এমন রূঢ় স্বরে কথা বলি না।

'উনি হয়তো বাথরুমে আছেন।'

'আমি একবার দেখা করবো। বিশেষ দরকার।'

'কি দরকার?' কথা বলে অরিন্দম বিব্রত বোধ করল। তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠলো, 'বলতে যদি বাধা না থাকে।'

'না, কোন বাধা নেই। কিছু টাকার দরকার ছিল।'

'টাকার দরকার ছিল?' ভূতে-পাওয়া মানুষের মত বিড়বিড় করে উঠলো অরিন্দম।

'হ্যাঁ টাকার। সবাই টাকা চায়, আমি চাইতে পারি না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম।

'সে কথা বলিনি। তবে অমরেশবাবু টাকা দেবেন—'

'তিনি আগেও আমাকে টাকা দিয়েছেন। না চাইতেই দিয়েছেন। এবার চেয়ে দেখবো, কত দেন, কত দিতে পারেন তিনি।'

'দোলন—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। টাকার দরকার। খুব দরকার। টাকার জন্যে মনুষত্ব দেয় সবাই, তুমি দেও না?'

'আমি? আমি টাকা উপার্জন করি, ভিক্ষা চাই না।' দেখতে দেখতে অরিন্দমের মধ্যে এক বীরপুরুষ জেগে উঠলো।

তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বললাম, 'তুমি ভিখিরির চেয়েও অধম। তারা মাথা নুইয়ে ভিক্ষা নেয়, মুখে এমন আস্ফালন করে না। আমি ভিক্ষা করে টাকা নিই না, নিজের প্রাপ্য হিসেবেই নিই।'

'তোমার প্রাপ্য ?' অরিন্দম নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।

'হ্যাঁ আমার প্রাপ্য। তোমাকে বলতে বাধা নেই অরিন্দম, আমি অমরেশবাবুর মনে সুখ এনে দিয়েছি, যে সুখ তোমরা কেড়ে নিয়েছিলে। একজন নিরপরাধ মানুষের ওপর যে অন্যায় তোমরা করেছো, আমি সে অন্যায়ের প্রতিকাব করছি। মূল্য হিসেবে কিছু টাকা চাই। খুব দোষ হলো!' বলতে বলতে কী একটা আটকে গেল গলায়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। গেটের সামনে সেই বিরাট পাগড়িটা আমাকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলো। কোনদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমি রাস্তায় এসে নামলাম।

এই মুহূর্তে চোখের সামনে অন্তত এক টুকরো আকাশ দেখতে চাই আমি। একটু আলো।

আকাশ নেই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তার আলোগুলো এখনও জ্বলেনি। কুয়াশা এবং ধোঁয়া মিশে এক দম বন্ধ করা পরিবেশ। বারংবার মুখ উঁচু করে আকাশ দেখতে চাইছি, কিন্তু দৃষ্টি প্রতিহত হচ্ছে। আমি পথ খুঁজে পেতে চাই, কিন্তু পথ নেই। রাশি রাশি অন্ধকার আমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে।

কিন্তু এমন অসহায়ভাবে তুমি নিজেকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পার না দোলন। তোমার মধ্যে যে বিরাট শক্তি অহরহ কাজ করে চলেছে তুমি সেই শক্তিকে আবিষ্কারের চেষ্টা কর।

কিন্তু কোথায় শক্তি ? আমি একজন অসহায় মানুষ। আমার মধ্যে তো কোন শক্তি নেই।

কে বলে তোমার মধ্যে শক্তি নেই। প্রচণ্ড শক্তিশালিনী তুমি। দেখতে পাওনা, সেই শক্তির বলে অমরেশবাবুর মত প্রতাপশালী মানুষ আজ তোমার হাতের পুতুল, ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে চিরাচরিত গণ্ডী থেকে তুমি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পার। ইচ্ছা করলে অরিন্দমের মত বিশ্বস্ত এক ক্রীতদাসকে তুমি চিরজীবনের মত শৃঙ্খল-

মুক্ত করতে পার, এক আত্মম্ভরি নারীর অহঙ্কার পথের ধূলোয় মিশিয়ে দিত পার।

না না না। আমি তা চাই না। আমি একটু সুখ চাই, সামান্য একটু শান্তি চাই। বিরাট এই পৃথিবীর মাঝে ক্ষুদ্র একটি নীড়। শান্ত, কোমল, ভালবাসায় উষ্ণ। জঘন্য চক্রান্তে যে শান্তি ব্যাহত হবে না কোনদিন।

জানি না, কতক্ষণ এভাবে পথ চলেছিলাম।

একসময় আমার গতি রোধ হলো। জীর্ণ একটা বাড়ি। সরু দুফালি দরজা। মরচে পড়া দুটো কড়া। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। অস্পষ্ট এক মনুষ্য-মূর্তি। চেনা অ-চেনার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। সে বললো, 'কে ?'

'আমি দোলন। দোলনকে ভুলে গেলে প্রবীরদা ?'

প্রবীর তখনও দরজার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলতেও কি ভুলে গেছে প্রবীর ?

আবার বললাম, 'একের দুই নকুল মিস্ত্রী লেনের দোলন। দীপুর বোন দোলন। এখনও মনে পড়লো না! আমার হাতের মুড়ি-মাখা খেতে তুমি খুব ভালবাসতে প্রবীর—'

প্রবীর কাছে এগিয়ে এল। একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। দুই হাত দিয়ে প্রবীরের সেই হাত চেপে ধরলাম। অকূল সমুদ্রের মাঝে ভাসতে ভাসতে সহসা আমি ভেলার সন্ধান পেলাম। নিমেষে আমার সমস্ত উদ্বেগ ভয় শঙ্কা দূর হয়ে গেল। আমি খুব শান্তভাবে বললাম, 'কতদিন পর তোমাকে দেখলাম।'

প্রবীর আমার কথার প্রতিধ্বনি করলো, 'কতদিন পর।'

প্রবীর আমাকে ধরে এনে ওর ঘরে বসালো। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, 'তোমার শীত করছে। তুমি কাঁপছো। এই র‍্যাপারটা গায়ে দাও। আমি তোমাকে চা করে খাওয়াই।'

প্রবীর ভেতরে চলে গেল।

প্রবীর তুমি কত ভাল। কত করুণা তোমার। কত সহজে গভীর এক অন্ধকার থেকে আমাকে আলোময় অন্য এক জগতে নিয়ে এলে। কত অপমান, গ্লানি, কত লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে আমাকে!

প্রবীর আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু আমার কপালের লিখন।

বাঁচতে চেয়েছিলাম। পারলাম না। তিলে তিলে পলে পলে আমি মরে যাচ্ছি। কেউ জানে না। আমার স্বামী—প্রবীর কত কাছের মানুষ সে, অন্তত সেরকমই তো ভাবা উচিত, সেও আমাকে বাঁচাতে পারছে না। কেউ না। সবাই ভাবে আমি বুঝি পাগল হয়ে গেলাম। ভাল ভাল ডাক্তার আসে, দামী দামী ওষুধ খাই। আমার কষ্ট আরও বাড়ে, দুঃখ গভীরতর হয়। ওরা আমার ব্যথা বোঝে না। বুঝতে চায় না।

সব কথাই আপনাকে বললাম। আপনি স-হৃদয় ব্যক্তি। আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন। কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো!

সেই যে ছোট্ট পাখিটা, যে একদিন আশ্চর্য রকমের সুন্দর এক সকালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত আমাকে শুনিয়েছিল, জানেন, আমি নিজের হাতে তাকে হত্যা করেছি।

সে আর কোনদিন আমাকে গান শোনাতে আসবে না।

———